অন্যদৃষ্টি

সুনীল ঘোষ



২০৬ কর্ণআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৬
প্রকাশক—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
মুদ্রাকর—স্থকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্যামল সেন
প্রচ্ছদ চিত্রণ—গোপী ধাড়া
বাঁধাই—মফিজুর রহমান এণ্ড কোং
পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা
ছ' টাকা

আমার মাকে

এই লেখকের ঃ

নায়ক নায়িকা

ঝঞ্ঝা

প্রাণবহ্নি

কিন্নর কন্যা

স্বর্ণমৃগয়া (৩য় সং যন্ত্রস্থ)

ব্যাকুলবসন্ত (২য় সং যন্ত্রস্থ)

মধ্য কলকাতার মির্জাপুর রোডে মেস হোটেলের ছড়াছড়ি। কয়েক বছর আগে এই রাস্তার তিনের একের সাত নম্বরে নিউ সিটি বোর্ডিং নামে অতি নগণ্য একটি আবাসিক হোটেল ছিল। সেই হোটেলে আমি এক নাগাড়ে পাঁচ ছ' বছর বাস করেছি। খুব একটা আরামে না থাকলেও জায়গাটা আমার কাছে খারাপ লাগত না এবং আরও কয়েক বছর সেখানে অনায়াসেই বাস করতে পারতাম। কিন্তু বাধ সাধল কলকাতা কর্পোরেশন। হঠাৎ একদিন নোটিশ হল বোর্ডিং বাড়িটা অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। মানুষের বাস করার পক্ষে বাড়িটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই দুঃসংবাদে মেসের অপর তেইশ জন স্থায়ী সদস্যের সঙ্গে আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম।

শাস্ত্রকাররা বলেছেন, পৃথিবীতে সবই অনিত্য। যা আজ আছে তা কাল নেই। যা আজ সত্য তা কাল মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে। হয়ও তাই। এক সময় মহেঞ্জোদাড়ো অতি আধুনিক নগরী হিসাবে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ মাটি খুঁড়ে তার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করে বুঝতে হয় যে এককালে সত্যিই এই নগরীর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং এই সদাচঞ্চল বিশ্বে ক্লাইভের আমলে তৈরি তিনের একের সাত নম্বর মির্জাপুর রোডের দোতলা বাড়ির আয়ুও যথাসময়ে শেষ হয়ে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সত্যি কথা বলতে কি, বছর পঞ্চাশের আগেই বাড়িখানার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া উচিত ছিল। কেন যে ভাঙেনি তা একমাত্র পাকাপোক্ত ইঞ্জিনিয়াররাই বলতে পারেন।

আন্দাজ করতে পারি, ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে কোন ভাগ্যবান বাঙালী নিজে বাস করবার জন্য বাড়িটা বানিয়েছিলেন। সেদিন বাড়ির যা চেহারা ছিল, তার সঙ্গে আজকের চেহারার কোন মিল আছে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে অন্তত পাঁচ সাতবার বাড়িখানার মালিকানা বদল হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই মালিক তাঁর নিজের প্রয়োজন মত বাড়ির চেহারা

পাল্টে নিয়েছেন। ভিতগুলো ঠিক রেখে বাড়িটাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা হয়েছে। তাতে বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে কিন্তু শক্তি বাড়েনি। চৌত্রিশ সালের ভূমিকম্পে নাকি দোতলার ছাদ আর পূব-দক্ষিণের দেওয়াল ফুটো ফেটে চৌচির হতে হতে শেষ মুহূর্তে সামলে নেয়। সেই থেকে বাড়িটা এক-পাশে হেলে আছে। বাঁশ আর শালের খুঁটি দিয়ে ছাদ আর দেওয়ালগুলো ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। শীত গ্রীষ্ম এক রকম কেটে যায় কিন্তু গোল বাধে বর্ষাকালে। ছাদের ফুটোগুলো পুটিং আর পীচের প্রলেপ দিয়ে বন্ধ করা যায় না। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘরের মধ্যে জল থৈ থৈ করে। আসবাবপত্র বালিশ বিছানা সব ভিজে চুপসে যায়। অধিকাংশ বোর্ডার তখন ম্যানেজার জগমোহনের একমাত্র বোনের সঙ্গে কল্পনায় একটা মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে তার সহোদরের মুণ্ডপাত করতে থাকেন। জগমোহন কথা বলেন না। কানে তুলো আর মুখে চাবি মেরে চুপ করে বসে থাকেন। এতগুলো লোক তাঁর বোনের প্রণয়প্রার্থী জেনেও তাঁর বিন্দুমাত্র চিত্তবিকার হয় না।

কিন্তু এ সব অসুবিধা কোন মেস বোর্ডিংএই বা নেই? গরীব লোকেরা যেখানে থাকবে, সেইখানেই তাদের নানা রকম অসুবিধা ভোগ করতে হবে। কোথাও বর্ষাকালে ঘরে জল পড়বে, কোথাও সারা দিন ঘরে রোদ্দুর বাতাস ঢুকবে না, কোথাও পায়খানা কলখানায় ঢুকতে হলে কিউ লাগাতে হবে। একটা না একটা গোলমাল আছেই। ও সব নিয়ে খুঁতখুঁত করতে গেলে আমাদের চলে না। সুতরাং বোর্ডিংএর অসুবিধাগুলোও আমাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ম্যানেজার জগমোহনবাবু যেদিন বাড়ি ভাঙার নোটিশটা আমাদের পড়ে শোনালেন, সেদিন সকলেরই বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। বৃষ্টি বাদল ঝড়-ঝাপ্টার সঙ্গে লড়াই করে এতকাল যারা এখানে বাস করেছেন, জায়গাটার উপর তাদের মায়া পড়া স্বাভাবিক।

কলকাতায় বাসস্থানের কি রকম সঙ্কট চলেছে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। মেসবোর্ডিংএ একটিমাত্র সীট খুঁজে বার করতে যেখানে জিভ বেরিয়ে যায়, সেখানে একসঙ্গে তেইশটা লোক বাস্তুচ্যুত হলে তারা কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবে? কে তাদের জায়গা দেবে? বোর্ডিংটাকে অন্য কোন বাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো সমস্যার সমাধান হতে পারত, কিন্তু অমন বাড়ি এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? সুতরাং বেশ বোঝা গেল, সবাই মিলে সম্মিলিত ভাবে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। যে যার আপন পথ

দেখে নিতে হবে। কিন্তু তাতেও অন্তত দু তিন মাস সময় লাগবে। সবাই একই সময়ে অন্য মেস বোর্ডিংএ জায়গা পাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং এই দু তিন মাস বাড়িটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি করে?

গদাধর চক্রবর্তী বোর্ডিংএর পুরানো বাসিন্দা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। হুগলীর গ্রামাঞ্চলে বাড়ি। সেখানেই সংসার। চাকরী করেন পোর্ট কমিশনে। সারাজীবন বোর্ডিংএই কাটিয়ে দিলেন। চালাকচতুর জানাশোনা লোক বলে খ্যাতি আছে। তিনি বললেন: কাল সকালে আপনারা দু'চারজন ছেলে ছোকরা মিলে কাউন্সিলর বগলা পাইনের কাছে যান। তাকে ধরে পড়তে পারলে বাড়িভাড়ার নোটিশটা কিছুদিনের জন্য রদ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, ফোঁকটে হবার নয়। পান বিড়ির খরচ দিতে হবে। কি হে জগমোহন, কিছু খসাতে রাজি আছ? এতকাল তো আমাদের শুষে খেয়েছ, এবার একটু ওগরাও।

জগমোহনবাবু কিছু বললেন না কিন্তু তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, আরও দুতিন মাস আমাদের সেবা করার সুযোগ পাবার জন্য তিনি কাউন্সিলারকে দুই একশ' টাকার পানবিড়ি খাওয়াতে অনিচ্ছুক নন।

পাড়ার কাউন্সিলার শ্রীবগলা পাইন বনেদী বংশের ছেলে। তিন পুরুষ ধরে কলকাতার নাগরিকদের মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আশপাশের সমস্ত মেছোঘেরীর মালিক তিনি। কর্পোরেশনের সেবা করবার ভারও পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। বয়স বছর চল্লিশেক। বড় রাস্তার মোড়েই বাড়ি।

পরদিন রবিবার। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম নীতি অনুসরণ করে সকলেই আমরা তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম ইতিমধ্যেই বাইরের ঘরে জনকয়েক টাউটের সমাবেশ হয়েছে। আগের দিন কর্পোরেশনের সভায় কোন কাউন্সিলরকে কি রকম ল্যাঙ্ মেরে নিজের কার্যোদ্ধার করেছেন, সেই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন বগলাবাবু। আমাদের আকস্মিক উপস্থিতির ফলে সেই গল্পে ছেদ পড়ল। মুখখানা গম্ভীর করে বগলাবাবু জানতে চাইলেন, আমরা কি চাই।

: আজ্ঞে, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। নমস্কার।

: নমস্কার।—ভ্রু কোঁচকালেন বগলাবাবু: আমার সঙ্গে দেখা করতে

এসেছেন ? কিন্তু আপনাদের তো চিনতে পারলাম না।—কণ্ঠস্বর কেমন যেন টানাটানা জড়ানো।

আমি বিনয় প্রকাশ করে বললাম : আজ্ঞে, তা আর চিনবেন কি করে ? আমরা সামান্য চুনোপুঁটি বইতো নয়।

: মানে ?—কথাটা ব্যঙ্গাত্মক কিনা বগলাবাবু সেটা যাচাই করে নিতে চাইলেন।

: মানে আমরা আপনারই আশ্রিত। এই পাড়ারই বাসিন্দা। নিউ সিটি বোর্ডিংএ থাকি।

সঙ্গে সঙ্গে বগলাবাবুর মুখখানা কেমন চকচক করে উঠল : নিউ সিটি বোর্ডিং—মানে তিনের একের সাত—অর্থাৎ জগমোহনের গ্র্যাণ্ড হোটেল ?

: ঠিক ধরেছেন। ঐ তিনের একের সাত সম্বন্ধেই একটা আবেদন নিয়ে এসেছি।

বগলাবাবু কয়েক মুহূর্ত মৌন থেকে টাউটদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। শেষে বললেন : পাশের ঘরে আসুন।

বুঝলাম টাউটদের সামনে উনি তিনের একের সাত নম্বর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চান না। আমরা তাঁর পেছু পেছু পাশের ঘরে ঢুকে পড়তেই বগলাবাবু দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

: হ্যাঁ, কি বলছিলেন আপনারা ?

: বলছিলাম, কর্পোরেশন থেকে বাড়িটা ভাঙবার নোটিশ দিয়েছে। পনেরো দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে।

: তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে বলুন।—প্রকৃত দেশসেবকের মত গুরুগম্ভীর গলায় বললেন বগলাবাবু : কর্পোরেশন না ভাঙলে বাড়িটা আপনিই ভেঙে পড়বে। ও কি আজকের তৈরি মশাই ? মাটি আর ইঁটের গুঁড়ো ছাড়া ওতে আর আছে কি ছাই। আপনাদেরও সাহসের বলিহারি। ওর মধ্যে শুয়ে রাত্রে ঘুমোন কি করে ? ভয় লাগে না ?

মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে আমার সাথী বললেন : তা যা বলেছেনে। কবে যে এক রাতের ঘুম চিররাতের ঘুমে পরিণত হবে, তা এক যম রাজাই বলতে পারেন। তবে কি জানেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" মরে তো এমনিই আছি। তাই মরা বাঁচা নিয়ে

আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। আমাদের এখন ভাবনা হয়েছে, বোর্ডিংটা ভেঙে গেলে আমরা গিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেই বগলাবাবুর প্রাণটা হঠাৎ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠল। হবারই কথা। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে এ অঞ্চলে যত নাচগানের আসর হয় সর্বত্র বগলাবাবুর পৌরোহিত্য অথবা প্রধান আতিথ্য বাঁধা। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন শুনে ভক্তিতে গদগদ হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। তাছাড়া উনি বোধ হয় ভেবেছেন যে আমাদের কাছে রবীন্দ্রানুরাগ প্রকাশ করলে অরসিকের কাছে রস নিবেদন করা হবে না। আমাদের সম্বন্ধে ওঁর এই উঁচু ধারণা দেখে গর্ববোধ করতে লাগলাম।

বগলাবাবু হাত জোড় করে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে বললেন: আহাঃ গুরুদেব, প্রাতঃ স্মরণীয়। ওই পদ্যটা বুঝি তারই লেখা? খাসা লিখেছেন। "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য......" তারপর কি যেন বললেন?

: "চিত্ত ভাবনাহীন"।—আমি সানন্দে পুনরাবৃত্তি করলাম। ভদ্রলোককে যে কথায় কথায় আমাদের সম্বন্ধে আগ্রহশীল করে তুলতে পেরেছি, তাতে আর আমার আনন্দের সীমা রইল না।

: "চিত্ত ভাবনাহীন"—চমৎকার! হুঁ হুঁ, মশাই, এই সব কবিতা শুনেই তো নোবেল সাহেব পাঁচ লাখ টাকার চেক লিখে দিলে। হেমদা বলেন, 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।' অর্থাৎ কি-না কখনও হয় নি, আর হবেও না। তিনিও গত হলেন আর বাঙালী জাতটাও ফিনিশ হয়ে গেল।

আমরা অবাক বিস্ময়ে বগলাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক প্রকৃতিস্থ আছেন তো?

হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যে রকম রক্তিম এবং ঢুলুঢুলু এবং কথাগুলো যে রকম জড়ানো তাতে মনে হয়, গতরাত্রে একটু পানাধিক্য হয়েছিল। এখনও তার রেশ কাটেনি। কিন্তু ওসব দেখতে গেলে আমাদের চলবে না। বগলাবাবু মাতলামিই করুন আর উদোর পিণ্ডি নিজের হাতে চটকে বুধোর ঘাড়েই চাপান তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেণ বোর্ডিং বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখা। মাতালকে চ্যালেঞ্জ করলে তার রোক চেপে যায়। সুতরাং উনি যা বলছেন তাতে সায় দেওয়াই ভাল।

বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, যথার্থ কথা বলেছেন আপনি। আর পাঁচজনের কথা কি বলব বগলাবাবু, আমরাই তো ফিনিশ হতে বসেছি!

: কি রকম?—বগলাবাবু হেঁকে উঠলেন : আপনাদের পেছনে আবার কাঠি দিল কে?

: ঐ যে পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পড়েছে।

: ও হো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।—হঠাৎ যেন বগলাবাবু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন : বেশ তো, বাড়িটা ছেড়ে দিন। কলকাতায় কি আর মেস বোর্ডিং নেই মশাই?

: তা আছে বই কি। ও বাড়ি আমাদের ছাড়তেও হবে। চিরকাল কি আর ওখানে থাকা যাবে? তবে কি জানেন, এতকাল আছি, একটু মায়া পড়ে গেছে।

: মারাত্মক মায়া মশাই। —বগলাবাবু চমৎকার রসিকতা করলেন : ও বাড়ির মায়া যদি ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে যে দু মাস বাদে আপনাদের পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। এবার বর্ষাকালে ওটা নিশ্চয়ই ধ্বসে পড়বে। সিটি আর্কিটেক্ট ভুজঙ্গ বাড়ুজ্যে নিজে ডেকে আমায় বলেছে।

: তা যা বলেছেন। হেঁ হেঁ, পৃথিবীর মায়াই কাটাতে হবে। এ্যাঁ? দেখুন বগলাবাবু, বাড়িটা আমরা ছেড়েই দেব। তবে এক এক করে অন্য জায়গায় উঠে যেতেও কিছু সময় লাগবে তো। তাই বলছিলাম, তিন মাসের জন্য যদি নোটিশটা মুলতুবী রাখা হয়, তাহলে—

: না না মশাই, অমন অন্যায় অনুরোধ আমায় করবেন না। আইন তার নিজের পথে চলবে। তাকে রোধ করা আমার নীতি নয়। সিটি আর্কিটেক্ট যখন কর্পোরেশনের আইন ধরে বাড়ি ভাঙবার নোটিশ দিয়েছে, তখন কর্পোরেশনের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হয়ে সে আইন রদ করতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। আপনারা সব লেখাপড়া জানা ইয়ং ম্যান, আমার অসুবিধাটা একবার ভেবে দেখুন। আইনকানুন ওল্টানো কি ভাল?

: তাতো বটেই, তাতো বটেই। আইন কি আর গণেশ যে যখন তখন উল্টে দিলেই হল। তবে কি জানেন, আইনে যেমন প্যাঁচ আছে তেমনি ফাঁকও তো আছে। সেই সব ফাঁকে ঢুকে বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টাররা প্যাঁচ কষে কষে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে। তাই বলছিলাম, আইনের সেই ফাঁক দিয়ে তিন মাসের জন্য আমাদের বার করে দিলেই হয় না?

বগলাবাবু মিনিট কয়েক চুপ করে রইলেন। শেষে বললেন : না মশাই, ভরসা পাচ্ছি না। হঠাৎ যদি বাড়িটা ধ্বসে পড়ে আর আপনারা সবাই একসঙ্গে টেঁসে যান, তাহলে খবরের কাগজ-ওয়ালারা সেটাকে 'সামাজিক বিপর্যয়', 'ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারী', ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে কর্পোরেশনকে গাল দেবে। পাড়ার কাউন্সিলর হিসেবে আমার বদনাম পড়বে। ইলেকশানে ভোট পাব না। কম্যুনিষ্টরা দুয়ো দেবে। সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। তাছাড়া ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আপনারা বরং সিটি আর্কিটেক্টকে গিয়ে ধরুন।

: সে কথা বললে আমরা শুনব না, বগলাবাবু। আপনি হলেন সিটি ফাদার, অর্থাৎ কিনা নগর পিতা, আর আমরা এই নগরীর হতভাগ্য সন্তান। বাপের কাছে ছেলের আবদার চলে। আপনি থাকতে সিটি আর্কিটেক্টের কাছে গিয়ে আমড়াগাছি করতে হবে? তাও কি কখনও হয়। তাতে যে আপনার অসম্মান।

তোষামোদে বগলাবাবু একটু গললেন। তবে তেমন টললেন না। বললেন : আবদার রাখতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু সিটি আর্কিটেক্টকে না ধরলে এ কাজ তো হবার নয়।

: বেশ তো, আমাদের হয়ে আপনিই তাঁকে ধরুন।

বগলাবাবু মুখে একটা হাসি টেনে বললেন : ধরা কি এত সহজ ভাবেন? সিটি আর্কিটেক্ট ব্যাটা ভয়ানক টেঁটিয়া। মিনিষ্টারের জামাই কি-না। ধরাকে সরা ঠাওরায়। খেয়ে খেয়ে পেটটাকে এমন মোটা করে ফেলেছে যে অল্পে ভরতে চায় না।

এ কিসের ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হল না। বললাম : যে যা খায় তাকে তা না খাওয়ালে চলবে কেন বগলাবাবু। খালি পেটে কেউ কি পরের উপকার করতে পারে। ঐ জন্যই তো বলেছে, গিভ দি ডেভিল হিস ডিউ। তাঁর প্রাপ্য তিনি পাবেন।

বগলাবাবুব মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল : বেশ, চেষ্টা করে দেখব। সবাই মিলে যখন ধরে পড়েছেন, তখন আর না বলি কি করে। হওয়া না হওয়া ভগবানের হাত। না হলে কিন্তু আমায় গাল দিতে পারবেন না।

: ছিঃ! ছিঃ! কি যে বলেন বগলাবাবু, আপনাকে গাল দেবো! রামো রামো! গীতাতে ভগবান বলেছেন, কাজ করে যাও, মা ফলেষু কদাচন।

অর্থাৎ ফলের জন্য মাথা ঘামিও না। হবার হলে হবে, নইলে হবে না। তাতে রাগারাগি গালাগালির কি আছে ?

: তাহলে কাল একখানা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। আর সেই সঙ্গে—মানে—সিটি আর্কিটেক্টের পাওনাটাও।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আর আপনার পাওনাটা ?—মিষ্টি মোলায়েম এবং চাপা স্বরে বললাম আমি।

বগলাবাবু জিভ কেটে সলজ্জভাবে বললেন : আরে ছিঃ, কি যে বলেন। আমার আবার পাওনা কি ? পাড়ার পাঁচ জনের উপকার করব সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে হ্যাঁ, ধরা পড়া করতে গেলে ট্যাক্সি, চা সিগারেট লাগে। তা সে খরচটা না হয় নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দেব।

: তাও কি হয় বগলাবাবু। কাজটা যখন আমাদের, তখন পয়সা কড়ি যা খরচ করতে হয়, আমরাই করব। নিজের পকেট থেকে আপনি একটা পাই পয়সাও খরচ করতে পারবেন না। এই আমাদের দিব্বি রইল। তাহলে কাল কখন আসব ?

: সকাল বিকেল, যখন আপনাদের সময় হবে।

: তাহলে আজ আসি। নমস্কার।

: নমস্কার।

কাজটা অনেকদূর এগিয়েছে মনে করে খুশি মনে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, তখন ন'টা বাজে।

রবিবারের সকাল। মেসে খাওয়া দাওয়া হতে দেরি হবে। আমার সঙ্গীরা মেসে না ফিরে যে যার বন্ধুদের আস্তানায় আড্ডা মারতে চলে গেলেন। আমি চায়ের তেষ্টায় বগলাবাবুর বাসার কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। পেছনে একটা টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতে আমার সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখলে কলকাতার বহুলোকের হৃদকম্প হয় বলে শুনেছি। কণ্ডিসন রিফ্লেক্সএর নিয়ম অনুযায়ী আমার বুকের ভিতরটাও ধুকধুক করতে লাগল। এ যে বল্টু মজুমদার।

: নমস্কার অশোকবাবু, ভাল আছেন ?—টেবিলের উল্টোদিকে আমার মুখোমুখি বসে পড়ল বল্টু মজুমদার। ওর মুখে নিজের নাম শুনে এবং এমন অন্তরঙ্গ ভাব দেখে আরও নার্ভাস হয়ে পড়লাম। বল্টু মজুমদার এ অঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট। ধারে কাছে যত মারামারি খুনোখুনি বোমা বন্দুক স্টেনগান

রিভলভারের ঘটনা ঘটে, তা সবই নাকি ঘটায় সে। কলকাতার ছেলেবুড়ো সকলেই তাকে চেনে। কেউ ভয় করে, কেউ ভক্তি করে, কেউবা ঘৃণা করে। পুলিস তাকে দুই একবার গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর নির্বাচন তৈরীর হাল তাকেই ধরতে হয় কিনা। অবশ্য এসব আমার শোনা কথা। বল্টু মজুমদারের কার্যক্রম সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। সকলে তাকে চেনে, তাই আমিও চিনি এবং দূর থেকে সভয়ে এড়িয়ে চলি। এ হেন বল্টুবাবু যে আমার নাম জেনে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আসবেন, তা আমার ধারণার অতীত ছিল।

: সকাল বেলায় বগলা শালার কাছে কেন গিয়েছিলেন অশোকবাবু?

বগলাবাবুর সহোদরার প্রতি বল্টুর এই অহেতুক পক্ষপাতের কারণ যে ক্রোধ, সেটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু সেই ক্রোধটার স্বরূপ না বুঝতে পারার ফলে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। কারণ ক্রোধ জিনিসটা ইলেকট্রিসিটির মত একটা এনার্জি। মাটির স্পর্শ লাভের জন্য তারের ডগায় এসে উন্মুখ হয়ে থাকে। মাটি পায় ভাল। না পেলে যাকে তাকে শক মারবে। বল্টুর ক্রোধ বগলাবাবুকে ছোঁবার জন্য ছুক ছুক করছে। কিন্তু তিনি এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই সেই ক্রোধ যদি এখন 'যাকে পাব তাকে খাব' শ্লোগান তুলে আমার দিকেই হাঁ করে এগিয়ে আসে, তাহলে আমার গতিটা হবে কি?

: কি ব্যাপার, আপনি এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন কেন? আমায় চেনেন না? আমি বল্টু মজুমদার।

: সে কি কথা, সে কি কথা? সবাই আপনাকে চেনে আর আমি চিনব না? অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে বললাম আমি: বগলাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম একটা বাড়ি ভাঙার নোটিশ রদ করাতে।

: কোন বাড়িটা বলুন তো?

: তিনের একের সাত—আমাদের নিউ সিটি বোর্ডিং।

: কি বললে?—বল্টু গম্ভীর হয়ে উঠল।

: বললেন, চেষ্টা করবেন।

: হুঁ, চেষ্টা যা করবেন তা আমিই জানি।—বল্টু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকালো: টাকা কড়ি কিছু খেয়েছে নাকি?

: না, টাকাটা কাল দিতে হবে।

: একটা আধলাও দেবেন না। আপনি জানেন, তিনের একের সাত নম্বর বাড়িটা বগলা নিজে কিনেছে? কাগজপত্র সব তৈরি। তার আগে আপনাদের উচ্ছেদ করলে পারলে ওর ষোল আনা সুবিধে বিবেচনা করে সিটি আর্কিটেক্টকে দিয়ে ও নিজেই বাড়ি ভাঙার নোটিশ ছাড়িয়েছে। ও নোটিশ কিছুতেই রদ হবে না। কিন্তু রদ করবার নাম করে ও আপনাদের কাছ থেকে মোটা টাকা খিঁচে নেবে। মাথায় খালি শয়তানী প্যাঁচ। পেরেক ঠুকলে ইস্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসে।

এই অভাবনীয় কাহিনী শুনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, বগলাবাবু খদ্দরই পরুন আর রবীন্দ্রানুরাগীই হোন, আসলে মস্ত জোচ্চোর। আশ্চর্য লোকটার অভিনয় করার ক্ষমতা! আমাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে ছাড়তে যাচ্ছিলেন।

: আপনি যা বললেন সব সত্যি?

: বণ্টু মজুমদার কখনও মিথ্যা কথা বলে না। বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে এটর্নী রমেশ ঘোষের বাসায় চলুন। সব জানতে পারবেন। রমেশবাবুই বগলার বাড়ি কেনার দলিল তৈরি করছেন কিনা।

বণ্টুর কথার ধরন দেখে মনে হল না যে সে মিথ্যা বলছে। কলকাতায় এই ধরনের জুয়াচুরী প্রায়ই ঘটে থাকে। ট্যাক্সি, বাস, সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য জিনিসের লাইসেন্স এবং পারমিট বার করে দেবার নাম করে কিছু পুরানো "দেশসেবক", মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজন এবং আই-সি-এস দের টাউটরা অনেক সরল বিশ্বাসী লোককে সর্বস্বান্ত করেছে বলে শুনেছি। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে বাড়ি ভাঙার ব্যবস্থা পাকা করে বাড়ি বাঁচাবার নামে বগলাবাবু যদি দুই একশ টাকা ফালতু কামিয়ে নেন, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? চোরকে চুরি করার পরামর্শ এবং গৃহস্থকে সজাগ থাকার উপদেশ দিয়ে দুপক্ষের কাছ থেকেই কিছু কিছু কামিয়ে নেওয়া কোন নতুন কৌশল নয়। এ আমাদের ঐতিহ্য। বগলাবাবু মহাজনের পথেই এগিয়ে চলেছেন। নাঃ ভদ্রলোকের কেরামতি আছে স্বীকার করতেই হবে।

সবই তো বুঝলাম কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি না যে বণ্টু নিজে যেচে আমাদের উপকার করতে এল কেন আর কেনই বা ও বগলাবাবুর উপর এত চটা। ইলেকসানের সময় ও যে বগলাবাবুর প্রধান লেফটেনাণ্ট ছিল।

: কিছু মনে করবেন না বণ্টুবাবু। আপনি আগে বগলাবাবুর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে শুনেছি—

: ছিলাম। ফলস্ ভোট ম্যানেজ করে ওকে আমিই ইলেকসনে জিতিয়েছি।

: এখন ওর ওপর চটলেন কেন ?

: বেইমান, অকৃতজ্ঞ, চামার। যার কাঁধে ভর দিয়ে গাছে চড়েছে, তাকেই এখন আঁটি ছুড়ে মারতে চায়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বোর্ডিং বাড়িটা ভেঙে ফেললে আপনার ক্ষতি কি ?—বণ্টু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

: ক্ষতি আর কি। এতগুলো লোকের অন্য বোর্ডিং মেসে সীট খুঁজে নিতে দুই এক মাস সময় লাগতে পারে ভেবে আমরা—

: আপনার কোন ভাবনা নেই অশোকবাবু। আপনি যে হোটেলে যেতে চান, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে আমি আপনার সীট যোগাড় করে দেব। আমাকে সবাই খাতির করে জানেন তো ?

তা জানি। ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক, এ অঞ্চলের সকলেই বণ্টু মজুমদারকে খাতির করতে বাধ্য। কিন্তু সেই মহাপ্রতাপশালী বণ্টুবাবু আমার মত অজ্ঞাত অখ্যাত সামান্য ব্যক্তিকে অযাচিত ভাবে কেন খাতির করছেন সেইটাই মস্ত হেঁয়ালী।

খুব গদগদ ভাবে বললাম : আপনি আমায় সাহায্য করতে চাইছেন, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এ অনুগ্রহের কারণটা, মানে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে ?

মুখে একটা রহস্যের হাসি ফুটিয়ে বণ্টু বলল : আপনাকে চিনব সে আর আশ্চর্য কি, মশাই। বাগানে ফুল ফুটলে তার গন্ধ কি চাপা থাকে ?

বণ্টুর অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা শুনে আমার চোখ দুটো নিশ্চয়ই ছানাবড়ার মত দেখতে হয়েছিল। স্কুলে খারাপ ছেলে ছিলাম। মাষ্টারমশাইরা আমায় fool, idiot ইত্যাদি বলে গাল দিতেন। সেদিনের সেই fool যে যৌবনে ফুল হয়ে মির্জাপুর রোডের বাগিচায় ফুটে উঠবে এবং নিজের সুগন্ধে বণ্টুর মত নামজাদা লোকদের কাছে টেনে আনবে, তা তাঁরা নিশ্চয়ই অনুমান করেন নি। আমাকে হতচকিত দেখে বণ্টু মজুমদারের মুখে হাসির রেখা পড়ল।

: ছদ্মনামের আড়ালে চিরকাল গাঢাকা দিয়ে থাকা যায় না অশোকবাবু। সকলেই জানে যে নিউ সিটি বোর্ডিংএর অশোক মিত্তিরই লেখক ‘অশ্বঘোষ’।

আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ অনেক কারণ অনুমান করছি কিন্তু একেবারও মনে হয়নি যে বল্টু আমায় ঐ পরিচয়ে চিনবে। খ্যাতিমান লেখক নই আর লেখা আমার প্রধান পেশাও নয়। আসলে আমি মেকানিকাল ড্রাফ্ট্‌সম্যান। আজ পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কারখানায় কলকব্জার নক্সা আঁকি। লেখা আমার ছেলেবেলার সখ। তাই অবসর সময়ে সাদা কাগজের উপর কালো কালির আঁচড় টেনে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করি। সম্প্রতি তারই কিছু কিছু ছেপে কয়েকখানা বই বেরিয়েছে। নিজের লেখা সম্বন্ধে আমি কোন উঁচু ধারণা পোষণ করি না। আর লেখার ব্যাপারে আমার কোন আত্মবিশ্বাসও নেই। ছদ্মনামটা নিয়েছি সেই জন্মেই। মনের ভাবটা এই যে, নিন্দা যা কিছু তা ঐ ছদ্মনামটার ওপর দিয়েই বয়ে যাক, আমায় যেন স্পর্শ না করে। আমার বই পড়ে পাঠকরা নিন্দা করেন, না, প্রশংসা করেন তা অবশ্য জানি না। আমার ধারণা নিন্দাই করেন। অন্তত আমি পাঠক হলে তাই করতাম।

নিজের লেখা সম্বন্ধে যখন এই রকম হীনমন্যতায় ভুগছি তখন অপ্রত্যাশিত মহল থেকে অযাচিতভাবে একজন প্রশংসক পেয়ে যাওয়া খুব উত্তেজনার ব্যাপার। বল্টু যে গুণ্ডা নামেই সর্বত্র পরিচিত এবং গুণ্ডাবাজীর সঙ্গে সাহিত্যের যে কোন সম্পর্ক থাকবার কথা নয়, সেটা আমি বে-মালুম ভুলে গেলাম। মনে হল, বল্টু সাহিত্যের একজন সমঝদার। সাহিত্যের প্রতি ওর অনুরাগ এমন প্রগাঢ় যে আমার মত একজন নগণ্য লেখককেও ছদ্মনামের আড়াল থেকে টেনে বার করতে ওর ক্লান্তি লাগছে না। দুই বাংলার সাত কোটি বাঙালীর মধ্যে বল্টু মজুমদারকে আমার সাহিত্যের একজন গুণগ্রাহী আবিষ্কার করে আমি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

: আপনার 'সোনার শিকল' বইখানা তো সেনসেস্যানাল। আমি অন্তত তিন চারবার পড়েছি। কড়া লিখেছেন মাইরি। তবে শেষটা যেন কেমন কেমন। রেখা মল্লিককে কড়িকাঠে না ঝুলিয়ে বীরেন দত্তের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন না কেন? তা হলে সব দিক বজায় থাকত।

'সোনার শিকল' বইয়ের নায়িকা কুলটা রেখা মল্লিক কলকাতার বনেদী পরিবারের শিক্ষিত চরিত্রবান যুবক বীরেন দত্তের সঙ্গে কপট প্রণয়ের কানামাছি খেলতে খেলতে সত্যিসত্যি তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু সে

প্রেমের মর্ম কেউ বুঝতে পারেনি। হতাশায় রেখা আত্মহত্যা করে। বল্টুর কাছে এ কাহিনী ভাল লেগেছে, কিন্তু ও চেয়েছিল রেখার সঙ্গে বীরেনের বিয়ে হোক।

সত্যি কথা বলতে কি আমিও তাই চেয়েছিলাম। কাউকে খুন করার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যে অনেক মহৎ কাজ তা আমার অজানা নেই। রেখার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু পারলাম না। এমন একটা অসামাজিক মিলন ঘটাতে গেলে একদল রক্ষণশীল পাঠক অসন্তুষ্ট হয়ে আমার পেছনে লাগতে পারেন।

তাই শেষ পর্যন্ত নিজের কল্পনায় গড়া রেখা মল্লিকের গলায় নিজের হাতে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

বললাম: রেখাকে খুন করে আমিই কি শান্তি পেয়েছি বল্টুবাবু? কিন্তু উপায় কি বলুন। তাকে বীরেন দত্তের কাঁধে চাপাতে গেলে বাঙলা দেশের অনেক লোক আমার উপর চটে যেত। তারপর ধরুন, যদি কোনদিন একলা পেয়ে চোরাগোপ্তা ঝেড়ে দেয় তাহলে রেখার পেছন পেছন আমাকে কোথায় গিয়ে পৌছতে হবে তা বুঝতে পারছেন?

: কোন শালা আপনার গায়ে হাত দেবে? মেরে একেবারে তক্তা করে দেব না।—বল্টু রেগে আগুন হয়ে উঠল: সাহিত্যিকের গায়ে হাত! একি মগের মুল্লুক পেয়েছে? বল্টু মজুমদার বেঁচে থাকতে আপনার একগাছি লোমও কেউ বাঁকাতে পারবে না। যা খুশি আপনি তাই লিখবেন।

বল্টু মজুমদারের গণতান্ত্রিক সাহিত্য-বোধ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। বল্টু গুণ্ডা হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের প্রশ্নে ওর চিন্তাধারা প্রগতিশীল।

: আপনি নির্ভয়ে রেখাকে বীরেন দত্তের সঙ্গে সাতপাক ঘুরিয়ে দিন। দেখি কোন ব্যাটা আপনার কি করে।

: আর তা হয় না বল্টুবাবু। যাকে একবার মেরে ফেলা হয়েছে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলে বিয়ে দিয়ে দিলে পাঠক গল্পটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। তখন বইখানা খেলো হয়ে যাবে।

শুনে বল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: খান।

একটা সিগারেট নিয়ে দুই ঠোঁটের ফাঁকে আটকে দিতেই বল্টু লাইটার

জ্বালিয়ে দিল। রেখার মৃতদেহে আর প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব নয় জেনে বহু খুনজখমের সঙ্গে জড়িত বলে কথিত বণ্টু মজুমদারের মনটা যে রকম বিষণ্ণ হয়ে উঠল তাতে আমি সমবেদনা অনুভব না করে পারলাম না। আমার কল্পনা-লব্ধ রেখা মল্লিক একজন পাঠকের বুকের ভিতরটা এতখানি ফাঁকা করে দিয়ে গেছে দেখে গর্বে আনন্দে আমার বুকের ভিতরটা ভরে উঠতে লাগল।

বণ্টু নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল: আপনার দেশ কোথায় অশোকবাবু?

: আমার দেশ ছিল কুমিল্লায়। পাকিস্তান হবার পর বাবা বেনারসে চাকরী নিয়েছেন। সেখানেই থাকে সবাই। আপনার?

বণ্টু বলল: কলকাতায়। এই পাড়াতেই আছি, আজ দেড়শ বছর। যদু মজুমদার লেন—ওটা আমার ঠাকুর্দার নাম। জার্ডিন মিলার কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন।

শুনে আশ্চর্য হলাম। বণ্টুর ঠাকুর্দা যদি জার্ডিন মিলারের বেনিয়ান থেকে থাকেন তাহলে ওর বাড়ির অবস্থা তো খারাপ হবার কথা নয়। এমন বনেদী ঘরে জন্মে ও গুণ্ডামী করে কেন?

: আপনার বাবা?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

: মারা গেছেন। মাও তাই।

: বিষয় সম্পত্তি দেখে কে?

বণ্টু মুখে হাসি টেনে বললে: আমার চার দাদা। তাঁরা দেখাশোনা করেন। আমি ওসব বিষয় সম্পত্তির ধার ধারি না। ভগবানের দয়ায় অভাব কিছু নেই।

বণ্টুর পারিবারিক অবস্থাটা পরিষ্কার না বুঝতে পারলেও সে সম্বন্ধে আর কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। প্রথম পরিচয়ে এতটা এগোনো ঠিক হয় না।

চায়ের দোকানের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এখনও স্নান হয়নি। বেশি দেরি হলে চৌবাচ্চায় জল পাওয়া যাবে না। সুতরাং গাত্রোত্থান করা ভাল।

: আজ তাহলে—মানে অনেক বেলা হয়েছে।—আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলাম।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আপনার যখন যা অসুবিধা হয়, আমায় বলবেন অশোকবাবু। অলওয়েজ এ্যাট ইওর সার্ভিস। সিটিং বোর্ডিং ওঠে

উঠুক। আপনাকে আমি এমারেল্ড হোটেলের চারতলায় ঘর যোগাড় করে দেব। এ পাড়া ছাড়তে দিচ্ছি না।

: ধন্যবাদ।—কৃতার্থের হাসি হেসে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বোর্ডিংএ ফেরার পথে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যজনক এবং অভিনব বলে মনে হল। ডাকাত দস্যু জাতীয় লোকের সঙ্গে আগে কখনও আলাপ পরিচয় হয়নি। তাদের কথা আমি পড়েছি ডিটেকটিভ নভেলে, আর দেখেছি ছবির পর্দায়। এই ধরনের দুর্ধর্ষ লোক সম্বন্ধে আমার বরং একটা আতঙ্কই ছিল। তাই বল্টুর সঙ্গে আলাপ করে আমি কেমন বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম। বল্টুকে তো তেমন হিংস্র, নির্মম এবং রক্তলিপ্সু বলে মনে হল না। বগলাবাবুর উপর অনেক কটু এবং কড়া ভাষা প্রয়োগ করল বটে তবে কথায়বার্তায় তো ষোলো আনা ভাবালু। নইলে একটা কাল্পনিক মেয়ের আত্মহত্যায় অমন বিচলিত হবে কেন? একি বাঙলার জলবায়ুর গুণ যে সবাই শেষপর্যন্ত জগাই মাধাইএর মত হরিনামের ঝোলার মধ্যে পরমার্থ খুঁজে পায়?

বগলাবাবুকে চিনতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। সমাজের সেবক সেজে সমাজের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কি করে নিজের উদরপূর্তি করা যায়, সে আর্টটা বেশ ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছেন। তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে গদগদ হতে অথবা দেশবন্ধুর নামে চোখের জল ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। কিন্তু বল্টু যেন অচেনাই রয়ে গেল।

বোর্ডিংএ ফিরে আসতেই গদাধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কি মশাই, কিছু সুবিধা হল?

: বোধ হয় নয়।

: কেন? বগলাবাবু কি বললেন?

: তিনি বললেন চেষ্টা করবেন, আর সেজন্য কিছু ঘুষও চাইলেন।

: তাতো চাইবেনই। সেটা তো তার ন্যায্য পাওনা।

: তা বটে। তবে আসবার পথে বল্টু মজুমদারের কাছে শুনলাম, বগলাবাবু নাকি এই বাড়িটা মালিকের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছেন। দখল পাবার আগে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করতে চান। সেই জন্য নিজে তদ্বির করে কর্পোরেশনকে দিয়ে বাড়ি ভাঙার নোটিশ ছাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাদের

বোকা বানিয়ে কিছু ঘুষ খাওয়া ছাড়া আর যে কিছুই তিনি করবেন না, তা বোঝাই যাচ্ছে।

: তাই নাকি ?—গদাধরবাবু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন আমার মুখের দিকে : কথাটা কার কাছে শুনলেন ?

: বল্টু—বল্টু মজুমদারকে চেনেন না ?

: বল্টু মানে বল্টু গুণ্ডা ? তার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি ?

: আলাপ ছিল না। আজই হল।

: সে কি মশাই, ও সব খুনে দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে আবার আঁতাত কেন ? হ্যাঁ, তা বল্টুর কাছেই শুনলেন বুঝি ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: তাহলে তো মিথ্যা নয়। ওরা মশাই পাড়ার রুস্তম। কার হাঁড়িতে কটা চাল সব খবর রাখে। তাহলে এখন কি করা যায় বলুন তো ?

: ম্যানেজারকে ডেকে পাঠান। খবরটা যাচাই করে দেখি।

মিনিট কয়েক বাদে ম্যানেজার জগমোহনবাবু এসে হাজির।

: হ্যাঁ মশাই। বাড়ি ভাঙার নোটিশ পাবার পর আপনি বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

: হ্যাঁ, আজ সকালে গিয়ে দেখা করে এসেছি।

: কথাবার্তা কি হল ?

জগমোহনবাবু বললেন : বাড়িউলি তো আঁটকুড়ো বিধবা। ভাইপোকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। ব্যাটা দিন রাত্তির মদ গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। সব কথা শুনে বলল, বাড়িটা নাকি বিক্রির কথা হচ্ছে। নতুন মালিক এসে যা হয় করবে।

গদাধরবাবুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল।

: নতুন মালিকটি কে ?

: তা কিছু বলতে চাইল না। দলিল রেজেষ্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত নাম বলতে নাকি মানা আছে।

: কবে পর্যন্ত দলিল রেজেষ্ট্রি হবে ?

: মাস খানেকের মধ্যেই হতে পারে।

: তাহলে আপনি বাড়ি ভাঙা ঠেকাবেন কি করে ?

: তাইতো ভাবছি।—জগমোহনের মুখে সেই চিরকেলে হাসিটা আর নেই।

বরং তাঁর মুখখানা অত্যন্ত বিমর্ষ এবং গম্ভীর। বেচারীর এত বছরের রুজি-রোজগারে টান পড়তে যাচ্ছে। মনটা তো দমে যাবেই।

: বাড়ি ভাঙার নোটিশ কি আপনি এই প্রথম পেলেন?

: আজ্ঞে না, প্রতি বছরই তো আসে। ইন্‌স্‌পেক্টরকে দু'পাঁচ টাকা খাইয়ে দিই—ব্যাস মিটে যায়। কিন্তু এবার পেয়াদা এসে সই করিয়ে চিঠি দিয়ে গেছে। আর ইন্‌স্‌পেক্টর বলল, সিটি আর্কিটেক্ট স্বয়ং নাকি বাড়ি ভেঙে লেভেল করার হুকুম দিয়েছেন। ইন্‌স্‌পেক্টরের কিছু করবার নেই।

গদাধরবাবুর সঙ্গে আবার আমার চোখোচোখি হল। জগমোহনবাবুকে বললাম: তাহলে এবার পাততাড়ি গোটাবার আয়োজন করুন। এ যাত্রায় আর বাঁচাবার কোন উপায় নেই। স্বয়ং রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কাছে বাড়ি ভাঙা রদের দরবার করতে গিয়েছিলাম, সেই বগলা পাইন নিজেই কর্পোরেশনকে দিয়ে বাড়ি ভাঙার নোটিশ ছাড়িয়েছে। আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়।

শুনে জগমোহনের মুখখানা আরও করুণ হয়ে উঠল। তিনি ধপ করে গদাধরবাবুর খাটের উপর বসে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললেন: তাহলে আমার কি হবে গদাধরবাবু? বুড়ো বয়সে শেষে কি পথে দাঁড়াবো?

গদাধরবাবু অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে শেষে বললেন: উপায় একটা আছে। কর্পোরেশনের ঐ নোটিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ইনজাংসন চেয়ে দেখ না কেন?

: তাহলে কি হবে?—জগমোহনবাবু যেন অতল সমুদ্রে ডুবে যাবার মুহূর্তে একগাছি ভাসমান খড় খুঁজে পেয়েছেন।

: হাইকোর্ট থেকে ষ্টে অর্ডার দিতে পারে। রায় না বেরুনো পর্যন্ত বাড়িভাঙা বন্ধ থাকবে।

: তারপর?

তারপরে যে কি হবে তা গদাধরবাবু নিজেও জানেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললেন: তারপর আদালতে যা হয় হবে।

এমন অস্পষ্ট ভবিষ্যতের আশায় জগমোহনবাবু উদ্দীপ্ত হলেন না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন: কি রকম খরচ পড়বে?

গদাধরবাবু একটু ভেবে বললেন: তা খরচ কিছু হবে বইকি। বটতলার

উকিল দিয়ে তো আর হাইকোর্টের কেস লড়া যাবে না। ভাল ব্যারিষ্টার লাগাতে হবে। সব নিয়ে দু তিন হাজার টাকা লাগতেই পারে।

কথাটা শেষ হবার আগেই জগমোহনবাবু রাঁধুনির আহ্বানে সাড়া দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। যে মামলার ফলাফল অনিশ্চিত তারজন্য অর্থব্যয় করা তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই গদাধরবাবুর পাকা মাথার পরামর্শে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারলেন না।

জগমোহন বেরিয়ে যেতে গদাধরবাবু আমায় বললেন: ব্যাটা কিপ্টের জাসু। আবার হাইকোর্টে মামলা করার সাধ! কত সখ যায় গো চিতে মলের আগায় চুটকি দিতে।

গদাধরবাবু অহেতুক জগমোহনকে ব্যঙ্গ করলেন। হাইকোর্টে মামলা করার প্রস্তাব যে আসলে তিনিই উত্থাপন করেছেন, সেই কথাটা বেমালুম ভুলে গেছেন। নিজের কথা অপরের নামে চালিয়ে ব্যঙ্গরস সৃষ্টির প্রয়াস আমার কাছে ভারী মজার লাগল।

: তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি?—গদাধরবাবু পুরানো প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

বললাম: ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের অন্য জায়গায় চলে যাওয়া উচিত। এ বাড়ি বাঁচানো যাবে না।

: তাই তো দেখছি। আপনাদের ভারী অসুবিধা হবে।

বললাম: তা তো হবেই। আপনারাই কি কম অসুবিধা? এতকাল এখানে রইলেন, এখন বুড়ো বয়সে আবার মেস খোঁজাখুঁজি।

গদাধরবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললেন: আমার বিশেষ অসুবিধা হবে না অশোকবাবু। বড় জামাই সালকেয় থাকে। সেখানে গিয়ে বাস করবার জন্যে আজ ক'বছর মেয়ে-জামাই হাতেপায়ে ধরছে। বলে, বাবা আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখন তো দেখাশোনা করার লোক দরকার। কথাটা তো মিথ্যে নয়। তবু চক্ষুলজ্জায় এতকাল সেখানে যেতে পারি নি। এখন বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকব। তা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দিনগুলো একরকম ভালই কাটবে। আর মাস গেলে বোর্ডিং খরচের সত্তরটা টাকাও বেঁচে যাবে। হিসেব করে দেখলাম, চাকরীর বাকী কটা বছর যদি মেয়ের ওখানে থাকতে পারি, তাহলে নীট হাজার তিনেক টাকা জমবে। বৃদ্ধ বয়সে সেটা কিছু কম নয়। কি বলুন?

এইমাত্র গদাধরবাবু জগমোহনকে কৃপণ বলে ঠাট্টা করছিলেন। অথচ উনি নিজের যে ভবিষ্যৎ প্ল্যানের কথা বলছেন এবং তারই ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই যে সব হিসাবনিকাশ করেছেন, তাতে ওঁকে কি বিশেষণে ভূষিত করা যায় তা একমাত্র অলঙ্কার-বিশারদরাই বলতে পারেন। কিন্তু এটা লোকচরিত্র বিশ্লেষণ করার সময় নয়। সুতরাং ওদিকে মাথা না দিয়ে আমি বললাম: যাক আপনার তবু একটা ব্যবস্থা হয়েছে। বাকী সকলের কি যে হবে ভেবে পাচ্ছি না।

গদাধরবাবু মুখ বিকৃত করলেন: বাকী সকলের ভাবনা না ভেবে নিজের ভাবনাটা আগে ভাবুন দেখি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বইটই লেখেন, সাহিত্যিক মানুষ। আপনার ও সব বাজে ঝামেলায় মাথা দেবার দরকার কি?

: আজ্ঞে—

: আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়। যখন বুঝতেই পারছেন বোর্ডিং উঠে যাবে, তখন অন্যদের কি হবে না হবে ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের জায়গাই আগে যোগাড় করে নিন দেখি।

: হুঁ, তাই করতে হবে।—আমি কেমন অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলাম।

: কোথাও কোন চেষ্টা করেছেন?

: আজ্ঞে না।

: তাহলে আমার একখানা চিঠি নিয়ে আজ বিকেলেই হ্যারিসন রোডের আগরওয়াল ভবনে চলে যান। ওর তিন তলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমাদের অফিসের একজন লোক মেস খুলেছে। সেখানে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে একটা সীট খালি হতে পারে। আপনি এ ক'দিন মেসের লেসি নকুল পাণ্ডার গেষ্ট হয়ে থাকুন গে। তারপর সীট খালি হলে সেটা নিয়ে নেবেন।

বললাম: কিন্তু আমাকে সে মেসে নেবে কেন? মানে—

: নিশ্চয়ই নেবে! আমি লিখে দিলে নকুল 'না' বলতে পারবে না। সম্পর্কে আমার শ্যালক হয় কিনা।

: আপনি কি করে জানলেন যে সেখানে সীট খালি হবে?

: সকালে সেখানে গিয়েছিলাম। মেয়ের সংসারে গিয়ে থাকতে মনটা খুঁতখুঁত করছে। তাই ঘুরতে ঘুরতে নকুলের ওখানে গেলাম। দুজনে আলাপ আলোচনা শলাপরামর্শ হল। নকুল বলল, আপনি মেয়ের কাছেই চলে যান দাদা। বুড়ো বয়সে আপনজনের সেবা যত্ন না পেলে মানুষ বাঁচবে

কি করে। মেয়ে তো আর পর নয়—আত্মজা। তার কাছে গিয়ে থাকবে তাতে আবার লজ্জা কিসের। ভেবে দেখলাম কথাটা নকুল মিথ্যে বলেনি ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ কি। একই মা বাপের সন্তান তো। তাই সেখানে বসেই স্থির করলাম, মেয়ের কাছে গিয়েই থাকব। নকুল বলল, যদি একান্ত মেয়ের কাছে না যান, তাহলে আমাদের মেসে চলে আসুন। একটা সীট খালি হবে এই মাসে। আপাতত আমার গেষ্ট হয়ে থাকবেন।

দারুণ উৎসাহে আমি গদাধরবাবুকে ধরলাম: তাহলে দিন আমায় চিঠি লিখে। কালই সেখানে চলে যাই।

গদাধরবাবু বললেন: ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে নেবেন।

আমি খুশি মনে নিজের ঘরে চলে এলাম। আপনি বাঁচলে বাপের নাম গদাধরবাবুর এই কথাটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। একেবারে খাঁটি কথা। বোর্ডিংবাড়ি ভাঙা হবে জেনে কত দুশ্চিন্তাই না হয়েছিল। গদাধর বাবু আমার একটা সুরাহা করে দেওয়ায় এখন আমার মন সম্পূর্ণ ভারমুক্ত নকুলবাবু সম্পর্কে গদাধরবাবুর শ্যালক। সুতরাং গদাধরবাবুর সুপারিশ তিনি অগ্রাহ্য নাও করতে পারেন।

বণ্টু মজুমদার অবশ্য আমায় অভয় দিয়ে বলেছিল যে এমারেল্ড হোটেলের চারতলায় জায়গা যোগাড় করে দেবে, কিন্তু এমারেল্ড হোটেলের খরচ টানবার সঙ্গতি আমার নেই। তাছাড়া বণ্টু সাহিত্যানুরাগী হলেও গুণ্ডা তো বটেই একবার তার সাহায্য নিলে সে আমায় পেয়ে বসতে পারে। সে অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব সুখকর হবে না। সুতরাং বণ্টুর সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তার চেয়ে এই বেশ ভাল হল।

বিকেলে গদাধরবাবুর চিঠি নিয়ে আমি যখন আগরওয়াল ভবনে পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমাদের বোর্ডিং থেকে সেটা মিনিট পাঁচেকের পথ। বিরাট চারতলা বাড়ি। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভাড়াটে সিঁড়ি আর করিডরে যত রাজ্যের ময়লার মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গিজ গিজ করছে। ওগুলো তাদের খেলবার জায়গা। লোকজনের কোলাহলে সারাক্ষণ বাড়িতে একটা গমগমে আওয়াজ।

গদাধরবাবু নিশানা দিয়েছিলেন। কাজেই তিনতলায় মেসের ঘর খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নকুলবাবুর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বেশ

হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস চেহারা। চিঠি পড়ে আমার আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

ঃ আপনিই অশ্বঘোষ—মানে অশোক মিত্তির ?

নকুলবাবুর কাছে আমার মর্যাদা বাড়াবার জন্য গদাধরবাবু চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন যে আমি একজন লেখক এবং অশ্বঘোষ ছদ্মনামে গল্প উপন্যাস লিখে থাকি।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নামই অশোক মিত্তির।—বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলাম।

ঃ তা বেশ তো, আপনি আসবেন। গদাধরবাবু লিখে দিয়েছেন তার উপর আর কথা কি। তবে আপনি লেখক মানুষ—এই বারো ভূতের জায়গায় থাকা আপনার পোষাবে কি ? এ তো বাড়ি নয়, হাওড়ার হাট। দিনরাত হৈ হল্লা লেগেই আছে। এক এক ঘরে চারজন করে থাকি। তাস-পাশা নেশা-ভাঙ সবই চলছে। তার মধ্যে বসে সাহিত্য রচনা করা কি সম্ভব হবে ? একটু নির্জন নিরিবিলি জায়গা না হলে মাথায় ভাব আসবে কেন ? হেঁ হেঁ, বই লেখা তো আর জাবদা খাতায় হিসাব মেলানো নয়।

কথার ভাব দেখে মনে হল, ভদ্রলোক আমাকে এড়াতে চাইছেন। তাই মরীয়া হয়ে বললাম ঃ আজ্ঞে লেখাটা আমার ফালতু। ইচ্ছে করলে লিখতেও পারি, আবার নাও লিখতে পারি। তাতে কিছু আসে যায় না। আসলে আমি কারখানায় ড্রাফ্‌টসম্যানের চাকরী করি। সেইটা ঠিক থাকলেই হল।

সঙ্গে সঙ্গে নকুলবাবুর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বললেন ঃ চাকরী করেন ? আরে মশাই, সে কথাটা আগে বলতে হয়। আমি ভাবলাম আপনি শুধু বই লেখেন। সেই কারণেই আপনাকে নিতে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। লেখার টাকায় কি আর মেস খরচ টানা যায় ? মাসটা গেলেই যে নগদ ষাট-সত্তর টাকা গাঁট থেকে খসাতে হবে। কবি লেখক এরা সব নমস্য ব্যক্তি। তবে আমি তাঁদের দূর থেকে নমস্কার করতেই ভালবাসি।

ঃ কেন, কাছে গেলে কামড়ায় নাকি ?—আমি চোখ বড় বড় করে ঠাট্টার স্বরে প্রশ্ন করলাম। নকুলবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

ঃ সেই রকমই বটে। দুখিয়া পার্টি তো। ক্ষিদে পেলে কামড়েও দিতে পারে। সব সময়ই যে ভাবে বিভোর। তা আপনার তো বেশ বুদ্ধি আছে মশাই। বই 'লিখেছেন কিন্তু চাকরীটি ছাড়ছেন না। হ্যাঁ, ওটি ঠিক

রাখবেন। লিখে নামটাম হবে, পাঁচজন বাহবা দেবে, কিন্তু পেটও ভরবে না, লোকের কাছে মান-মর্যাদাও পাবেন না। সেজন্য চাই টাকা। আর বাঙালীর ঘরে যখন জন্মেছেন তখন সেই টাকা চাকরী করেই উপার্জন করতে হবে। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের চাকরী তো খারাপ নয়। ভাল কারখানায় ঢুকতে পারলে উন্নতি আছে। আসবেন আসবেন, আপনার যেদিন খুশি চলে আসবেন এই মেসে। লেখকের সঙ্গে বাস করব সে তো আমাদের গৌরবের কথা।

নকুলবাবুকে নরম পেয়ে আমি তখনই বলে ফেললাম : তাহলে কাল সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে চলি আসি। রাত্রের 'মিল'টা এখানেই খাব।

নকুলবাবু বললেন : তাই আসবেন। তবে আপনাকে যার সীটে নেওয়া হবে তিনি মেস না ছাড়া পর্যন্ত আপনি আমার গেষ্ট হয়ে থাকবেন। গেষ্ট চার্জ দৈনিক তিন টাকা। কিছু—মানে অগ্রিম পেলেই ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, গরীব ছা-পোষা মানুষদের মেস। টাকা পয়সার অনটন।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, অগ্রিম দেব বই কি। টাকা পয়সার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই।—তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলাম। অতটা নকুল বাবু আশা করেন নি।

বললেন : থাক থাক, ওটা কালই দেবেন। হ্যাঁ, যা জিজ্ঞাসা করছিলাম, গদাধরবাবু শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাড়িতেই চললেন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে নকুলবাবুর মাংসল মুখে যে হাসির রেখা ফুটে উঠল সেটা যে ব্যঙ্গাত্মক তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, আমি আর কথা না বাড়িয়ে তখনই সেখান থেকে চলে এলাম। পরদিন বোর্ডিং-এর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার পর এসে উঠলাম নতুন মেসে। নকুলবাবু আমাকে তাঁর পাশের ঘরে স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন, কারণ সেই ঘরের দু'নম্বর সীটের নিরঞ্জন সেনই শীগ্‌গিরই মেস ছাড়বে। আপাতত আমাকে নিরঞ্জনবাবুর তক্তপোষের পাশে ফাঁকা মেঝেয় শুতে হবে।

আমি যখন নকুলবাবুর সঙ্গে নিজের জায়গায় গেলাম, তখন নিরঞ্জনবাবু তক্তপোষে উপুড় হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন লিখছিলেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি কাগজটা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখলেন। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মত। ফরসা দোহারা চেহারা।

: এই যে নিরঞ্জনবাবু, আপনার সাবষ্টিটিউট।—নকুলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নিরঞ্জনবাবু ব্যস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে গদগদ কণ্ঠে বললেন। আপনি অশ্বঘোষ? আশ্চর্য। ভেবেছিলাম, আপনার অনেক বয়স কিন্তু এ যে দেখছি আমারই কাছাকাছি। বসুন বসুন। সিগারেট খান তো? এই নিন।—বলেই বালিশের তলা থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিলেন। আমি নিরঞ্জনবাবুর তক্তাপোষে বসে সিগারেট জ্বাললাম। নকুলবাবু আমার ব্যবস্থাটা নিরঞ্জনবাবুকে একবার বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

: যাক, কটা দিন একজন লেখকের সঙ্গে বাস করা যাবে। চা খাবেন?

বললাম : মন্দ কি।

নিরঞ্জনবাবু চাকরকে ডেকে নীচের দোকান থেকে দু পেয়ালা চা আনতে দিলেন। ঘরের অন্যান্য বোর্ডাররা তখনও বাসায় ফেরেন নি। সিগারেটের ধোঁয়া আর চায়ের উত্তাপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক একটা ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি। পয়সাকড়ি ভালই রোজগার করেন। বিয়ে করেছেন গত বছর। বউ নাকি খাস কলকাতার কোন বনেদি পরিবারের মেয়ে। বি-এ পাশ এবং সুন্দরী। ও কথাটা মুখ ফুটে না বললেও আমি ধরে নিতাম, যে তাঁর স্ত্রীও সুন্দরী। যাকে চোখে দেখিনি তাঁকে অসুন্দর কল্পনা করে আমার কি লাভ আছে? কিন্তু নিরঞ্জনবাবু ছাড়বার পাত্র নন। সুটকেশ খুলে পোষ্টকার্ড সাইজের একখানা ফোটোগ্রাফ বার করে আমায় দেখিয়ে দিলেন।

: এই দেখুন আমার ওয়াইফের ফোটো। চেহারাটা ভাল ওঠেনি। অসুখের পরই তোলা কিনা।—পাছে আমি তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যে কোন খুঁত ধরি, সেইজন্যে আগে থাকতেই 'অসুখের পর তোলা' বলে পেছু হঠবার পথ প্রস্তুত করে রাখলেন। ফোটোগ্রাফ দেখে মানুষের চেহারার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীর চেহারাটা বোধ হয় ভালই। ফোটোতে তাঁকে সত্যিই আকর্ষণীয় মহিলার মত দেখাচ্ছে। ছবি তোলার ভঙ্গিটাও বেশ স্মার্ট। ও যদি তার অসুখের পরের অবস্থা হয়, তাহলে আগের অবস্থা যে আরও ভাল ছিল তাতে সন্দেহ কি?

ফোটোগ্রাফটা ফেরত দিয়ে বললাম : বেশ আর্টিষ্টিক চেহারা। কন্‌গ্রাচুলেসন্‌স্‌। আপনার স্ত্রী-ভাগ্য লোভনীয়।

নিরঞ্জনবাবু স্ত্রীর রূপের প্রশংসা শুনে আনন্দে গর্বে একেবারে গলে গেলেন : হেঁ হেঁ, কি-যে বলেন। ঠাট্টা করছেন বোধহয়।

: ছি! ছি! একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ঠাট্টা করব? আপনি আমায় কি ভাবেন নিরঞ্জনবাবু! না না, ওসব অভ্যাস আমার নেই। যা সত্যি কথা, তাই বলেছি।

: আর পড়াশোনায় ভারী সখ।—স্ত্রীর রূপ বর্ণনার পর এবার তার গুণপনা ব্যাখ্যার চেষ্টা করলেন নিরঞ্জনবাবু। তার ইচ্ছে কলকাতায় এসে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবে।

খুব স্বাভাবিক ইচ্ছা। সহরের 'শিক্ষিত সুন্দরী' যে নব বিবাহিত স্বামীর কাছ-ছাড়া হয়ে গ্রামে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকতে বেশ অসুবিধা বোধ করছে, তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি খরচ করার প্রয়োজন হয় না।

: বিয়ের পর থেকে ক্রমাগত আমায় লিখছিল, তাকে যেন কলকাতায় এনে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিই। এম-এ পাশ না করতে পারলে তার নাকি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

: তাতো যাবেই নিরঞ্জনবাবু! খাস কলকাতার মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে তার জীবন ব্যর্থ না হয়ে যায় কোথায় বলুন?

নিরঞ্জনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বহুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষে গল্পের হারানো সূত্র ধরে আবার সুরু করলেন : শেষ পর্যন্ত লিখল, জুন মাসের মধ্যে আমি যদি তাকে কলকাতায় না আনতে পারি, তাহলে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে।

: আত্মহত্যা! এ্যাঁ। সে যে সাংঘাতিক ব্যাপার মশাই।—আমি চমকে উঠলাম।

: আর বলেন কেন!—নিরঞ্জনবাবুর মুখে কেমন একটা আত্মবিশ্বাসের রেখা পড়ল। ছেলেমানুষ কিনা। কথায় কথায় অভিমান। আমি তো মশাই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। যে রকম একগুঁয়ে মেয়ে, তাতে ভগবান না করুন, কোন দিন ঝুলেও তো পড়তে পারে। শাস্ত্র বলছে, মেয়েদের মনের কথা স্বয়ং ভগবানও বুঝতে পারে না, আমরা তো কোন ছার। একলা থাকে, কখন মাথায় কি দুর্বুদ্ধি চাপবে কে জানে?

বললাম : আপনার এই ধারণাটা ভুল নিরঞ্জনবাবু। মেয়েদের মনের খবর না রেখেও বই লেখা যায়। এই ধরুন আমার কথা। কোন মেয়ের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা দূরের কথা মৌখিক আলাপ পর্যন্ত নেই। তবু আমি মেয়েদের নিয়ে দিব্বি গল্প উপন্যাস লিখে যাচ্ছি। কেউ আমার হাত চেপে ধরতে আসে না। হ্যাঁ, তারপর কি হল আপনার স্ত্রীর? আত্মহত্যা করার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখলেন?—আমি মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসবার চেষ্টা করলাম।

: সেই চিঠি পাবার পরই আমি মরীয়া হয়ে বাসা খুঁজতে লাগলাম।

: তারপর?

: পেয়ে গেছি।—দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরলেন নিরঞ্জনবাবু: হয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ দি ওয়ে। এই মাসের গোড়াতেই ওয়াইফের কলকাতায় আসবার কথা ছিল। বাবার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে কটা দিনের জন্য আটকে গেছে। সামনের সপ্তাহেই এসে পড়বে।

যাক ব্যাপারটা সব রকমেই মধুরেণ সমাপয়েৎ হচ্ছে। নিরঞ্জনবাবু আর তাঁর স্ত্রীর বিরহ সমস্যা তো মিটছেই, সেই সঙ্গে আমার বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। জয় হোক নিরঞ্জন-দম্পতির।

: সত্যি কথা বলব, আপনার স্ত্রীর স্বামী ভাগ্য যে কোন মেয়ের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।

নিরঞ্জনবাবু হাসতে হাসতে বললেন : একবার শুনলাম আমার স্ত্রী-ভাগ্য লোভনীয়, এখন শুনছি আমার স্ত্রীর স্বামী-ভাগ্য ঈর্ষার বস্তু। তাহলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো?

: খারাপ জায়গায় নয়। দেখা যাচ্ছে, আপনি এবং আপনার স্ত্রী কেউ কাউকে ঠকাতে পারেন নি। দুজনেই ষোল আনা লাভ করেছেন।

: মানে?—নিরঞ্জনবাবু কেমন বিভ্রান্তের মত তাকালেন আমার দিকে।

: মানে খুব সোজা। যে কোন লেনদেনে এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপর দাঁও মারবার চেষ্টা করে। সেইটাই হল সমাজের রীতি। বিয়েটা যদি একটা ট্রানজাকসন অর্থাৎ লেনদেনের ব্যাপার হয় তাহলে এখানেও সেই একই নিয়ম চালু রয়েছে। কিন্তু আপনারা তার ব্যতিক্রম।

নিরঞ্জনবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার এই স্থূল রসসৃষ্টির প্রয়াস এমন সুফল ফলেছে দেখে আমিও হাসতে লাগলাম। ধৈর্যশীল শ্রোতা

পেয়ে নিরঞ্জনবাবু এবার তাঁর স্ত্রীর চুলের মাপ ও ঘনত্ব, কথা বলার স্টাইল, ইংরাজী জ্ঞান, সঙ্গীত সাধনা, সাহিত্য, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ক গল্পে মশগুল হয়ে উঠলেন। সব শোনার পরও তাঁর পত্নীর বহুবিধ গুণাবলী সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ থেকে যেতে পারে আশঙ্কা করে শেষ পর্যন্ত তিনি বলে রাখলেন যে, ভদ্রমহিলা কলকাতায় এলে একদিন আমায় চায়ের নিমন্ত্রণ করে তার কণ্ঠসঙ্গীত শুনিয়ে দেবেন

: ধন্যবাদ।—মুখে হাসি টেনে কৃতজ্ঞতার সুরে বললাম আমি।

: আপনি বিয়ে করেননি ?

নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অনেক রগড়ারগড়ির পর এবার আমার "স্ত্রী"কে নিয়ে টানাটানি সুরু করলেন নিরঞ্জনবাবু।

: আজ্ঞে না, বিয়ে করিনি।

: কেন করেন নি ?

আমি হাল্কা পরিহাসের মুডে ছিলাম। বললাম : করিনি বলা ঠিক নয়। আসলে আমার বিয়ে হয়নি।

: হল না কেন ? বাড়িতে কোন অসুবিধা আছে বুঝি ?

: না, বাড়িতে আর অসুবিধা কি ? অসুবিধা বাইরে।

: কি রকম ?

আমি একটু ভেবে গম্ভীর গলায় বললাম : মেয়েরা আমায় পছন্দ করে না। দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সবাই কি আর আপনার মত ভাগ্যবান, মশাই ?

নিরঞ্জনবাবু হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথাটা বিশ্বাসও করছেন না, আবার অবিশ্বাস করতেও সাহস হচ্ছে না। শেষে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন : আরে রেখে দিন মশাই পছন্দ অপছন্দের কথা। বাঙলা দেশে কি মেয়ের অভাব ?

: আজ্ঞে না, মেয়ের অভাব খুব নেই। সেন্সাস রিপোর্ট বলছে, বাঙলা দেশের ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ কম। সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়! শেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে কোন দিনই মেয়ের অনটন হবে না।

: তবে ? তবে ? দেখুন গে কত মেয়ে আপনার জন্য মালা গাঁথছে—

ভাবাবেগে আরও অনেক কিছু বলে ফেলতেন নিরঞ্জনবাবু। আমার হাসির শব্দে থেমে গেলেন। আধুনিক বাঙলা গানে মালা গাঁথা, মালা ছেঁড়া,

মালায় ফুল নিয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন, মালার সুতো গলায় জড়িয়ে অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা এবং হা-হুতাশের ঘটনা এত ঘনঘন ঘটে যে তার প্রভাব এড়ানো বড় কঠিন। নইলে মেয়েরা রাশিকৃত ফুলের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে মালা গাঁথছে—এমন বিচিত্র কল্পনা নিরঞ্জনবাবুর মাথায় এল কি করে। নিজের হবু অর্ধাঙ্গিনীকে নিরঞ্জনবাবুর চোখে মালিনীর বেশ দেখে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল।

: হাসছেন যে?

: আপনার স্ত্রী বুঝি ফুলের মালা গাঁথতে ভালবাসেন?—আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

: ভীষণ। খোঁপায় ফুল না পরলে তার চুলবাঁধা অসম্পূর্ণ থাকে। ফুল পেলে সে আর কিছু চায় না।—নিরঞ্জনবাবু আমার কল্পিত স্ত্রীকে ছেড়ে আবার নিজের স্ত্রীকে ধরেছেন দেখে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

: আপনার স্ত্রীকে চোখে দেখিনি বটে তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারছি, ভদ্রমহিলার রুচিটা খুব উন্নত। সি ইজ এ্যাবাভ এ্যাভারেজ।

শুনে নিরঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই খুব গদগদ হয়েছিলেন কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারলেন না, কারণ ঠিক সেই সময় একজন লোক এসে ঢুকলেন ঘরে। বয়স বছর চল্লিশের মত। রোগা কালো লম্বা চেহারা।

নিরঞ্জনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। রুম মেট হরিপদ সমাদ্দার। মেডিকেল কলেজের স্টোরে চাকরী করেন। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ শেষ হবার আগেই ঘরের অপর দুই বাসিন্দাও এসে হাজির। অশেষ রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক। দুজনেই বাবুঘাটে জেটি সরকার। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দেখলাম নিরঞ্জনবাবুই এখানকার সর্ব কনিষ্ঠ বোর্ডার।

যখন ঘরের সমস্ত বোর্ডার ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করতে লাগলেন, তখনই আমি প্রথম অনুভব করলাম যে, ঘরখানা চারজন লোকের বাস করার পক্ষে সত্যিই বেশ ছোট।

নকুলবাবু বলেছিলেন, এখানে তাস-পাশা নেশা-ভাঙ চলে। দু'চার দিনের মধ্যে বুঝলাম, কথাটা মিথ্যা নয়। নিরঞ্জনবাবু ছাড়া বাকী সকলেরই সন্ধ্যাবেলায় একটু রঙিন হবার অভ্যাস আছে। তবে তা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। মৃত্যুঞ্জয়বাবু মাঝে মাঝে দুই-একটা বেফাঁস কথাবার্তা বলে

ফেললেও তাঁর অপর দুই বন্ধু খুব স্টেডি লোক। এক ঘরে না থাকলে বোঝাই যেত না যে তাঁরা মদ খান।

মাঝে মাঝে ফ্লাশের আড্ডাও বসে। তাতে বাইরের লোক দু-চারজন এসে যোগ দেন। গভীর রাত পর্যন্ত বাতি জ্বেলে পয়সার লেন-দেন হয়।

নেশাড়ী অথবা জুয়াড়ী সম্বন্ধে আমার কোন অকারণ ভীতি নেই। মার খাবার ভয় না থাকলে সব রকম লোকের সঙ্গেই বাস করতে পারি। ওঁরা মদই খান আর জুয়াই খেলুন, আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। কাজেই সেদিক দিয়ে আমার বিশেষ অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা দেখা দিল কল পায়খানায়। বাড়ির প্রত্যেক তলায় পনোরো কুড়িটি করে পরিবার বাস করেন। কিন্তু তাদের জন্য প্রত্যেক তলায় পায়খানা মাত্র দুটি আর কলঘর একটি। রোজ সকালে সেখানে কল পায়খানার দখল নিয়ে গালাগালি, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুতি লেগেই আছে। মেয়ে-পুরুষ কেউ কারও হক ছাড়তে রাজি নয়। জায়গাটা নরক হয়ে ওঠে।

মেস-বোর্ডিংয়ে বাস করছি বহুকাল কিন্তু ঠিক এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনও হইনি। জল পায়খানার ব্যবস্থা সব জায়গাতেই ভাল পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে স্নানের 'বিলাস' আমাকে একেবারে ছেড়েই দিতে হল এবং তাতে আমি বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

যে ক'দিন নিরঞ্জনবাবু মেসে ছিলেন, সেই ক'দিন তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময়টা একরকম কেটে যাচ্ছিল। তিনি বাসায় চলে যাবার পর আমি নিঃসঙ্গ এবং নিরানন্দ বোধ করতে লাগলাম। আমার রুম মেটরা খারাপ লোক নন, কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁদের ধারণা হয়েছে "লেখকের" সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। তাই তাঁরা আমায় যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন। নিজেরা সেধে কখনও কোন কথা তো বলেনই না, আমি কোন কথা বললে এমন সবিনয়ে এবং ভক্তিভরে তার জবাব দেন যে আমিই সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। যতদূর মনে হয়, নাটক নভেল পড়ার অভ্যাস ওঁদের নেই। তবু যে ওরা এত লেখক-সচেতন কেন তা বুঝতে পারি না।

আমি ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু সুবিধা হল না। ফ্লাশের বোর্ডে বসতে গেলে ওঁদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। মদ খেতে চাইলে ওরা এমন ভাবে হাসেন, যেন আমি অর্বাচীনের মত একটা অবাস্তব প্রস্তাব করেছি। গল্পগুজব আড্ডা-বৈঠকের দিকে ছেলেবেলা থেকেই আমার

একটু ঝোঁক বেশি। এতদিন আমি যে সব জায়গায় বাস করেছি, সেখানে আড্ডার অভাব হয়নি। এ মেসে নিজের মনের মত আড্ডা না পেয়ে আমার অবস্থা দাঁড়ালো ডাঙায় তোলা মাছের মত। আড্ডার খোঁজে আমি বন্ধু-বান্ধবের আস্তানায় হানা দিতে লাগলাম। শুধু খাওয়া আর শোয়া ছাড়া মেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রইল না।

আমার এই অস্বস্তির ভাবটা হরিপদবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। মাস কয়েক বাদে একদিন সকালে দাড়ি কামাবার সময় তিনি আমায় বললেন: নিরঞ্জনবাবুর কাছে শুনেছিলাম, আপনি বইটই লেখেন। কিন্তু কই, আপনাকে তো কখনও কাগজকলম নিয়ে বসতে দেখি না। সারাক্ষণই তো বাইরে বাইরে কাটান।

আমি হেসে বললাম: না এখানে আসার পর আর লেখা হয়নি।

: কেন বলুন তো।—তিনি গভীরভাবে কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

বললাম: কি জানি কেন। লেখায় মন বসতে চায় না।

হরিপদবাবু অনেকক্ষণ মৌন থেকে শেষে বললেন: মন আর বসবে কি করে বলুন। সঙ্গদোষ বলেও তো কথা আছে। আমাদের মত মুক্‌সুক্ষু লোকের মধ্যে থেকে কি কেউ লেখাপড়ার কাজ করতে পারে?

: না না, ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলবেন না। দাড়ি কামানো বন্ধ রেখে আমি প্রতিবাদ করলাম: আপনাদের সঙ্গে আমার লেখা বন্ধ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এটা নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার।

: আপনি যাই বলুন, জায়গাটা আপনাকে স্যুট করছে না। লেখক মানুষের জন্য একলা একটা আলাদা ঘর চাই। তা না হলে কি লেখা আসে?

বললাম: একলা একটা ঘর আজকের দিনে আকাশের চাঁদের মতই দুর্লভ।

: তা কেন বলছেন। কলকাতা সহরে চেষ্টা করলে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিস আছে?

আমি হেসে ফেললাম: তেমন উদ্যমী পুরুষ নই হরিপদবাবু। বাঙালীর আলস্য আমার মজ্জায় মজ্জায়।

হরিপদবাবু বললেন: আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখবো। আপনি কতটাকা পর্যন্ত দিতে পারেন?

আমি একটু ভেবে বললাম: মাইনে পাই সওয়া দু'শ টাকা। আলাদা কল পায়খানাওয়ালা ভাল ঘর পেলে চল্লিশ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।

ঃ রান্নাবান্নার জন্ম চাকর রাখতে হবে তো ?

ঃ না, কোন দরকার নেই। কাছাকাছি হোটেল থাকলেই আমার চলবে।

ঃ ঠিক আছে। কথাটা আমার মনে রইল। খোঁজ পেলে জানাবো।

ঃ ধন্যবাদ।

আমার প্রতি হরিপদবাবুর এই সহানুভূতি দেখে মনটা স্নিগ্ধ প্রীতির রসে আর্দ্র হয়ে উঠল। হয়তো হরিপদবাবু কোন দিনই একটা ঘর খুঁজে পাবেন না। পেলেও হয়তো সে ঘরে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। তবু উনি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার উপকার করতে চাইছেন, তাতেই কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরে উঠছে।

সেদিন নিজের মনটা এমন হাল্কা হয়ে গেল যে মেসের অসুবিধাগুলো আর আগের মত চিমটি কাটল না। কারখানায় কাজ করতে করতে সারাক্ষণ ভাবলাম, আজ বাসায় গিয়ে হরিপদবাবুর সঙ্গে ভাল করে আলাপ জমাবো। এতদিন বাদে উনি যখন আমার সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছেন, তখন ওঁদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে নিতে আর আমার কোন অসুবিধা হবে না।

সন্ধ্যা ছ'টায় মেসে পৌঁছে দেখি ওঁরা কেউ তখনও ফেরেন নি। আমি মুখহাত ধুয়ে চা খাবার জন্য নীচে নেমে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই ভীড়ের মধ্যে কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। পেছনে তাকিয়ে দেখি বল্টু মজুমদার। পরনে সিল্কের ট্রাউজার, কোট আর নেকটাই। একেবারে পুরো সাহেব। বল্টুর চেহারাটা বেশ লম্বা চওড়া এবং সুগঠিত। মনে হয় ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে। সাহেবী পোশাক ওকে চমৎকার মানিয়েছে।

ঃ এই যে অশোকবাবু, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে যাচ্ছি। কোথায় পালিয়েছেন বলুন তো।

কোথায় আছি তা সব খুলে বললাম।

ঃ আরে, তাহলে তো পাড়ার মধ্যেই রয়েছেন দেখছি। কোন অসুবিধা নেই তো ?

অসুবিধা যা আছে তা ওর কাছে প্রকাশ করে কোন ল্যাভ নেই। বললামঃ অসুবিধা আর কি ? এক রকম কেটে যাচ্ছে।

: আপনাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন।—বল্টু আমার ডান হাতখানা চেপে ধরল।

: আমাকে দরকার?—আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

: আজ্ঞে হাঁ, আপনাকেই। আসুন ওয়াই-এম-সি-এতে বসে চা খেয়ে নি।

: চলুন।—মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। আমাকে ওর কি প্রয়োজন হতে পারে তা আমি অনেক চিন্তা করেও অনুমান করতে পারলাম না।

কিউবিক্‌লের মধ্যে মুখোমুখি বসে বল্টু বেশ মোটা রকমের খাবার অর্ডার দিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল: কোথায় যাচ্ছিলেন?

: চা খেতে বেরিয়েছিলাম।

: অন্য কোন কাজ নেই তো?

: না, তেমন কিছু নেই।

: বেশ, তাহলে একটু বসে গল্প করা যাক।—খুশি মনে টাইটা আলগা করে নড়েচড়ে বসল বল্টু: আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন অশোকবাবু?

: অনুরোধ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার ঘাবড়ে গেলাম। বল্টু মজুমদার যেটাকে অনুরোধ বলছে, সেটা যে তার আদেশ হয়ে উঠতে বেশি সময় নেবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গুণ্ডা জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে আমার তাই ধারণা। ও যদি আমাকে ওর কোন কাজে লাগতে চায়, তাহলে লাগাবেই, তা সে অনুরোধ করেই হোক আর আদেশ করেই হোক। আর গুণ্ডার 'অনুরোধ' আমার পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় হবে বলেও মনে হয় না। হয়তো চোরাই মাল রাখতে দেবে কিংবা হয়তো আমাকে সামনে রেখে কোন জাল-জুয়াচুরীর কাজ হাসিল করবে।

: বলুন, রাখবেন অনুরোধটা?—বল্টু খুব মোলায়েম স্বরে জানাতে চাইল।

: অনুরোধটা কি?—আমার গলার স্বর মিহি হয়ে গেছে।

: খুব সামান্য ব্যাপার। আপনার তাতে কোন লোকসান নেই, আর আমার অনেক লাভ।—হাসি মুখে বলল বল্টু। লাভ লোকসানের কথা শুনে

বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। নির্ঘাত কোন চুরি-ডাকাতির ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে।

: আপনি যা ভাবছেন তা নয়।—মুখ টিপে হাসল বল্টু।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম : কি ভাবছি আমি ?

: যা ভাবছেন তা আপনার মুখের চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যাচ্ছে। না না, সে সব কিছু নয়। ছোট্ট একটা অনুরোধ। আমার সঙ্গে আপনাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

: কোথায় ?—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

: খারাপ যায়গায় নয়। ভদ্রলোকের বাড়িতে।

: কেন বলুন তো ?

: এমনই।

: মানে ?

: মানে—ধরুন, তারা আপনাকে দেখতে চায়।

: আমাকে দেখতে চায় ? সে কি মশাই ? আমি তো মোটেই সুপুরুষ নই।—এতক্ষণ আমি সহজ সুরে কথা বললাম।

: সুলেখক তো বটে।—বল্টু হাসল।

: তাও নই। চামচিকে পাখি নয় বল্টুবাবু। সামান্য দু-এক খানা বই লিখলেই কেউ লেখক হয়ে যায় না। আমি কখনও নিজেকে লেখক বলে মনে করি না। ড্রাফট্‌স্‌ম্যানশিপ জানা আছে। সেই বিদ্যায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান হচ্ছে। সুতরাং সেইটাই আমার সত্যিকারের পরিচয়।

বল্টু বলল : কথার মারপ্যাচ অত বুঝতে পারি না অশোকবাবু। লেখাপড়া স্কুলফাইনাল প্লাকড্। আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, অনুরোধটা রাখুন। সেখানে গেলে আপনার সম্মানহানি হবে না।

: মান সম্মানের ব্যাপার নিয়ে আমার মোটেই মাথা ব্যথা নেই। দরকার পড়লে নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কি জানেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

: তাহলে খুলেই বলি।—সিগারেটের বাক্স থেকে সিগারেট বার করল বল্টু। তারপর দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে বলল : একজন বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। লাইব্রেরী থেকে গাদা গাদা বই এনে পড়ে। একদিন তার টেবিলে আপনার 'সোনার শিকল' দেখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জমে গেলাম।

সেই সময় আমি প্রথম জানতে পারি যে আপনি এই পাড়াতেই বাস করেন। কয়েক মাস আগে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হবার পর সেই বইয়ের পোকার কাছে সে-কথা প্রকাশ করি। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না যে, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তখন আমি তার কাছে বড় গলা করে বলেছিলাম যে, আপনাকে একদিন তার কাছে নিয়ে গিয়ে আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করব। কিন্তু আপনার আর দেখা পাই না।

: ব্যাপারটা একটু ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না? আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকা এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার যে সেটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকল?

বল্টুর মুখে কেমন একটা কোমল ভাব ফুটে উঠল। একটা হাসির আভাস তার চোখ দুটোকে নরম করে দিল। বলল: ছেলেমানুষ বইকি। আমাকে বাজে মুখ্যু লোক বলে মনে করে। তাই তো বিশ্বাস করে না যে, একজন লেখকের সঙ্গেও আমার পরিচয় থাকতে পারে।

আমি বিস্ময় বোধ করলাম। একজন বল্টুকে বাজে মুখ্খু লোক বলে মনে করে সে কথা ভালভাবে জানা সত্ত্বেও বল্টু তার মাথাটা না ফাটিয়ে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং তার মন রাখবার জন্য আমার কাছে এসে কাকুতি মিনতি করছে। সে "ছেলেমানুষ" অথচ দেখা যাচ্ছে বল্টুর মত দুর্দান্ত লোকও তার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এযে সত্যিই বড় অদ্ভুত ঘটনা।

: কি, যাবেন তো?—বল্টু আবার প্রশ্ন করল।

বললাম: যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কি জানেন বল্টু বাবু, আমার গায়ে তো লেখা নেই যে, আমি অশ্বঘোষ। আপনার সেই লোক আমাকে অশ্বঘোষ বলে নাও মানতে পারেন। তখন আপনি কি করবেন?

: ইস্, না মানলেই হল আর কি।

: নাও তো মানতে পারেন। আপনি রাম, শ্যাম, যদু যে কোন একজনকে অশ্বঘোষ সাজিয়ে তাঁর সামনে হাজির করেন নি, তাই বা তিনি বুঝবেন কি করে?

বল্টু পরিস্থিতিটা একবার মনে মনে ভেবে নিতে লাগল। আমি বললাম,

: সেই রকমই করে দেখুন না কেন। তিনি যখন আপনাকে ল্যাঙ

মেরেছেন, তখন আপনিও তাঁকে ল্যাঙ মারবার জন্যে যে কোন একজনকে অশ্বঘোষ সাজিয়ে তার সামনে হাজির করিয়ে দিন।

বল্টু রাজী হল না। গম্ভীর গলায় বলল : তার সঙ্গে আমার হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক নয় অশোক বাবু। আমি আসল লোক নিয়ে যাব। বিশ্বাস করে ভাল, না করে বয়ে গেল। নিজের দিক থেকে আমি পরিষ্কার থাকতে চাই।

: ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন তখন যাওয়া যাবে। জায়গাটা কোথায়?

: খুব কাছেই।

: তনি পুরুষ না মহিলা?

বল্টু মুখে হাসি টেনে বলল : গেলেই দেখতে পাবেন। সে আপনার লেখার দারুন ভক্ত।

শুনে আমি আবার ঘাবড়ে গেলাম। পুরুষ হলে কোন কথা নেই কিন্তু যদি মেয়ে হয়? বল্টুর যে রকম দুর্নাম তাতে কোন ভদ্রবংশের বই-পড়া মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ থাকার সম্ভাবনা কম। তাহলে কি সমাজের বাইরের কোন মেয়ের কাছে নিজের কেরামতি দেখবার জন্য ও আমায় তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে? কিন্তু তাই বা হবে কি করে? ও তো স্পষ্টই বলছে যে তার সঙ্গে ওর সম্পর্ক হাসি ঠাট্টার নয়। কেমন বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম। শেষে মনে হল, বল্টু বড়ঘরের ছেলে। ও যাই হোক, ওর দাদারা নিশ্চয়ই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। হয়ত কথায় কথায় তাদের কারও সঙ্গে ওর বাজি লড়ালড়ি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমাকে নিজেদের বাড়িতেই নিয়ে তুলবে। যাই হোক, কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, তখন আর ফেরানো চলে না। গিয়ে দেখাই যাক না কি হয়। একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে।

: তাহলে কবে আপনি সময় করতে পারবেন?—জিজ্ঞেস করল বল্টু।

: যে কোন দিনই হতে পারে।

: কাল বিকেলে আপনার কোন কাজ নেই তো?

একটু ভেবে বললাম : না নেই।

: তাহলে কাল সন্ধ্যার মুখে আপনাকে মেস থেকে তুলে আনব। আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন।

: বেশ তাই হবে।

বল্টুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেসের দিকে পা বাড়ালাম। মনটা বেশ একটু উত্তেজিত। পাঠকের প্রশংসা লেখকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। যতই নগণ্য হই, সেদিকে আমার লোভ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা দারুন মোহ অনুভব করতে লাগলাম।

পরদিন সন্ধ্যার মুখেই বল্টু এসে হাজির। গতকাল ও পুরো সাহেব ছিল, আজ খাঁটি বাঙালী। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জির উপর দামী অর্গাণ্ডির পাঞ্জাবী, পরণে শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের চটি, বাঁ হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে দুটো আঙটি। পাতলা পাঞ্জাবীর তলা দিয়ে ওর চেহারার বাঁধুনিটা ফুটে উঠেছে। কাঁধ, বুক এবং হাতের পেশীগুলো এমন সুগঠিত যে দেখলে লোভ হয়! নিজের স্বাস্থ্যটা অতি নিকৃষ্ট বলে অপরের ভাল স্বাস্থ্য দেখলেই আমি অভিভূত হয়ে যাই।

: কি দেখছেন অশোকবাবু?

: আপনার স্বাস্থ্যটা।

বল্টু একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল: ছেলেবেলা থেকে ঐ স্বাস্থ্যচর্চাই করেছি, মস্তিষ্কের চর্চা তো করিনি।

: করলে কি হত?

বল্টু একটু ভেবে বললে: বাপ ঠাকুর্দার নাম রাখতে পারতাম।

অনেক লোক "আপনি বেঁচে বাপের নাম" রাখে। বল্টুর পিতৃপুরুষের নাম রাখার ধরনটা অন্যরকম দেখা যাচ্ছে।

নীচে নামতে নামতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, বল্টু শেষ পর্যন্ত আমাকে ওদের পৈত্রিক বাড়িতে ওর কোন দাদার সামনে নিয়ে হাজির করবে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সেটা মনে হল না। ওর বাড়ি যদু মজুমদার লেনে। সে রাস্তাটা আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছাকাছি। আর ও আমাকে নিয়ে চলল সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ফাঁকা ট্যাক্সি ডেকে বলল: উঠুন।

আমি হকচকিয়ে গেলাম: অনেক দূর নাকি?

: না। কাছেই।

: তবে যে ট্যাক্সি চাপছেন?

: তাড়াতাড়ি হবে। আপনি অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?—বল্টু হাসল।

আমি মুখে হেসে প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে ঘাবড়াই নি। গাড়িখানা বৌবাজার-সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মোড় ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকের গলিতে ঘুরে গেল। একটা বড় বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বণ্টু বলল,

: নামুন।

আমি নেমে দাঁড়ালাম। এই সামান্য রাস্তাটুকুর জন্য ট্যাক্সি ডাকবার কি প্রয়োজন ছিল বুঝলাম না।

বাড়িটা দেখে মনে হল, সেখানে বাঙালীর চেয়ে অবাঙ্গালীই বাস করেন বেশি। ঝুল বারান্দার সাজগোজ সেই রকমই।

: চলুন।—বণ্টু আমায় পথ দেখিয়ে সিঁড়ির সামনে নিয়ে হাজির করল।

জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার বন্ধু বুঝি বাঙালী নন?

: এখনই টের পাবেন।—বিচিত্র ভঙ্গি করে হাসল বণ্টু।

এই রহস্যের পরিবেশ আমার মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে লাগল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমায়? ওদের কোন ডেন অর্থাৎ আড্ডাখানায় নয়ত? নইলে এইটুকু রাস্তার জন্য ট্যাক্সি করবে কেন? পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য নয় কি?

দোতলায় উঠে সিঁড়ির বাঁ পাশের দরজায় টোকা দিল বণ্টু। আমি তার পেছনে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজা খুলে গেল। অতি সাধারণ একটা পর্দা ঝুলছে। তার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে দাসী জাতীয় একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক।

: দাদাবাবু। আসুন।—দরজার কবাট দুটো ভালো করে খুলে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সে। আমার বুকের ভিতরটা মুহূর্তেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল, এটা গুণ্ডার আড্ডাও নয় আর অবাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহও নয়। এ যেন অন্য কিছু। গোড়াতে যা সন্দেহ করেছিলাম, এ বোধ হয় তাই। পৌঢ়া স্ত্রীলোক দেখে কেমন কেমন লাগছে। খুব সম্ভবত বণ্টু আমায় তার মিসট্রেসের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সেই জন্যই ওর এত ঢাকঢাক গুড়গুড়। শুনেছি, গুণ্ডাদের প্রায় সকলেরই মিসট্রেস থাকে। বাঙালা দেশে লেখাপড়ার চর্চা বেড়েছে। কাজেই ওর মিসট্রেস যদি নভেল নাটকের 'পোকা' হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া আজকাল নাকি ভদ্রঘরের অনেক মেয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে কুলটাবৃত্তি করে। কখনও অভাবে, কখনও স্বভাবে। বণ্টুর মিসট্রেস যদি ইউনিভার্সিটির দুই একটা

ডিগ্রি নেওয়া মেয়ে হয়, তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। বল্টুর সামাজিক মর্যাদা যাই হোক, টাকা পয়সা সংগ্রহ করা তার পক্ষে অতি সহজ কাজ। সুতরাং এই রকম একটা মিসট্রেস পুষলে মোটেই বে-মানান হয় না।

কিন্তু তখনই খট্‌কা লাগল। মিসট্রেসের সঙ্গে হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক নয়—এও তো বড় অদ্ভুত কথা।

বল্টু পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর পদক্ষেপ করে বলল : আসুন।

ঢুকে দেখলাম ঘরখানা খুবই ছোট। একপাশে একটা তক্তাপোষের উপর আধ ময়লা একটা বিছানা জড়ানো রয়েছে। তারই বাঁদিকে কেরসিন কাঠের একখানা টেবিল আর খান দুই টুকরো কাঠের চেয়ার। টেবিলের ডান দিকে একটা বেত কাঠির র‍্যাক। তাতে এক গাদা বই। টেবিলের উপরেও খান কতক বই আর একটা ফাউন্টেন পেনের কালি পড়ে আছে।

: বসুন অশোকবাবু। আমি আসছি।—বল্টু মাঝ দেওয়ালের দরজার পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ারে বসে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে আবোল তাবোল ভাবতে লাগলাম। শেষে টেবিলের উপর পড়ে থাকা বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে নজরে পড়ল, সেগুলো পাঠ্যপুস্তক। ভিতরে নামও লেখা আছে—অনুরাধা সরকার, বি-এ ক্লাস, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট।

দেখে আমি আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। কাদের বাসা এটা? কে এই অনুরাধা সরকার? তার বাবা ভাইরাই বা কোথায়? বল্টুর কোন আত্মীয় নয়তো?

মিনিট দশেক বাদে বল্টু ফিরে এল এই কামরায়। মুখখানা গম্ভীর। পকেট থেকে সিগারেটের কৌটো বার করে টেবিলের উপর রেখে বললে : খান অশোকবাবু। বাড়িতে অসুখ, তাই দেরি হল।

: কার অসুখ?

: মায়ের।—গম্ভীর গলায় বলল বল্টু। নিজের মা নিশ্চয়ই নয় কারণ ও তো আমাকে আগেই বলেছে যে, ওর মা বাবা বেঁচে নেই। তাহলে ইনি কি রকম মা? স্ত্রীর মাকে নিজের মা বলে চালাবার চেষ্টা করছে নাকি? কিন্তু বল্টু কি বিবাহিত? আমি আবার নানা রকমের অনুমান দাঁড় করাতে লাগলাম। নিজের মা-ই হোন আর পরের মা-ই হোন, ভদ্রমহিলার জন্য বল্টু বেশ উদ্বিগ্ন। তার মুখের উপর সেই রকম একটা কালো ছায়া পড়েছে।

মাঝের দরজায় একটা ছোট্ট আওয়াজ হল। বল্টু সেই দিকে তাকিয়ে বেশ মোলায়েম গলায় আহ্বান করল : এসো।

আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। গায়ের রংটা বোধ হয় ফরসাই। শাদা জমির উপর সবুজ খোপ কাটা তাঁতের সাড়িটা বেশ ভাল করে দেহের সঙ্গে জড়ানো। ডান হাতে তার আঁচলের খুটটা শক্ত করে ধরে সোজা আমার সামনে চলে এল। তারপর হাতজোড় করে নীচু হয়ে আমায় নমস্কার করল।

চেহারাটা সুশ্রী, চোখ দুটো উজ্জ্বল। মাথার ঠিক মধ্যিখান দিয়ে কাটা শাদা সিঁথির দুই পাশ দিয়ে দুটো চুলের বেণী সুদীর্ঘ গ্রীবার পটভূমিকা রচনা করে আঁচলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কানে দুটো সোনার রিঙ। কপালে ছোট্ট একটা লাল টিপ। সব মিলিয়ে তাকে খুব ছেলেমানুষের মত দেখাচ্ছে। বল্টুর বউ নয়। তাহলে ওর সিঁথিতে নিশ্চয়ই সিঁদুর থাকত।

: আপনি বসুন।—মেয়েটিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সে বসল না। সামনের টেবিলে হেলান দিয়ে মাথা নীচু করে আঁচল খুঁটতে লাগল।

: এরই কথা বলেছিলাম অশোকবাবু। অনুরাধা সরকার। আমার বোন হয়। বি-এ পড়ে।

: অ। শুনে খুব খুশি হলাম। চেহারা দেখে আমি তো ভেবেছিলাম স্কুলে পড়েন।

আমার কথা শুনে অনুরাধার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা দেখিনি। বল্টু বেশ জোরেই হেসে উঠল।

: যাই, আপনার চা নিয়ে আসি।—বলেই অনুরাধা দ্রুত পদক্ষেপে পাশের ঘরে চলে গেল।

বুঝলাম, বল্টু আমাকেও বোকা বানিয়েছে আর তার 'বোন' অনুরাধাকেও মোহমুক্ত করে ছেড়েছে। লেখক হিসাবে আমাকে যিনি দেখতে চান, তাঁর বয়স যে মাত্র আঠারো উনিশ সে কথা আমার একবারও মনে হয়নি। সারাক্ষণ আমি ভেবেছি, তিনি নিশ্চয়ই বয়স্ক লোক। লেখাপড়া জানুন আর না জানুন, তাঁর বুদ্ধিতে পাক ধরেছে। কিন্তু আমাকে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে হাজির করা হয়েছে এমন একটি মানুষের কাছে যার

কৌতূহলে এখনও চিড়িয়াখানা, সার্কাস এবং সিনেমার প্রাধান্য। আর অনুরাধাও যে এক নিমেষে মোহমুক্ত হয়ে গেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। যে বয়সে মানুষ সব চেয়ে আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল হয়, ও এখন সেই বয়সে এসে পৌঁচেছে। নভেল নাটকের চরিত্র এবং ঘটনায় ওর সেই আবেগ মথিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। স্বভাবতই লেখক সম্বন্ধে ওর মনে একটা রঙিন ধারণা বাসা বাঁধতে পারে। সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করতে এসে আমার মত প্যাস্তা খ্যাচা চেহারার অতি সাধারণ একটা লোক দেখে ওর রোমান্টিক মন যে কতখানি আঘাত পেয়েছে, তা আমি অনুমান করতে পারি। অনুরাধার কাছে বাস্তব আজ সত্যিই বড় নীরস, রূঢ় এবং প্রবঞ্চক। আহা! বেচারী! আমি লেখক না হয়ে বন্টু মজুমদার লেখক হলে অনুরাধার রোমান্টিক কল্পনা হয়ত একটা বাস্তব আধার লাভ করতে পারত। কিন্তু এই পৃথিবীর ছন্দটাই যে এলোমেলো। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল কম। সেইটাই নাকি জীবনের বৈচিত্র্য।

একটু বাদেই চা আর জল খাবার নিয়ে এল অনুরাধা। মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, হতাশার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে মৃদু গলায় বলল: আপনি আমাদের বাড়িতে এলেন, মা ভীষণ খুশি হয়েছেন। আমরা, আমি ভাবতেই পারিনি—সত্যি—

: হুঁম্, তুমি তো বলেছিলে অশোক বাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকতেই পারে না।—বন্টু অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ একটা খোঁচা মেরে দিল। অনুরাধা বন্টুর দিকে তাকিয়ে বেশ একটু ধমকের সুরে বলল: অন্যায়টা কি বলেছি? তোমার বন্ধুরা তো অন্য রকম কিনা।

: কি রকম?—বন্টু জানতে চাইল।

অনুরাধা বহুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন ভেবে নিল। শেষে বলল: মানে, তোমার অন্য বন্ধুরা একটু 'রাফ'।

বেশ বুঝতে পারলাম, বন্টুর বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন কড়া মন্তব্য করতে করতে সামলে নিয়েছে অনুরাধা। ওকে সে প্রত্যক্ষভাবে ওস্কাতে চায়না। তাই 'রাফ' শব্দ দিয়ে নিজের বিরূপতাকে মোলায়েম করে প্রকাশ করল।

: হুঁ রাফ বই কি।—বন্টু এ বিশেষণ গ্রহণ করতে রাজি নয়: বড় বড় মিনিষ্টাররা আমায় খাতির করে।

দাঁতে ঠোঁট চেপে কথাটা শুনল অনুরাধা। পরমুহূর্তেই একটা ব্যঙ্গের হাসি টেনে বলল : খাতির কি রকম করে তা আমার জানা আছে। গুণ্ডামী করার দরকার হলে ডেকে পাঠায়। ব্যাস ঐ পর্যন্ত।

এতবড় একটা গাল খেয়েও বল্টুর প্রতিক্রিয়াটা মোটেই মারমুখো হলনা। আমার দিকে তাকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল : হুঁ, উনি সব জানেন। বাড়ি আর কলেজ ছাড়া আর তো কোথাও যাওয়া হয় না। বাইরে কার কি রকম 'পোজিসন', তা জানবে কি করে ?

লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি বার বার বল্টুর অত্যন্ত দুর্বল জায়গায় ঘা মারছে আর বল্টু কোনঠাসা হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা নাকি এমন হয় না। তারা মার খাবার আগেই মেরে দেয়। এ বাড়িতে এসে অবধি বল্টু একেবার নরম হয়ে গেছে। সে যেন সাপুড়ের বিষ দাঁত ভাঙ্গা পোষা কেউটে। ফনা মেলে ফোঁস ফোঁস করতে পারে কিন্তু কামড়াতে পারে না। বল্টুর এই রূপান্তরের কারণ কি ? সামান্য একটা কলেজের মেয়ের কাছে তার এত বাধ্যবাধকতাই বা কিসের ? সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় ঠেকতে লাগলো।

কিন্তু আমার সামনে ওদের এই ধরনের কথা কাটাকাটি বেশিক্ষণ হতে দেওয়া উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য অন্য নানারকম কথা বলে শেষে বললাম

: বাড়িতে অসুখ বলছিলেন—

: হ্যাঁ, আমার মায়ের অসুখ। আজ চার পাঁচ বছর শয্যাশায়ী।—বলল অনুরাধা।

তার মা বল্টুরও মা হচ্ছেন কোন নিয়মে ? যাক, ওসব সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বল্টুর কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিলেই হবে।

: আপনার মাকে একটু দেখে গেলে পারতাম না ?

প্রস্তাব শুনে অনুরাধা অভিভূতের মত প্রথম আমার মুখের উপর এবং পরে বল্টুর দিকে দৃষ্টিপাত করল। বল্টুও কেমন যেন বিস্ময়ের চোখে তাকালো আমার দিকে।

: দেখেই যাই—যখন এতদূরে এলাম।

: মাকে দেখে যাবেন ?—হঠাৎ উছলে উঠল অনুরাধা। খুশির উত্তেজনায়

হাত কচলাতে কচলাতে বলল : উঃ মায়ের যে কি আনন্দ হবে। জানেন, মাও আপনার লেখা পড়তে ভালবাসেন।

আমার লেখা পড়তে কে ভালবাসেন আর কে ভালবাসেন না, তা নিয়ে আমার এই মুহূর্তে কোন মাথাব্যাথা নেই। যে বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী অসুস্থ। সুতরাং দেখে না গেলে অভদ্রতা হবে।

পাশের ঘরখানা বড়। দুখানা তক্তাপোষ, গোটা তিনেক সুটকেস, একটা কাপড় রাখার আলনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। টিমে আলোয় অনুরাধার মা শুয়ে আছেন তক্তাপোষে। বয়স বছর পয়তাল্লিশ হবে। রোগে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্যটা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, এককালে সুন্দরী ছিলেন। রোগ যন্ত্রণা সত্বেও বিশেষ ভব্যতার সঙ্গে কথা বললেন। আলাপ ব্যবহারেও বেশ মার্জিত।

: আমার অসুখটা আজ হঠাৎ বেড়েছে। আপনার আদর যত্ন হল না।

: সে কি কথা বলছেন! বল্টুবাবু এবং মিস সরকার আপনার হয়ে যথেষ্ট আতিথেয়তা করেছেন। এ রকম খাওয়া পেলে আমি রোজ আপনাদের বাড়িতে আসতে রাজি আছি।

: বেশ তো, যখন ইচ্ছে হবে, তখনই চলে আসবেন। বেশি দূরে তো আর থাকেন না।

: হ্যাঁ, এবার থেকে মাঝে মাঝে আসব।

যাই বা না যাই, অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে মুখের কথায় খুশি করতে ক্ষতি কি? রাত পৌনে আটটায় যখন ওদের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম, তখন বল্টু আমার কাছে এসে অনুনয়ের সুরে বলল : অশোকবাবু, যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

অর্থাৎ আমার সঙ্গে আসতে পারবে না। সমস্ত ব্যাপারটা জানবার জন্য আমি তাকে সঙ্গী হিসাবে পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু এ অবস্থায় সেটা আর সম্ভব নয়।

বললাম : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি ডাক্তারের কাছে চলে যান। আমি একলাই মেসে ফিরছি।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনুরাধা বলল : আবার আসবেন। আজ আপনার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলা গেল না।

: আসব।

পায়ে হেঁটে মেসে ফেরার পথে নানারকম অনুমান দাঁড় করাতে লাগলাম। অনুরাধাদের বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ দেখিনি। তার মায়ের বেশটাও সধবার মত নয়। তাহলে কি অনুরাধা বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান? হয়ত তাই হবে। ওদের আলাপ ব্যবহার এত স্বাভাবিক যে ওদের সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববার অবকাশই নেই। আরও পাঁচটা ভদ্র পরিবার এমনিই হয়। শুধু দুর্বোধ্য থাকছে বল্টুর সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা। অনুরাধার মা বল্টুর মাসিমা পিসিমা জাতীয় কেউ নন তো? হয়ত বল্টুর মাতৃবিয়োগের পর উনি তাকে মানুষ করেছিলেন। তাই বল্টু ওকে মা বলে ডাকে। সেই রকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না থাকলে অনুরাধা অমন বে-পরোয়া ভাবে আমার সামনেই ওকে খোঁচা মারতে সাহস পেতনা আর বল্টুও সে লাঞ্ছনা অমন নীরবে হজম করত না। বল্টুর মত সমাজ-বিরোধী লোক যে একটা জায়গায় ঘরোয়া শাসনের ধার ধেরে চলে, সে কথা ভাবতে আমার সামাজিক মনটা ভারী খুশি হয়ে উঠল। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা মানবিক আবেদন আছে। গুণ্ডাকে লোকে ভয় করে, হয়ত কেউ কেউ ভক্তিও করে কিন্তু ভাল কেউ বাসেনা। কিন্তু অনুরাধা আর তার মায়ের সঙ্গে বল্টুর সম্পর্কটা স্নেহ প্রীতির। তাঁদের কাছে বল্টু আপনজন। তবে ওর জীবনযাত্রার পদ্ধতি হয়ত তাঁরা পছন্দ করেন না। তাই খটাখটি হয়। গুণ্ডামী করা ভাল নয়, তা আমি জানি। বল্টু যে গুণ্ডামী করে তাও আমার জানা আছে। কিন্তু আমি তাকে কখনও গুণ্ডামীর জন্য তিরস্কার করতে পারতাম না, কারণ তার সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব নেই। সে গুণ্ডাই হোক আর ডাকাতই হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাঁরা তার সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ করেন, তাঁরা তাকে সৎপথে চালাবার জন্য বাবা বাছা করতে পারেন, কখনও ধমক দিতে পারেন আবার কখনও আঘাত করতে পারেন। অনুরাধার মায়ের কথা জানিনা। কিন্তু অনুরাধা যে বল্টুর ভালমন্দে উদ্বেগ বোধ করে, সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। যে ভালবাসে, শাসন করার অধিকার তার সহজাত। সেখানে রূঢ় অথবা নির্মম হতে তার কোন দ্বিধা না থাকাই স্বাভাবিক। বল্টুর ঘটনাবহুল রুক্ষ বহির্জীবনের সঙ্গে ঘরোয়া জীবনের এই শান্ত বিনীত অধ্যায়টা এত সামঞ্জস্যহীন যে অবাক হতে হয়।

ব্যাপারটা আমার কাছে বিশেষ কৌতূহলজনক লেগেছিল। ভেবেছিলাম

দুই একদিনের মধ্যেই বল্টুর সঙ্গে আমার রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যাবে। তখন তার কাছ থেকে সব কিছু জেনে নেব। কিন্তু বল্টুকে আর খুঁজে পাই না। কারখানা থেকে ফেরার পর তার জন্য মির্জাপুর রোডের দিকে অনেক ঘোরা ফেরা করেও তার হদিশ মেলে না। সে যেন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, অনুরাধাদের বাড়ি গিয়ে তার মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা জেনে আসি। আমার তো নিমন্ত্রণ আছেই। সেখানে গেলে বল্টুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি, একলা একলা সে বাড়িতে যাওয়া শোভন হবে না। কেউ কিছু ভাবতে পারে। আমার কৌতূহল মেটবার আগে আমিই হয়ত কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠব।

এমনি ভাবে যতই একের পর এক দিন কাটতে লাগল, ততই ওদের সম্বন্ধে আমার আগ্রহের মাত্রা কমে যেতে লাগল। যাদের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্পর্ক নেই, তাদের নিয়ে মন বেশি দিন লেগে থাকতে পারে না। লেখায় যে আমার মন বসছে না, সেই দুশ্চিন্তাই ক্রমে ক্রমে আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। ভাবলাম, কিছু একটা লিখতেই হবে। নইলে শেষপর্যন্ত হয়ত আবার লেখার অভ্যাসটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রোজ সন্ধ্যায় কাগজ কলম নিয়ে বসতে লাগলাম। কিন্তু মাথায় লেখা না থাকলে হাত চলবে কি করে? দু'চার লাইন লিখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আবোল তাবোল ভাবাই সার হয়ে দাঁড়াল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন শোনা গেল, শিয়ালদা ষ্টেশনের কাছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভীষণ মারামারি হয়ে গেছে। বোমা, পটকা, সোডার বোতল, লাঠি, ছুরি, সবই নাকি তাতে চলেছিল। গুরুতর জখম অবস্থায় কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সবাই বলছে বল্টুর দল পটলডাঙ্গার হাবুর দলকে মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। মারামারির কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে নারী ঘটিত ব্যাপারে রেশারেশি, কেউ বলে বখরা নিয়ে মতভেদ, আবার কেউ বলে শিয়ালদা ষ্টেশন এলাকার দখল নিয়ে ঝগড়া। আসল ব্যাপারটা কেউই ঠিক জানেনা। বুঝলাম, এতদিন বল্টুর দেখা পাইনি কেন। নিশ্চয়ই এই মহাযুদ্ধের আয়োজন চলছিল। পটলডাঙ্গার হাবুও তো যে সে লোক নয়। সে-ও একটা দলের সর্দার এবং বহু মারপিট

খুন জখমের নায়ক। এতকাল শুনতাম বল্টুর সঙ্গে তার নাকি বিশেষ সৌহার্দ্য। এখন দেখছি তা নয়। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে দুজনে পাল্লা কষাকষিও হয়।

পরদিন কাগজে দেখলাম শিয়ালদা স্টেসনের কাছে সত্যিই একটা বড় রকমের হাঙ্গামা হয়ে গেছে এবং পুলিস কয়েকজন লোককে এ সম্পর্কে গ্রেপ্তারও করেছে। হাঙ্গামার কারণ অথবা ধৃত ব্যক্তিদের নাম কাগজে প্রকাশ করা হয়নি। তবে এ অঞ্চলের লোকেরা যখন বলাবলি করছে যে বল্টু আর হাবুর দলের মধ্যে মারামারি হয়েছে, তখন তারা দুজন যে হাজতে স্থান লাভ করেছে তাতে আমার সন্দেহ রইল না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ক'দিনে বল্টুর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুতরাং তার অপকীর্তি, দুর্ণাম এবং লাঞ্ছনা কোনটাই আমার ভাল লাগবার কথা নয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অধ্যায় সম্পর্কে আমার মনে যে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছিল, আপাতত দু চার মাস সে কৌতূহল নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা রইল না। তাছাড়া মামলা-মোকর্দমা-হাজত-গারদের পর বল্টুর সঙ্গে আগের সম্পর্ক বজায় থাকবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

এরপর কয়েকদিন খবরের কাগজের আইন-আদালতের পৃষ্ঠার উপর নজর রাখলাম। ওদের মামলা আদালতে উঠলে কাগজে তার রিপোর্ট বেরুবে। তখন বোঝা যাবে হাঙ্গামার কারণটা কি, আর তার আসামীই বা কে কে। কিন্তু যে কারণেই হোক মামলাটা আর কাগজে প্রকাশিত হয়নি। ফলে বল্টুর সঙ্গে আমার ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল।

এই সময় আমাদের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল। এতকাল এই কোম্পানীর মালিক ছিলেন জোসেফ ম্যাকেঞ্জি নামে একটি বিলাতী ফার্ম। বছর খানেক আগে ঘনশ্যাম জালান নামে একজন মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী কোম্পানীটা কিনে নিয়েছেন। তদবধি তিনিই কোম্পানীর মালিক। তবে চুক্তি অনুযায়ী বিগত এক বছর পুরোনো ডিরেক্টররাই কোম্পানী চালাচ্ছিলেন এবং জালান কোম্পানী ড্যালহৌসী স্কোয়ারের হেড অফিসে বসে কাগজপত্রে কোম্পানীর ব্যাপারগুলো বুঝে নিচ্ছিলেন। এবার ইংরাজ ডিরেক্টরদের বিদায়ের পালা। তাই জালান

সাহেব কারখানার ভার বুঝে নিচ্ছেন। স্বভাবতই নতুন ও পুরোনো কর্মকর্তাদের আনাগোনায় কারখানা সরগরম। কর্মচারীরা সব তটস্থ। কখন কাকে কোন কাজে ডাক পড়বে কে বলতে পারে।

ঘনশ্যাম জালানরা কলকাতায় বাস করছেন তিন পুরুষ। ঠাকুর্দা বাগবাজারে মুদির দোকান খুলে যথেষ্ট পয়সা কামিয়েছিলেন। বাবা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চাল ডাল নুন তেলের চালানী কারবারে একেবারে ফেঁপে ওঠেন। ঘনশ্যামবাবু পৈত্রিক ব্যবসা যথারীতি চালু রেখে ফাটকা বাজারে গিয়ে হাজির হন এবং সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সাফল্য অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি তার সমস্ত টাকা ঢাললেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চোরাকারবারে। তাতে তাঁর আঙুল ফুলে হল কলাগাছ। যুদ্ধের শেষদিকে সেই কালো টাকার একটা বড় অংশ নিয়ে আবার তিনি এলেন ফাটকায় এবং সেখানে দৈনিক তাঁর মূলধন বাড়তে লাগল লাখে লাখে। এই টাকা তিনি ব্যাঙ্কে রাখেন নি, কারণ তাঁর ভয় ছিল, ইনকামট্যাক্সের কোন ত্যাঁদড় লোকের নজর পড়লে তিনি বিপন্ন হতে পারেন। সমস্ত টাকাটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন শোবার ঘরের ষ্টীলের আলমারীতে। একটা আলমারীতে শুধু সোনার বাঁট আর হীরে জহরৎ, অপর একটা আলমারীতে শুধু একশ টাকার নোটের তাড়া। গচ্ছিত টাকার পরিমাণ কত, তা নিয়ে তাঁর বেয়ারা এবং ড্রাইভারে মতভেদ আছে। ড্রাইভার বলে দশ কোটি, বেয়ারা বলে বিশ কোটি। কোন্‌টা সত্যি তা বলা শক্ত। তবে টাকা যে দশ বিশের মধ্যেই কোন একটা অঙ্ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন কিনতে পাঁচ সাত কোটি টাকা নিশ্চয়ই লেগেছে। জালান সাহেব যখন কোম্পানী কেনেন তখন কোম্পানীর হাতে কয়েক কোটি টাকার সরকারী কণ্ট্রাক্ট, রিজার্ভ ফাণ্ডে প্রায় এক কোটি টাকা এবং বাজারে শেয়ারের দাম চার পাঁচ গুণ। কাজেই পাঁচ সাত কোটির কমে কেনা যায়নি।

জালান সাহেব স্কুল-কলেজে পড়েননি। মদ খান না। নেশা শুধু ফাটকায় আর মেয়েমানুষে। যৌবনে বহুবিধ নারীর সংসর্গ করেছেন কিন্তু এখন আর সে-অভ্যাস নেই বলে শোনা যাচ্ছে। বছর কয়েক হল তিনি নাকি এক নিদারুণ অপত্য স্নেহে বাঁধা পড়েছেন। ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদে জানা যায় যে যুদ্ধের সময় যখন তিনি চালের চোরাকারবারে ফেঁপে উঠছিলেন, সেই

সময় সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মৃগাঙ্ক মুখার্জী নামে এক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর খুব খাতির হয়। মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী লাস্যময়ী সুন্দরী। জালান সাহেব তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে দু'জনের নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। কিছুকাল বাদে মৃগাঙ্কবাবু তাঁদের গড়িয়াহাটের ছোট্ট বাসা ত্যাগ করে পার্ক স্ট্রীটে সাড়ে চারশ' টাকার একটা ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এবং তারও মাসখানেক বাদে স্ত্রীকে সেই ফ্ল্যাটে একলা রেখে নিজে এরোপ্লেনে চেপে বিলেতে চলে যান। জালানের ড্রাইভার বলে, মৃগাঙ্কবাবু নাকি নারী, সুরা এবং জুয়ার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। রিপন স্ট্রীটের একটি পাঞ্জাবী মেয়ে নাকি তাঁর প্রেয়সী ছিল এবং তাকে নিয়েই তিনি বিলেতে গেছেন। টাকা দিয়েছেন জালান সাহেব এবং এখনও নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে থাকেন।

ইতিমধ্যে পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী দুটি সন্তান প্রসব করেছেন। দুটিই কন্যা। মেয়ে দুটি দেখতে অসাধারণ সুন্দরী এবং ভারী চটপটে। রঙ পেয়েছে জালানের আর চেহারা পেয়েছে মায়ের। এই দুটি ছোট্ট মেয়ে নাকি জালানের হৃদয় একেবারে কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের মায়ের সঙ্গে তাঁকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, জালান সাহেবের নিজের বিবাহিত স্ত্রীর কোন সন্তানাদি নেই। তিনি এখন এই মেয়ে দুটিকে একদিন না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রতি সন্ধ্যায় নিউ মার্কেট থেকে রাশি রাশি জিনিস নিয়ে তিনি পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে যান,মেয়েদের আদর করেন, আবদার রাখেন, ছেলেমানুষের মত খেলা করেন। পিতৃস্নেহ প্রকাশের সে নাকি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এখন নাকি জালানের সখ হয়েছে, অবৈধ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে তিনি মেয়ে দুটিকে তাদের মায়ের সঙ্গে নিজের হেফাজতে এনে রাখবেন। ড্রাইভার বলে, মুখার্জীর সঙ্গে চিঠিপত্রে আলোচনা চলছে। মুখার্জী নাকি লিখেছেন যে সারা জীবন মাসিক এক হাজার টাকার মত একটা ট্রাস্ট ফাণ্ড পেলে তিনি স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে ডাইভোর্স দিয়ে দেবেন। জালান তাতে রাজি আছেন। সলিসিটর চুক্তির কাগজ পত্র তৈরি করছে। কাজ শেষ হলে জালান কাউকে বিলেতে পাঠিয়ে মুখার্জীর সই জোগাড় করবেন। ডাইভোর্সটি হয়ে গেলেই মিসেস মুখার্জী মিসেস জালান হয়ে আলীপুরের নব-নির্মিত বাড়িতে উঠে যাবেন। ড্রাইভার বলে, "ভাগ্য মশাই ভাগ্য। মিসেস মুখার্জী বেহালার এক গরীব স্কুল মাস্টারের মেয়ে। জালান সাহেবের নজরে না পড়লে রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলে আর একপাল ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়েই

কাটাতে হত। আর এখন দেখুন, একেবারে রাজরানী হয়ে আছেন। সোনা রূপো হীরে জহরতের দামই এই এক লাখ টাকা। আলীপুরের বাড়িখানাও হচ্ছে তাঁর নামে। তাতে লাখ কয়েক টাকা তো খরচ হবেই। বাড়িতে অন্তত গোটা সাতেক চাকর, তিনটে আয়া, একটা বাবুর্চি। মোটরখানা দেখলে তো আপনাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া ভদ্রমহিলা যে সব দামী দামী সাজ পোষাক পরেন তা রাজা-রাজড়ার ঘর ছাড়া দেখতে পাওয়া যায় না।"

মিসেস মুখার্জীর নাম নাকি মঞ্জুলা—আলিপুরের বাড়ির নাম মঞ্জুলা নিকেতন। তিনি নাকি রূপসী, বিদুষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দারুণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মহিলা। চাকর বাকররা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। জালান সাহেব তাঁর কথায় ওঠেন বসেন। তিনি লিখে দিলে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে যে কোন লোকের মোটা মাইনের চাকরী হতে পারে। তবে তাঁকে ধরা অসম্ভব। জালান সাহেব এবং নিজের দুই একজন আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর কাউকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেন না। বাড়ির বাইরে বেরোন খুব কম। যখন বেরোন তখন চোখে গগ্‌ল্‌স্‌ এবং মাথায় কাপড় দেওয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের দুটো মাস তিনি দার্জিলিং নৈনিতাল অথবা সিমলায় কাটিয়ে আসেন। জালান সাহেবও তাঁকে অনুসরণ করেন কিন্তু তিনি পাঁচ সাত দিনের বেশি থাকতে পারেন না কারণ তাতে তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

শুনলাম আমাদের এই কোম্পানীটা কেনার পেছনেও নাকি মূল প্রেরণা ছিলেন মঞ্জুলা মুখার্জী। তিনি নাকি জালানকে বলেছিলেন যে শুধু টাকা রোজগার করলেই হয় না। সেই সঙ্গে চাই দেশব্যাপী খ্যাতি। এদেশে ধনী বলতে লোকে টাটা বিড়লা সরাভাইদের চেনে। জালান সাহেব তাদের মত ধনী হোন বা না হোন, তাঁর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও কিছু কম নয়। তবু ধনী হিসাবে সমাজে তাঁর কোন নাম নেই। তার কারণ জালান শিল্পপতি নন। যন্ত্রযুগে কলকারখানার মালিক হতে না পারলে সমাজে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং জালানকে এখন শিল্পপতি হতে হবে। যুক্তিটা জালানের মনে দাগ কাটল। টাকা ঘরে মজুত ছিল, ঋণ করে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনটা কিনে রাতারাতি শিল্পপতি হলেন। কিন্তু কল-কারখানা সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। এখন কারখানায় এসে প্রতিদিন

সেই জ্ঞান সঞ্চয় করছেন। এটা কি, ওটা কি, ওখানে ছুটো লোক কেন, এর মাইনে কত ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কারখানার ম্যানেজার থেকে দারওয়ান পর্যন্ত সকলেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চোরা-কারবারীকে কারখানার সংগঠন এবং যান্ত্রিক কারিগরী বোঝান কঠিন কাজ হওয়াই স্বাভাবিক। একদিন আমি একটা গ্রাইণ্ডিং হুইলের নক্সা আঁকছিলাম। জালান সাহেব কারখানা দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "কেয়া হিঁয়া নক্সাভি খিঁচা যাতা?" ম্যানেজার এগিয়ে এসে মেসিনের কারখানায় নক্সা আঁকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝলেন কি-না বোঝা গেল না। তিনবার এলোমেলো মাথা নেড়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। মেসিন ফোরম্যান ওসমান সাহেব বললেন: "মশাই, এতকাল সাহেবের সঙ্গে একরকম দিন কেটে যাচ্ছিল। এবার মাড়োয়াড়ীর হাতে পড়ে চাকরী বাকরী না খোয়াতে হয়। কাজকর্ম একদম জানে না। কাকে কখন 'বাড়তি' বলে খতম করে দেয় কে জানে?"

কারখানায় সকলের মনেই সেই ভয়। মেসিনের কারখানা ফাটকা-বাজারীর হাতে পড়ে লাটে না ওঠে।

এইসব ব্যাপারে মনটা এমন আচ্ছন্ন ছিল যে অন্যকোন দিকে আর খেয়াল দিতে পারিনি।

মাসখানেক বাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখলাম ট্রাম বাসে ভীষণ ভীড়। তাই পায়ে হেঁটে মেসের দিকে এগোতে লাগলাম। বৌবাজারের মোড়ে পেছন থেকে নারী কণ্ঠের আহ্বান শুনে চমকে উঠলাম। ফিরে দেখি অনুরাধা সরকার হাসি মুখে একেবারে আমার গায়ে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লাল ফিতের বর্ডার দেওয়া চৌকো-গলার শাদা ব্লাউস, লাল সাড়ি আর স্যাণ্ডাল। মাথার চুলটা খোপায় আঁটা। সিঁথির দুপাশের কয়েক গাছি চুল খোঁপার বাঁধন না মেনে বাতাসে উড়ছে। কপালে ছোট্ট লাল টিপ। আগেরদিন তার চেহারায় কেমন একটা অবসাদ এবং বিষন্নতার ছাপ ছিল। আজ তার মুখখানা তাজা টলটলে এবং হাসি খুশি।

: নমস্কার।

: নমস্কার। কোথায় গিয়েছিলেন?—আমি হাসি মুখে প্রশ্ন করলাম।

হাতের মুঠোর প্যাকেটটা দেখিয়ে অনুরাধা বলল : মায়ের জন্ত ওষুধ আনঁতে।

: আপনার মা ভাল আছেন ?

: হ্যাঁ, মায়ের শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে। এই তো কাছেই আমাদের বাসা। আসুন না। আসবেন বলেছিলেন, তারপর তো আর আসেন নি।—অনুরাধা চোখে মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে আমন্ত্রণ করল।

মাত্র কিছুকাল আগেও আমি একান্তভাবে ওদের সাক্ষাৎ কামনা করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আজ ওকে চোখের সামনে দেখা অবধি নিজেকে ভারী অপ্রস্তুত বোধ হচ্ছে। আমি তো ওদের কাছে বন্টুর 'বন্ধু' হিসাবেই পরিচিত, আর ওঁরা হলেন বন্টুর আপন জন। কথায় কথায় বন্টুর নাম উঠবে এবং তখন দেখা যাবে যে বন্টুর এই বিপদের দিনে আমি তাকে কোন সাহায্যই করতে যাইনি—এমন কি তার বর্তমান খোঁজ খবরও আমার জানা নেই। বন্ধু-প্রীতির এমন নিদর্শনের পর আমার সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা যে মোটেই ভাল হবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

: চলুন না। একটু চা খেয়েই চলে আসবেন। মা রোজ আপনার কথা বলেন।—অনুরাধা অনুনয় করল।

গেলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে জেনেও 'না' বলতে পারলাম না। যে বয়সে মেয়েদের প্রবর্তনা সব চেয়ে মোহময়, অনুরাধা এখন সেই বয়সে চলছে। তাকে এড়ানো আমার পক্ষে একটু কঠিন।

: বেশ তো চলুন।—আমি সাগ্রহে সম্মত হলাম।

: যাবেন ? থ্যাঙ্কস্।—খুশি হল অনুরাধা। ওর হাসি খুশি ভাব আমার মনে খটকা ধরিয়ে দিল। আমাকে দেখে ওর তো বন্টুর কথাই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কই, সে কথা তো একবারও তুলল না। তাহলে কি বন্টু নিরাপদেই আছে ? আর আমি তার নানা রকম বিপর্যয় কল্পনা করে অকারণে সঙ্কুচিত হচ্ছি ?

বাসার কাছে বড় রাস্তার মোড় ঘুরে অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি সিগারেট খান অশোকবাবু ?

: কেন বলুন তো ?

: কিনে নিয়ে যাব।

: কেনবার দরকার নেই। আমার পকেটে আছে।

: তা হোক, আমাদের বাড়িতে যখন আসছেন—

: আপনার মায়ের সামনে তো আর সিগারেট খাওয়া যাবেনা।

অনুরাধা ঠোঁট উল্টে একটা উপেক্ষার ভঙ্গি করে বলল: অনায়াসে যেতে পারে। আমার মায়ের কোন প্রেজুডিস্ নেই। এ সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথাই ঘামান না।

: সে আপনার সৌভাগ্য।

: হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

আগের দিন ওকে লাজুক এবং মুখচোরা বলে মনে হয়েছিল। দেখলাম ও আসলে তত মুখচোরা নয়। আলাপ ব্যবহারে কোন অকারণ সঙ্কোচ নেই। আর কথাবার্তাও বেশ স্মার্ট।

ঘরে ঢুকে সেই পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম আমি। অনুরাধা এঘর থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে পাশের ঘরে ঢুকে গেল: মা, দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।

আমি আবার দমে যেতে লাগলাম। বন্টুর প্রসঙ্গ কিছুতেই এড়ান যাবে না এবং সেখানে আমার ভূমিকাটা ওদের কাছে মোটেই গৌরবজনক বলে মনে হবেনা। বন্টুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথাটা যে পুরোপুরি সত্য নয়, তা তো আর ওঁরা জানেন না।

অনুরাধা আবার ফিরে এল এই ঘরে: আসুন।

আমি নীরবে ওর পেছন পেছন পাশের ঘরে ঢুকলাম। অনুরাধার মা একগাদা বালিশে হেলান দিয়ে আধ শোয়া হয়ে বসে আছেন। আজ তিনি আমায় হাসিমুখে হাত তুলে নমস্কার করলেন। দেখলাম তাঁর বালিশের পাশে একখানা ইংরাজি নভেল ওল্টানো রয়েছে। ভদ্রমহিলা এতক্ষণ ঐ বইখানা পড়ছিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। চোখ দুটো বসা কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। শুকনো ঠোঁট দুটোয় খেলোয়াড়ের আত্মপ্রত্যয়। রুক্ষ চুল এলোখোপায় বাঁধা। আগের দিনের চেয়ে অনেক জীবন্ত তাঁর মুখখানা।

খাটের পাশে পাতা চেয়ারে গিয়ে বসলাম আমি। অনুরাধা মায়ের পায়ের কাছে খাটের উপরই বসে পড়ল।

: আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হয়েছে দেখছি।—বললাম আমি।

মুখে একটা সলাজ হাসি টেনে মিসেস সরকার বললেন: হ্যাঁ, আগের চেয়ে

সুস্থ। তবে অন্ধের আবার দিন রাত্তির। বিছানা ছেড়ে ওঠবার তো উপায় নেই।

: অসুখটা কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিসেস সরকার বললেন : হার্ট, নার্ভ এবং শরীরের অন্যান্য অনেক যন্ত্রই বিকল হয়ে গেছে। আজ কটা বছর নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। শরীরের আর দোষ কি!—তাঁর মুখখানা কালো এবং বিমর্ষ হয়ে উঠল। গলার স্বরটা এমন হতাশাব্যঞ্জক যে আমি প্রায় চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। নিজের দুঃখ বিপর্যয়ের কাহিনী অপরের ভাল না লাগতে পারে ভেবেই বোধহয় মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে বললেন : আপনার লেখা আমার বেশ ভাল লাগে। নতুন কি লিখছেন?

: এখনও কিছুই লিখিনি।

: কেন?

: এমনিই। ঠিক মন আসছে না।

: সে কি কথা! ভাল করে মন দিয়ে লিখুন।

বললাম : লেখবার চেষ্টা করছি।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল : এবার আপনি কি নিয়ে লিখবেন?

: এখনও কিছু ঠিক করিনি। আর কিছু না পাই আপনাকে নিয়ে লিখে দেব।—আমি একটা হাল্কা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলাম।

: আমাকে নিয়ে?—চাপা উত্তেজনায় অনুরাধার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল : না না, ওরে বাবা, কি যে বলেন! হুঁ বুঝেছি, অমলদা নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলেছে আপনার কাছে।

অমলদা কে? আমি জিজ্ঞাসু ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বণ্টুর ভাল নাম অমল নয় তো?

: বণ্টুবাবুর কথা বলছেন? না তিনি কিছু বলেন নি। সেদিনের পর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি।—বণ্টুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত করে নিলাম।

: আমাদের সঙ্গেও অনেকদিন দেখা নেই। কোথায় গেছে বলুন তো? —জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস সরকার।

: তা আমি ঠিক জানি না। কারখানায় কাজ করি। শনি রবিবার

ছাড়া বাইরের কারও সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাত হয় না। বন্টু-বাবুও খেয়ালি মানুষ। তাঁর দেখা পাওয়া অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মত।

এছাড়া আর কি জবাব দেব? বন্টু এখানে আসে না জেনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে সে হাজত বাস করছে। সরকার পরিবার শিয়ালদা'র মারামারির খবরটা নিশ্চয়ই রাখেন না। বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকলে এসব খবর রাখা সম্ভবও নয়। আমিই বা সেটা না জানার ভান করলে ক্ষতি কি! কলকাতার সমস্ত ঘটনা আমাকে জানতেই হবে তারই বা কি মানে আছে?

: আমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে কি করে বই লিখবেন?—স্কুলের মেয়ের মত ছেলেমানুষী গলায় জিজ্ঞাসা করল অনুরাধা।

বললাম: যেটুকু জানি তাই লিখলেই বেশ বড় বই হবে।

: কি জানেন?—তার মুখখানা আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল: কি লিখবেন?

আমি একটু ভেবে গম্ভীর মুখে বললাম: লিখব, অনুরাধা সরকার নামে ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি মেয়ে নভেল পড়তে ভীষণ ভালবাসত। তার ধারণা হয়েছিল, যারা ওসব লেখে তারা না জানি কত অদ্ভুত লোক। কিছু-দিন বাদে একজন জলজ্যান্ত লেখক তার সামনে এসে হাজির। যেমনি বিশ্রী তাকে দেখতে তেমনি সাধারণ তার কথাবার্তা আর চালচলন। সেদিন অনুরাধার স্বপ্নভঙ্গ হল। তারপর সে আর কখনও নভেল পড়েনি আর লেখকের নাম শুনলেই নাক সেঁটকায়। লোফার আর অথারের মধ্যে সে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না।

মিসেস সরকার জোরে হেসে উঠলেন। অনুরাধা হাসল না। গম্ভীর গলায় জানতে চাইল: তারপর?

: তারপর আর নেই।

: ক্লাইম্যাক্সটা কোথায়?

: স্বপ্নভঙ্গের এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে গল্প শেষ।

: এ নিয়ে ছোট গল্প হয়। বড় উপন্যাস হবে না।

: চেষ্টা করলে হতে পারে।

: কি রকম?

: বিভিন্ন নভেল পড়ে লেখকদের সম্বন্ধে অনুরাধা মনে মনে যে সব কল্পনা করেছে, তাই নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে গেলেই হল।

: তাও হবে না। গল্প তো রবার নয় যে তাকে টানলেই লম্বা হয়ে উপন্যাসে গিয়ে দাঁড়াবে। এ কাহিনীর মধ্যে এমন কোন গভীর আবেগের বিষয় নেই যার উপর সার্থক উপন্যাস খাড়া করা যেতে পারে।

আমি হঠাৎ আবিষ্কারের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। ওকে যতটা অপরিণত বলে মনে করি, ততটা অপরিণত ও নয়। ওর সাধারণ বুদ্ধি বেশ প্রখর। তাছাড়া তর্ক করার দক্ষতাও আছে। নিজের সিদ্ধান্তে যাবার রাস্তাটা ও ভালই জানে। আমার ঠাট্টাটাকে ঘুরিয়ে ও এমন জায়গায় এনেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা হতে পারে, ঠাট্টা তামাসা হয় না। অন্য মেয়ে হলে ঠাট্টাটাকে হয় সত্য, না হয় অর্দ্ধসত্য ধরে নিয়ে ব্যাপারটাকে ভাবপ্রবণতার দিকে টেনে নিয়ে যেতো। তখন আবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হত যে ওটা নিছক ঠাট্টা। ওর ধীশক্তি এবং প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব আমার মনে কেমন আনন্দ এবং পরিতৃপ্তির আমেজ এনে দিল।

: না-ই যদি লেখা যায়, তাহলে লিখব না।—আমি পেছু হটলাম। মিসেস সরকার আবার জোরে হেসে উঠলেন। অনুরাধাও হাসল। তারপর চা আনবার জন্য খাট থেকে নেমে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মিসেস সরকার বললেন : অমলের কাছে শুনেছি, আপনি মেসে থাকেন। বাবা মা আছেন কোথায় ?

: বেনারসে। আমাদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। পার্টিশনের পর বাবা বেনারসে এসেছেন। আপনাদের দেশ কোথায় ?

মিসেস সরকার অনেক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। মনে হল অতীত স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখখানা কেমন করুণ এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন : আমাদের কোন দেশ নেই। ১৯৪২ সাল থেকে আমরা ছিন্নমূল যাযাবরের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছি না। মানুষের উপর ভগবান যে কত নিষ্ঠুর হতে পারেন, আমরা তার জীবন্ত নিদর্শন। আমাদের কথা না শোনাই ভাল।

কিন্তু শোনবার আগ্রহ আমার মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

: অনুরাধা কি আপনার একমাত্র সন্তান?

: হ্যাঁ, এখন ও ছাড়া পৃথিবীতে আপন বলতে আর আমার কেউ নেই। স্বামী-পুত্র সবই ভগবান কেড়ে নিয়েছেন।

: তাহলে ছেলেও ছিল?

: ছিল। অনুর দাদা সুবীর। ওর চেয়ে বছর চারেকের বড়।—এবার ভদ্রমহিলার চোখে বাষ্প জমে উঠল।

ভাবলাম ওঁরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। দেশ ভাগাভাগির ফলে বিপর্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু মাত্র ক' বছরেই ওঁরা পশ্চিমবঙ্গের কথার টান এত চমৎকার আয়ত্ত করেছেন যে পূর্ববঙ্গের লোক বলে মনেই হয় না।

: পূর্ববঙ্গের কোন জেলায় আপনাদের বাড়ি ছিল?

মিসেস সরকার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়ি আসবে কোত্থেকে?

: বাড়ি—মানে—পার্টিশনের আগে—আপনারা রেফিউজি নন?

: রেফিউজি বটে, তবে পূর্ববঙ্গের নয়। আমরা বাস্তুহারা হয়েছি বাঙলাদেশ ভাগ হওয়ার আরও পাঁচ বছর আগে।

: অর্থাৎ?—ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ধাঁধাঁর মত লাগল।

মিসেস সরকার বললেন: আমাদের কাহিনী এক ইতিহাস। শুনলে আপনি Bored বোধ করবেন।

: ঠিক তা নয়।—বললাম আমি: বরং আপনাদের কাহিনী আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে বলতে পারেন।

মিসেস সরকার তাঁর পিঠের বালিশটা ঠিক করে বললেন: আমাদের জন্ম বর্মায়। আমার বাবা রেঙ্গুনে ওকালতি করতেন। আমার জন্মের কয়েকমাস বাদে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। বাবা আবার বিয়ে করেন। কিন্তু আমাকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। খুব আদর আবদার জাঁক-জমকের মধ্যে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। অনুর বাবাও বর্মার লোক। তবে রেঙ্গুনের নয় পেগুর। ছেলেবেলায় মা বাপ হারিয়ে তিনি তাঁর বাবার এক স্থানীয় বন্ধুর সংসারে মানুষ হয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটি চাকরী পেয়ে যান। সেই সূত্রে তিনি পেগু থেকে চলে আসেন রেঙ্গুনে। সেখানে ব্যাঙ্কের ক্লায়েণ্ট কাঠের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ

পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হয়। কয়েক বছর বাদে চাকরী ছেড়ে তিনি কাঠের ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা সুরু করলেও অল্প দিনেই সেটা বেশ জমে ওঠে। সেই সময় কোন একটা পার্টির সঙ্গে মামলা-মোকর্দমার ব্যাপার নিয়ে তিনি আমার বাবার কাছে প্রথম আসেন। মিসেস সরকার চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন: আমি সেবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছি। অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দুজনের বেশ আলাপ পরিচয় হল। মাস ছয়েক বাদে তিনি আমার কাছে বিয়ের কথা পাড়লেন। এই প্রস্তাবের জন্যে মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম। সুতরাং রাজি হতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। কিন্তু বাবা বেঁকে বসলেন। তিনি ব্রাহ্মণ আর অনুর বাবা কায়স্থ এবং প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। কি দেখে বাবা তাঁর প্রথম মেয়েকে এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবেন? বললেন, "কটা মাস সবুর কর। শীতকালে কলকাতায় গিয়ে আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে কত শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পাত্র পাওয়া যাবে।" হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, আমি বিয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। তাই যাকে হাতের কাছে পাচ্ছি, তাকেই বরণ করে নিচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ ছিলনা। বললাম, "তা হয় না বাবা। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।" বাবা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, "তবে আর আমার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছ কেন? বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, যা ভাল বুঝবে করবে।" কথাটা যে রাগের তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তখন আর আমার ফেরার উপায় নেই। তলে তলে বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। মাসখানেক বাদে রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে আমরা বিয়ের দলিল সই করলাম। অনুর বাবা আগেই ঘর সংসার পেতে রেখেছিলেন। সেক্রেটারিয়েট থেকে সোজা গিয়ে উঠলাম সেখানে। বিয়েতে বাবার অমত ছিল। কাজেই বাবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিন বেশ জটিল হয়ে রইল। ইতিমধ্যে উনি ব্যবসায় খুব উন্নতি করে ফেল্লেন। ঘর সংসার এবং পরে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ সুখ শান্তিতেই আমাদের জীবন কাটছিল। এমন কি বাবাও ক্রমে ক্রমে আমাদের সম্বন্ধে নরম হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারপরই বাধল যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধেই আমাদের সর্বনাশের শুরু।

দরজায় শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি অনুরাধা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

কাছে এসে কাপ প্লেটগুলো টিপয়ের উপর রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মায়ের কাহিনীর মধ্যে সে যেন থাকতে চায় না।

মিসেস সরকার বললেন : খান অশোকবাবু।

চায়ের কাপ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর ?

: জাপান যুদ্ধে নামবার পর বর্মা থেকে সবাই পালাতে শুরু করল। আমরা বহুকাল বর্মায় আছি। বর্মাই আমাদের মাতৃভূমি। কাজেই গোড়ার দিকে বর্মা ছাড়ার কথা আমরা চিন্তাই করিনি। চালু ব্যবসা ফেলে ভারতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে চলে আসতে অন্তুর বাবার আপত্তি ছিল। ওদিকে আমার বাবাও বর্মা ছাড়তে অনিচ্ছুক। বুড়ো বয়সে ভারতে এসে নতুন করে ওকালতি ব্যবসায়ে পসার জমানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বললেন "ইংরাজই থাকুক আর জাপানীরাই থাকুক, আইন আদালত সকলেরই লাগবে। আমি এখানকার পুরোনো এ্যাডভোকেট। যে করে হোক দু'বেলা দু'মুঠো ভাত করে খেতে পারব। ভারতে গেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে যাব যে।"

ক্রমে ক্রমে জাপানীরা যখন হুড়মুড় করে বর্মার দিকে এগোতে লাগল তখন অন্তুর বাবা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লেন। আমায় বললেন, "ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি বরং কলকাতায় চলে যাও। তারপর অবস্থা খারাপ বুঝলে আমিও চলে যাব।" ঐ রকম যুদ্ধবিগ্রহ বিপদ আপদের মধ্যে তাঁকে বর্মায় একলা ফেলে আমি ভারতে চলে আসতে রাজি হলাম না। কিন্তু আমার সৎমা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভারতে ফেরবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন বাবা তাঁদের শেষ ষ্টীমারে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। অন্তুর বাবা সেই ষ্টীমারে আমাকেও তুলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। বাপ আর স্বামীকে বিপদের মুখে রেখে কোথায় যাব ? রেঙ্গুন সহর তখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। এখানে সেখানে ডাকাতি রাহাজানি লুটপাট হাঙ্গামা হয়। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুব খারাপ। জাপানীরা যতই এগিয়ে আসছে, ইংরাজদের শাসনযন্ত্র ততই বিকল হয়ে পড়ছে। ইংরেজরা তখন শ্বেতাঙ্গদের ধনসম্পত্তি জানমাল নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। অন্য সকলের কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় একদিন বাবা এসে বললেন, "চল, তোরা আমার ওখানে গিয়ে থাকবি। এই দুঃসময়ে আপনজন সব এক জায়গায় কাছাকাছি

থাকাই ভাল।" আমার স্বামী তাতে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা বাবার কাছে চলে গেলাম। মাসখানেক একরকম ভাবে কেটে গেল। ওদিকে ইংরেজের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। জাপানীরা রেঙ্গুনে বোমা ফেলতে সুরু করেছে। বোমার কাছে জাতবিচার নাই। কালা ধলা সকলেই তার কাছে সমান। রাত্রে বোমা। দিনে কান্নাকাটি, হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, সামরিক কুচকাওয়াজ। দোকানপাট বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, ইলেকট্রিসিটি জল-সরবরাহ সব বানচাল হয়ে গেছে। প্রতিদিন হাজারে হাজারে লোক মোটঘাট মাথায় চাপিয়ে পায়ে হেঁটে রেঙ্গুন ছাড়ছে। সহরের যে অংশে আমরা বাস করতাম সেখানে প্রথম প্রথম তেমন বড় রকমের বিমান আক্রমণ হয়নি। তাতে আমাদের মনে কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, আমাদের পাড়াটা বোধ হয় আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সে আমাদের ভুল ধারণা। হঠাৎ একরাত্রে ডজন খানেক জাপানী বিমান আমাদের এলাকার উপর এসে হামলা সুরু করল এবং আমরা একতলায় এয়ার রেড শেল্টারে ঢোকবার আগেই কান ফাটা বিকট আওয়াজ তুলে আমাদের বাড়িটা যেন হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল। ছেলেমেয়ের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে আমি বাইরে বেরিয়ে একটা পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমার বাবা এবং স্বামী দুজনেই বাড়িতে ছিলেন। তাঁরা যে কোথায় গেলেন বুঝতেই পারলাম না। আকাশে তখনও এরোপ্লেন, বিমান-ধ্বংসী কামানের গর্জন আর সহরের বিভিন্ন জায়গায় বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ। বাবা এবং স্বামীর জন্য বুকের ভিতরটা আকুলি-বিকুলি করলেও পাঁচিলের পাশ ছেড়ে সরে আসতে সাহস হল না। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে দেখলাম, আমাদের বাড়ির আধখানা ভেঙ্গে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি আধখানা তখনও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ আমার স্বামী কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। তিনি নাকি সারারাত ধরে আমাদের হাতড়ে বেড়িয়েছেন। সাড়া শব্দ না পেয়ে ভেবেছিলেন, আমরা রাবিশের তলায় চাপা পড়েছি। "কিন্তু তোমার বাবা কোথায়?" হঠাৎ প্রশ্ন করলেন তিনি। বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। বাবা কোথায়? বাবা নেই। একতলার শোবার ঘরের কড়িকাঠে চাপা তাঁর মৃতদেহ খুঁজে বার করতে আমাদের দেরি লাগল না। আর রেঙ্গুনে থাকবার সাহস নেই। মন

একেবারেই ভেঙে গেছে। কিন্তু ভারতে আসবার যানবাহন তখন বন্ধ। স্বামী বললেন, "পায়ে হেঁটে যাব। রোজ সারাদেশ থেকে হাজার হাজার লোক পায়ে হেঁটে ভারতে চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিশে গেলেই হবে।" টাকাকড়ি যা ছিল, তা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মারফৎ আগেই তিনি ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার গহনাপত্র এবং সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আমরা সেই দিনই ভারতে রওনা হলাম। পথঘাট কিছুই জানা ছিল না। চলতি লোকের পিছু নিয়ে দিনের পর দিন মাঠঘাট পাহাড় জঙ্গল নদনদী পেরিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। স্নান নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। মাঝে মাঝে ডাকাত দল এসে হামলা করে। পয়সা-কড়ি গহনা-গাটি জলের মত ব্যয় করে কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখলাম। কিন্তু শেষে রক্ষা হলনা। আরকান এলাকায় এসে হঠাৎ একদিন ছেলেটা রক্ত আমাশয়ে শুয়ে পড়ল। আর উঠল না।

মিসেস সরকারের গলাটা কেঁপে গেল এবং চোখের কোন বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে তিনি আবার বলতে সুরু করলেন : মেয়ে আর স্বামীর হাত ধরে যখন ইম্ফলে এসে পৌছোলাম তখন আমাদের প্রাণটা যেন কোনক্রমে দেহের মধ্যে আটকে আছে। সেখান থেকে মোটর এবং ট্রেনে চেপে শিলং এলাম। তারপর মাসখানেক নানা অসুখ-বিসুখে আমরা সকলেই শয্যাশায়ী হয়েছিলাম। শেষে বাঁচার তাগিদে শোক তাপ ভুলে অনুর বাবা কাজকর্মের চেষ্টায় কলকাতায় এলেন। মেয়ে নিয়ে আমি শিলঙেই রয়ে গেলাম। তখন যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। তিনি কলকাতায় এসেই ভাল ভাল কণ্ট্রাক্ট পেতে লাগলেন। বর্মা ফেরৎ কয়েকজন অফিসার ও বাপারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে আমিও শিলং স্কুলে একটি চাকরী যোগাড় করে নিই। কাজেই আর্থিক অস্বচ্ছলতা আমাদের ছিল না। কিন্তু এত বড় একটা মানসিক এবং পারিবারিক বিপর্যয়ের পর আপনজনের কাছ ছাড়া হয়ে থাকা আমাদের দুজনের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় তখন বিমান আক্রমণের ভয়। সহরের লোকজন সব বাইরে গ্রামে পালিয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িই খালি। অনুর বাবা পার্ক-সার্কাসে একখানা পুরো বাড়ি ভাড়া করে আমাদের শিলং থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বললেন, "বোমাই পড়ুক আর জাপানীই আসুক কলকাতা ছেড়ে আর নড়ছি না। সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। মরতে

হয় সব একসঙ্গে মরব।" আমারও তাই মত। মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না। যে সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য আমরা তাড়া খাওয়া কুকুরের মত বর্মা থেকে পালিয়ে এলাম, তাদের সবাইকে তো বাঁচাতে পারলাম না। নিয়তি যেখানে আক্রোশে পিছু নিয়েছে, সেখানে মানুষ বাঁচবে কি করে? কপালে যদি জাপানীর বোমার ঘায়েই মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে তাই হবে। আসবাবপত্র কিনে পুরোদস্তুর সংসার পাতা হল নতুন বাসায়। আবার আমরা আমাদের ভাঙা মন জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। লোকজনের আনাগোনা সমাজ-সামাজিকতা বাড়তে লাগল। অনুকে স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। একমাত্র পুত্রশোকের মর্মবেদনা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই আমরা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলাম। কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ল, মন্বন্তর এলো কিন্তু সে সব আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে সহর-পালানো লোকেরা সহরে ফিরতে সুরু করেছে। খালি বাড়িগুলো আবার ভরে উঠতে লাগল। আমাদের বাসার একতলার ঘরগুলো কোন কাজে লাগত না। অনুর বাবা এক্রামুল হক নামে তাঁর বন্ধুকে সেখানে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের অনেক ছেলেমেয়ে। তাদের নিয়ে আমাদের দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিল। স্বামী স্থির করেছিলেন, বর্মায় আর ফিরবেন না। কলকাতার কাছাকাছি কোথাও বাড়ি করে সেখানই আমরা থাকব। কিন্তু মানুষ গড়ে ভগবান ভাঙেন। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে একদিন হঠাৎ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। তার কিছুকাল আগে থেকেই অবস্থা গরম হয়ে ছিল কিন্তু আমরা কেউই ভাবতে পারিনি যে রাতারাতি এমন বীভৎস খুনজখম সুরু হয়ে যাবে। অনুর বাবা দিল্লীতে গিয়েছিলেন একটা বিলের পাওনা আদায় করতে। ১৬ই আগস্ট বিকেলে কলকাতায় ফিরেই তিনি হাওড়া স্টেশনেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনলেন। গাড়ি ঘোড়া না পেয়েই বোধ হয় পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। পাড়ার মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে তিনি খুন হলেন। খবর পেয়ে এক্রামুল সাহেব ছুটে গেলেন সেখানে, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে এক বিরাট জনতা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল। এক্রামুল সাহেব আর তাঁর বাড়ির লোকেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখলেন। শেষে কয়েক শ' টাকা ঘুষ দিয়ে থানা থেকে একটা পুলিসের গাড়ি আনিয়ে আমাদের হিন্দু

পাড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তারা আমাদের একটা উদ্ধার কেন্দ্রের সামনে নিয়ে এল। তখন আমার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। সিঁড়ির মুখে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম এবং সেই যে আমার শরীরটা পঙ্গু হয়ে পড়ল আর সারল না। ক'টা দিন কেমন ভাবে যে উদ্ধার আশ্রমে কেটে গেল তা টেরই পাইনি। আমার চোখের সামনে তখন পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে গেছে। সেই নিদারুণ দুঃসময়ে অমলকে পেয়েছিলাম দেবতার আশীর্বাদের মত।

মিসেস সরকার মুহূর্তের জন্য থামলেন। আমি প্রশ্ন করলাম: অমলবাবু সেখানে এলেন কোত্থেকে ?

: যে উদ্ধার কেন্দ্রে এসে আমরা উঠেছিলাম, সেটা ওদের পাড়ায় আর ওরা কয়েকজন মিলেই সেটা চালাতো।

শুনে খুবই বিস্মিত হলাম। বল্টু যে এককালে জনসেবার কাজও করেছে, সে সংবাদ এই প্রথম আমার কানে এলো।

: উদ্ধার কেন্দ্রে আমি বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি—সারাদিন-রাতই শয্যাশায়ী। কে ডাক্তার ডাকে, কে চিকিৎসা করে আর কে-ই বা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়? অমল যদি তার মায়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে না নিত তাহলে আমরা যে তখন কোথায় ভেসে যেতাম তা একমাত্র ভগবানই জানেন। ডাক্তার বদ্যি ওষুধপত্র বাড়িঘর সবই ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে। পার্ক সার্কাস থেকে পালাবার সময় পরণের কাপড় ছাড়া আর কিছুই আনতে পারিনি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলতেই দু তিন মাস সময় লেগেছিল। এই সময়টুকু আশা-ভরসা অর্থসামর্থ দিয়ে অমলই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওর ঋণ সারা জীবনেও শোধ হবার নয়। লোকে বলে ও ভাল ছেলে নয়, ওর স্বভাব চরিত্র মন্দ। কিন্তু আমার কাছে ও পরম চরিত্রবান পুরুষ—সেবা এবং সততার প্রতিমূর্তি। He has a lion's heart in his bosom. বাইরে কি করে বেড়ায় জানিনা, জানবার আগ্রহও নেই। মাঝে মাঝে পুলিস এসে এখানেও ওর খোঁজ খবর করে। মায়ের মনে সেটা ভাল লাগে না কিন্তু তবু আমি ওকে অশ্রদ্ধা করিনা। ওকে পেয়েছিলাম বলেই আবার আমি মেয়েকে নিয়ে আশার সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারছি। মেয়েটা বড় হয়েছে। এ বাড়িতে অমলের আসা যাওয়া হয়ত কারও চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। কিন্তু আমি জানি অশোকবাবু, পৃথিবীতে অমলই হল একমাত্র পুরুষ যার কাছে অনুরাধা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওর দিক থেকে

কোনদিন অন্থর কোন ক্ষতি হবে না। আমি মা। সন্তানকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চিনতে পারে না। আমার সুনিশ্চিত ধারণা অমলের মধ্যে একটা মৌলিক মহত্ত্ব আছে। একদিন সেই মহত্ত্ব ওর সমস্ত মলিনতাকে ম্লান করে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। একদিন ও বড় হবেই। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় কাল গুণছি।

কথাটা শেষ হবার আগেই অনুরাধা আবার এসে ঢুকল কামরায়। দেওয়াল আলমারীর কাছে গিয়ে একটা বোতল থেকে কাঁচের গ্লাসে ওষুধ ঢেলে মিসেস সরকারের সামনে এসে বলল: তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে মা।—মিসেস সরকার এক চুমুকে ওষুধটা গিলে ফেললেন। অনুরাধা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল: আপনার কাজের ক্ষতি হল না তো?

: উঁহু।

দাঁড়িয়ে উঠে বললাম: আজ যাই।

: আবার এস বাবা—আই মিন, আবার আসবেন অশোকবাবু।—বললেন মিসেস সরকার।

: আমাকে 'আপনি' বলবার কোন প্রয়োজন নেই।

: তাহলে আমাকেও 'আপনি' বলবার কোন প্রয়োজন নেই।—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অনুরাধা।

আমি কোন মন্তব্য না করে মিসেস সরকারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। অনুরাধা এল আমার পেছন পেছন। সদর দরজার কাছাকাছি এসে চাপা গলায় ডাকল: অশোক বাবু।

ফিরে দেখি একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

: একটা কথা বলছিলাম।

: বলুন।

: দেখুন, আমার মা লোকজন খুব ভালবাসেন। আমাদের তো আত্মীয় স্বজন নেই। এখানে কেউ আসে না আর মা-ও কোথাও যেতে পারেন না। তাই হঠাৎ কাউকে পেয়ে গেলে সহজে ছাড়তে চান না। আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো?

: একটুও নয়। আপনার মাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

: সত্যি বলছেন?—অনুরাধার মুখে খুশির হাসি দেখা দিল।

: হ্যাঁ, সত্যি বই কি। She is a valiant fighter all her life.

ওঁর সাহস, মনোবল এবং সহনশীলতা যে কোন মানুষকেই অনুপ্রাণিত করবে।

অনুরাধা প্রায় সঙ্গেসঙ্গে অন্যপ্রসঙ্গে চলে গেল: অমলদার সঙ্গে আপনার কতদিনের বন্ধুত্ব অশোকবাবু?

প্রশ্নটার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে আমি জবাব দিতে ইতস্তত করতে লাগলাম।

: ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়তেন বুঝি?—অধৈর্য হয়ে উঠছে অনুরাধা।

: না, আমরা এক স্কুলের ছাত্র নই।

: তবে?

আমি কিছুক্ষণ নীরব থেকে শেষে বললাম: ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ মাস দুই তিন আগে।

: মাত্র!—অবাক হয়ে গেল অনুরাধা।

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আর এই তিনমাসে মাত্র তিনবার আমাদের দেখা হয়েছে। তার মধ্যে একদিন তো আপনাদের বাড়িতে এসেই কাটিয়ে গেলাম।

: মাই গুডনেস। তাহলে তো দেখছি, আপনারা এখনও পর্যন্ত পরস্পরকে ভাল করে চেনেন না।

: আলাপ যখন হয়েছে তখন ক্রমে ক্রমে চেনা যাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তো এই ভাবেই গড়ে ওঠে।

: আপনি জানেন, অমলদার খুব বদনাম—

: জানি।

: জানেন!—অনুরাধা যেন চমকে উঠল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: স-ব জানেন?

একটু ইতস্তত করে বললাম: 'সব' বলতে কতখানি বোঝাতে চাইছেন, তা অনুমান করতে পারছি না। তবে যেটুকু জানি সেটুকু কিন্তু কম নয়।

: তা সত্ত্বেও আপনি ওর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্মানজনক বলে মনে করেন না?

: না।

: কেন?—অনুরাধা গভীর আগ্রহে আমার জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

: দেখুন, মেলামেশার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ মানি না। আমি মনে করি ভাল-মন্দ সব রকম লোকের সঙ্গে যত বেশি আলাপ-পরিচয় থাকে ততই আমার ভাল। লেখক হিসাবে সমাজের বিভিন্ন ধরণের লোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

: তাহলে আপনি মন্দ লোকের স্বরূপ জানবার জন্যই ওর সঙ্গে মিশছেন বোধ হয়?—ঘাড় বাঁকিয়ে অত্যন্ত ধূর্তের মত প্রশ্ন করল অনুরাধা। আমি নিজেকে আরও গুছিয়ে নিলাম। অসতর্কভাবে কিছু বে-ফাঁস বলা ঠিক হবে না।

: আজ্ঞে না, তা নয়। অমলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে আকস্মিক-ভাবে। তিনি ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। অখ্যাতি তাঁর অনেক কিন্তু সুখ্যাতিও তো কম নয়। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ভালো এবং বিশুদ্ধ মন্দ মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভাল মন্দ মিশে থাকে এবং ভালমন্দের সংমিশ্রণেই একটা মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তাঁর সম্বন্ধে আমার আগ্রহ নিছক মানুষ হিসাবে। ভালত্ব অথবা মন্দত্ব নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। অমলবাবুর সম্বন্ধে আমি কোন বিরূপ ধারণা পোষণ করি না।

আমার কথায় অনুরাধা খুশি না অখুশি বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ সে প্রসঙ্গ ধামা চাপা দিয়ে বলল : অমলদা অনেক দিন আসে না। যদি দেখা হয়, দয়া করে আসতে বলবেন।

: বলব। আজ চলি।

: আসুন।

দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। রাস্তার ভীড়ের মধ্যে পথ চলতে চলতে মনে হল, ওঁদের সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানবার ছিল সবই আজ জানা হয়ে গেছে। সত্যি, এ অতি মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কাহিনী। কিন্তু আমাদের সমাজ জীবন ট্রাজেডি এমন সর্বব্যাপী যে মানুষের ক্ষয় ক্ষতি শোক তাপ যতই মর্মবিদারক হোক, আমাকে তেমন গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ ইত্যাদি ভয়ানক মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো চোখের সামনেই ঘটেছে। অনাহার উৎপীড়ন, খুন জখম দেখে দেখে আমার দুঃখানুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। ওসব শুনলে অথবা দেখলে মনের মধ্যে শোকাবেগ সৃষ্টি হওয়ার বদলে একটা দমবন্ধ করা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিসেস সরকারের কাহিনীর মধ্যে একটা উজ্জ্বল ছবি আছে।

জীবনের সর্বস্ব হারিয়েও তিনি হাল ছাড়েন নি। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণতে গুণতে এখনও মেয়েকে 'মনের মত' করে মানুষ করার আকাঙ্ক্ষা তার অমর। শোক দুঃখ ব্যর্থতা গ্লানি জীবনের একটা দিক। তাকে কেউ জয় করতে পারে না। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও পারেন নি। কিন্তু তার কাছে মাথা নত করে পরাজয় বরণ করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। যে মানুষ জীবনের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আত্ম প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে পারে তার জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই গৌরবময়। সেই হিসাবে মিসেস সরকার আমার কাছে গভীর শ্রদ্ধাভাজন মহিলা। বল্টুর সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কটাও আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তার চরিত্রের এই এই দিকটা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। মানুষকে দূর থেকে দেখলে তার কিছুই যে দেখা যায় না সেটা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। মিসেস সরকারের কাহিনী না শুনলে চিরকাল আমার মনে এই ধারণাই বলবৎ থাকত যে বল্টু নিছক একটা সমাজবিরোধী অপরাধী। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। অন্তত একটি ক্ষেত্রে তার মানবতাবোধ মহত্বের পর্যায়ে উঠে গেছে। মিসেস সরকার বলেছেন, অনুরাধা বল্টুর কাছে সব চেয়ে নিরাপদ। বল্টুও বলেছিল অনুরাধার সঙ্গে তার হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক নয়। অনুরাধার শিক্ষা-দীক্ষা যে স্তরের তাতে বল্টুর সম্বন্ধে ও ধরণের কোন দুর্বলতা থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। সেখানে ওর রুচি এবং সংস্কৃতি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া আমি যতটুকু বুঝেছি, অনুরাধা বেশ চালাক এবং গর্বিত মেয়ে। অশিক্ষিত কুখ্যাত লোককে 'দাদা' হিসাবে মেনে নিতে পারে। প্রেমিক হিসাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রেম অতটা অন্ধ কিনা সন্দেহ আছে আর বল্টুও সেভাবে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। অনুরাধার সম্বন্ধে তার যদি ঐ ধরণের লোভ থাকত, তাহলে সে মিসেস সরকারের চরম বিপর্যয়ের সময়ই সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। এভাবে বছরের পর বছর, অপেক্ষা করে বসে থাকত না। কারণ সে তো বেশ ভাল করেই জানে যে অনুরাধা যতই লেখাপড়া শিখছে এবং বড় হচ্ছে, ততই সে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

সুতরাং ও ধরণের ব্যাপার এখানে নেই। বল্টুর সম্বন্ধে অনুরাধার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞার ভাবও তাই প্রমাণ করে।

আমার মনে হয়, বল্টু একটা মনস্তাত্বিক মুহূর্তে মিসেস সরকারকে 'মা' ডেকে একটা আবেগের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। ওর নিজের মা নেই। সেখানে

ওর মাতৃস্নেহের বুভুক্ষা থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু বল্টু এখন কোথায়? মন্ত্রীদের সঙ্গে তার মহরম মহরম থাকতে এতদিন হাজতে আটকে থাকবার মানে কি? মন্ত্রীরা তো যে কোন মুহূর্তে জামিনে তাকে খালাস করে মামলাটা ধামাচাপা দিতে পারেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এবার তার খোঁজ করতে হবে। লোকটাকে দেখবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়েছে।

পরদিন বিকেলে কারখানা থেকে ফিরে বগলা পাইনের বাড়ির পাশের সেই চায়ের দোকানে গিয়ে বল্টুর খোঁজ করলাম কিন্তু ম্যানেজার তার কোন খোঁজ রাখেন না। তিনিও নাকি অনেক দিন বল্টুর দেখা পাননি।

: কলকাতায় আছে তো?

ম্যানেজার একটু গলা চেপে বললেন: তাই বা জানব কি করে স্যার। ও সব লোক কখন কোথায় থাকে তা বলা বড় শক্ত। জানেন তো সবই।

এর পর দুতিন দিন আমি রোজ একবার করে চায়ের দোকানে বল্টুর খোঁজ করে আসতে লাগলাম কিন্তু তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। শেষে বিরক্ত হয়ে সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। পরের সপ্তাহে রবিবার যখন দাড়ি কামাতে বসেছি, সেই সময় হঠাৎ বল্টু এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। কাপড়ে মালকোচা, গায়ে টুইলের হাফ শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল।

: নমস্কার অশোকবাবু। কেমন আছেন?—হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন করল বল্টু। আমি তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। চেহারাটা আগের মতই সুগঠিত এবং তাজা। তবে মুখের হাসিটা যেন বড় বেশি গম্ভীর।

: নমস্কার। আসুন। আজ ক'দিন আপনারই খোঁজ করছিলাম।

বল্টু আমার তক্তাপোষের উপর বসে বলল: আমার খোঁজ করছিলেন? কেন বলুন তো?

: অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তাই। তারপর আপনার খবর টবর ভাল?

: এই একরকম চলে যাচ্ছে।

: মিসেস সরকারদের ওখানে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে?

বণ্টু মাথা নেড়ে বলল : না, অনেকদিন যাইনি।

: সে কি মশাই, আপনি যান না বলে তাঁরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক'দিন আগে বৌবাজারের মোড়ে অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল। মিসেস সরকার আমার কাছে আপনার খবরাখবর জানতে চাইছিলেন।

বণ্টু নিস্পৃহভাবে বলল : অ। আপনি কি বললেন?

: বললাম, আপনার খবর জানিনা।

বণ্টু হাসল।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম : এতদিন কোথায় ছিলেন বণ্টুবাবু?

: কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে ফিরেছি।

: বাইরে কোথায়?

: পাটনায়। সেখানে আমার বড়দি থাকেন।

মনে মনে কেমন বেকুব বনে গেলাম। এতদিন আমি ভাবছিলাম, বণ্টু লালবাজারের হাজতে পচছে। কিন্তু তাতো নয়। আসলে হয়ত সেই মামলার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই।

: এখন আপনার কোন কাজ নেই তো অশোকবাবু?

: আজ্ঞে না।

: তাহলে তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে চলুন। বাইরে কোথাও গিয়ে চা খেয়ে নি। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গেও আমার অনেক কথা আছে।

তাড়াহুড়ো করে দাঁড়িটা কামিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বণ্টু আজ বড় বেশি গম্ভীর। বড় বেশি আত্মমগ্ন। মনে হয়, গুরুতর কিছু চিন্তা করছে।

চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসলাম আমরা। সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলের উপর রেখে বণ্টু বলল : আমার সঙ্গে কি কথা আছে বলছিলেন?

বললাম : হ্যাঁ, মিসেস সরকারের কাছ থেকে সব কাহিনী শুনে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে গেছে। ওঁদের জন্য আপনি যা করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। দিন, আপনার হাতখানা দিন দেখি।

বণ্ট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে নিরুৎসাহ ভাবে ডান হাতখানা

এগিয়ে দিল। আমি সেটা শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বললাম: কনগ্রাচুলেশনস্।

আমার নাটকীয় আচরণে বল্টু যেন লজ্জা পেয়ে মিইয়ে গেল। মুখে একটা হাসির রেখা টেনে বলল: এমন আর কি করেছি অশোকবাবু। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার কথা তো জানেন। পার্ক সার্কাসে ওঁর স্বামী মারা যান। মেয়ে নিয়ে যখন উনি রাজরাজেশ্বরী ক্যাম্পে এসে ওঠেন তখন শ'কে ভুগছেন। সারা দিনই প্রায় অজ্ঞান হয়ে থাকেন। মেয়ে তখনও লায়েক হয়নি—স্কুলে পড়ত। তার ওপর সদ্য বাপ মরেছে। দিন রাত খালি কাঁদে। ওদিকে দু'একজন বদ ছোকরার নজরও পড়ল তার উপর। আমি ক্যাম্পের ইনচার্জ। তাই একটু সাহায্য করতে হয়েছিল। তারপর যখন 'মা' ডেকে ফেললাম, তখন আর এড়াই কি করে?

: যে ভাবেই হোক, আপনি একটা মহৎ কাজ করে ফেলেছেন বল্টুবাবু। আপনার জীবনে এই ঘটনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর সরকার পরিবার চিরকাল আপনার কাছে ঋণী থাকবেন।

বল্টু একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল: তার কি মূল্য আছে অশোকবাবু। লোকে আমার মন্দটাকেই দেখে। তাদের কাছে আমি গুণ্ডা বদমাইস ছাড়া আর কিছুই নই।

ওর এই আকস্মিক স্বীকারোক্তি শুনে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আজ ওর গলায় আত্মগ্লানির সুর সুস্পষ্ট। আমি নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

: আপনি বলছিলেন, মিসেস সরকারের ওখানে যাইনা। কেন যাব বলতে পারেন? হ্যাঁ, মিসেস সরকার আমাকে ছেলের মতই স্নেহ করেন কিন্তু তাঁর মেয়ের কাছে আমি অবাঞ্ছনীয় লোক। আমাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা। গেলেই অনবরত ক্যাটক্যাট করে কথা শোনায়। সেদিন তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনার সামনেই আমার সঙ্গে সে কি ব্যবহারটা করল।

: ওটাকে অত বড় করে দেখছেন কেন? ভাই বোনে অমন খটাখটি কোন সংসারে নেই?—ব্যাপারটাকে লঘু করতে চাইলাম আমি।

বল্টু বলল: বড় করে মোটেই দেখিনা। দেখলে দু'তিন বছর আগেই ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যেত। আত্মীয়-স্বজন ভাই-বন্ধুর

গালাগালি সাধারণত আমি গায়ে মাখি না। কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে অশোকবাবু। হ্যাঁ, আমি গুণ্ডা বদমাইসই আছি কিন্তু তোমাদের কাছে আমি কি গুণ্ডামী বদমাইসী করতে যাই? অত গালাগালি অপমানের কি ধারধারি বলুন।

: ওঁরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বল্টুবাবু।

অনুরাধার হয়ে আবার আমি ওকালতি করার চেষ্টা করলাম।

বল্টু হেসে ফেলল: আমার হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। বাপ মা মারা যাবার পর কত লোক যে আমার হিত করছে, তার হিসেব রাখা শক্ত।

: ওঁরা বোধ হয় সে-রকম হিতাকাঙ্ক্ষী নন। ওঁরা সত্যিই আপনার মঙ্গল চান।

: চাইতে পারেন। কে আমার ভাল চায় আর কে মন্দ চায়, তা নিয়ে আমার আর মাথা ব্যথা নেই। অনেক অপমান হজম করেছি। আর ভাল লাগেনা। নিজের বোন ভাল করতে পারেনি তার পাতানো বোন। ওর কি ধারণা জানেন, গুণ্ডামী করে আমার পেট চলে।

'ওর' মানে অনুরাধার। বল্টুর সমস্ত অভিযোগ তার একলার বিরুদ্ধে।

: না না, তা নয়—

: হ্যাঁ মশাই, তাই। আপনি জানেন না অশোকবাবু। ভাল কাপড় জামা পরতে দেখলে চোখ মটকে জিজ্ঞাসা করে, কেনবার টাকা পেলাম কোথায়। আই-এ পাশ করার পর একটা ফাউন্টেন পেন কিনে দিয়েছিলাম। কিছুতেই নিলে না। টাকাটা যে কারও পকেট মেরে সংগ্রহ করা হয়নি, সেটা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জিনিসটা নেবে কোন সাহসে? তাহলে যে পাপ হবে। সঙ্গে সঙ্গে কলমটা আমি ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলাম। কথার ধরণটা একবার দেখুন। ভাল কাপড় জামা পরবার জন্য আমাকে গুণ্ডামী করতে হবে। কেন, আমার বাপ ঠাকুর্দা কি ভিখিরী ছিল? আজ্ঞে না। পেটের ধান্দায় তাদের দেশ ছেড়ে বর্মায় পালাতে হয়নি। কলকাতা সহরেই তাঁরা দুধভাত খেয়ে কাটিয়ে গেছেন। কিছু নেই, তাও ঠাকুর্দার দানে এখনও মেডিকেল কলেজে একটা ওয়ার্ড চলছে। বাবা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনিও কিছু কম রোজগার করেন নি। দাদারাও কেউ বাজে লোক নন। কেবল আমিই নিজের দোষে ভদ্রসমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছি।

: সেইটাই তো আশ্চর্য। এমন তো হবার কথা নয়। আপনি এদিকে ঝুঁকলেন কি করে?

বণ্টু কিছুক্ষণ মৌন থেকে শেষে বলল: কি করে যে ঝুঁকলাম তা আমি নিজেই ভেবে পাইনা।

: আপনি ভাবেন?—আমি হেসে ফেললাম।

বণ্টুও হাসল: গুণ্ডা হলেও মানুষ তো। তাই মাঝে মাঝে ভাবনা এসে যায়। তাছাড়া এবার জেলে গিয়ে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।

: জেলে গিয়েছিলেন নাকি?—আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

: হ্যাঁ, মাসের গোড়ার দিকে কয়েকদিন জেল হাজতে কাটাতে হয়েছে।

: কেন?

বণ্টু অনেকক্ষণ ভেবে বলল: দেখুন, এই 'কেনর' উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। দেশে যদি সত্যিই ন্যায়বিচার থাকত তাহলে অনেকদিন আগেই আমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলা উচিত ছিল। দণ্ডবিধির কোন ধারাই বোধ হয় আমি এড়াতে পারিনা। লুণ্ঠন গৃহদাহ হত্যা—কি যে করিনি তা বলা শক্ত। সে সব অপরাধের জন্য কোন দিন কেউ আমার একগাছি চুলও স্পর্শ করেনি। কিন্তু যেদিন থেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, সেদিন থেকেই আমি বারবার বিপদে পড়ছি। এবার জেল হাজতে যেতে হয়েছিল একটা মিথ্যা মামলায়।

: ব্যাপারটা খুলে বলুন তো বণ্টুবাবু।—আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম।

: ব্যাপার আর কি। কিছুদিন আগে শিয়ালদায় একটা মারামারি হয়েছিল জানেন?

: জানি।

: যেদিন সেই মারামারি হয় সেদিন আমি চন্দননগরে ছিলাম। কলকাতায় ফিরে আসতেই পুলিশ আমায় রাস্তায় এ্যারেস্ট করে লালবাজারে নিয়ে যায়।

: আপনি সে হাঙ্গামায় ছিলেন না?

: কি করে থাকব বলুন। আমি তখন কলকাতার বাইরে। মারামারির খবরও আমি জানতাম না।

: সে কথা পুলিশকে বললেন না কেন?

: বললেই শুনবে নাকি। এর পেছনে যে অনেক চক্রান্ত আছে অশোকবাবু।

: কি রকম ?

: সে অনেক কথা। বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন কেন এপথে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে স্বেচ্ছায় এদিকে আসিনি। যারা আমায় এ রাস্তার ঠেলে দিয়েছিল তারা আজ দেশের মন্ত্রী, কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, সমাজের পরম মান্যবর ব্যক্তি। আর তাদেরই সঙ্গে কিছুকাল ধরে চলছে আমার রেশারেশি।

: কি রকম ?

বন্টু কিছুক্ষণ মৌন থেকে শেষে বলল: তাহলে খুলেই বলি সব। আপনার কোন কাজ নেই তো এখন ?

: না, কোন কাজ নেই। আপনি বলুন।

: আমরা পাঁচ ভাই। চার বোন। আমি হলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাই বাপ মা একটু বেশি আদর দিয়ে অল্প বয়সেই আমাকে লায়েক করে তুলেছিলেন। ভাইবোনেরা সকলেই লেখাপড়ায় ভাল কিন্তু আমার লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহ ছিলনা। খেলাধুলো আড্ডা ইয়ারকির দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। চেহারাটা বরাবরই ভাল। তার উপর আমি নিধুবাবুর আখড়ায় ব্যায়াম চর্চা করতাম। আর মায়ের কাছ থেকে হাতখরচও পেতাম প্রচুর টাকা। সমবয়সীদের মধ্যে অল্প বয়সেই 'বন্টুদা' হয়ে উঠলাম। আমাকে কেন্দ্র করে বখা ছেলেদের রীতিমত একটা দল গড়ে উঠল পাড়ায়। একে ধমকাই, ওকে শাসাই, তাকে সায়েস্তা করি—এই সব ছিল আমাদের কাজ। পাড়ার স্বল্পবিত্ত গরীব লোকেরা আমাদের ভয় খায়, খাতির করে এবং আমাদের ছোটখাটো অত্যাচার নীরবে হজম করে নেয়। তাতে আমাদের আস্কারা বেড়ে যায়। যুদ্ধের সুরুতে বাবা এবং মা দুজনেই পরপর মারা গেলেন। দাদারা সব নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই আমাকে শাসন করার আর কেউ রইল না। তখন কলকাতায় চোরাকারবার মজুতদারী কন্ট্রাক্টরী ইত্যাদি নানা রকম বদমাইসী সুরু হয়ে গেছে। ওসব যারা করে তাদের হাতে সব সময় কিছু জবরদস্ত লোক থাকা দরকার। আমরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে ভিড়ে গেলাম। ফলে টাকা পয়সাও প্রচুর আসতে লাগল। সে-সব টাকা আমরা ফুর্তিফার্তা করে উড়িয়ে দিতাম।

যুদ্ধ থামবার পর যখন নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে সমস্ত দেশময় আলোড়ন এসে গেল তখন আমাদের মনে সৎভাবের উদয় হল। ভাবলাম এতকাল যা করেছি, করেছি। এবার ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। আমরা সব পুলিসের গাড়ি পোড়ানো, প্রসেসন, ষ্ট্রাইক ইত্যাদিতে মেতে উঠলাম। সেই সময় করালী বাঁড়ুজ্যে আর বগলা পাইনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

: করালী বাঁড়ুজ্যে কে?

: মন্ত্রী করালী বাঁড়ুজ্যে। তিনি তো আমাদের পাড়ার লোক।

: আই সি।

: করালীবাবু জেল টেল খেটেছেন, রাজনীতি করা মানুষ। কাজেই আমরা সব ওঁর চেলা হয়ে গেলাম। মাস কয়েক খুব হৈ হৈ করে কাটল। ক্লাব লাইব্রেরী দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি তৈরি করে 'সৎ' হবার চেষ্টা করছি—এমন সময় বাধল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর তাতেই হল আমাদের সর্বনাশ।

: কি ভাবে?

: দাঙ্গার প্রথম দিকে আমরা রিলিফের কাজ করছিলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদে করালী বাঁড়ুজ্যে আর বগলা পাইন নানারকমের উস্কানি দিয়ে আমাদের দাঙ্গায় নামিয়ে দিল। সেই যে আমরা অধঃপতনের শেষ ধাপে নামলাম আর উঠতে পারলাম না।

: করালীবাবুরা আপনাদের দাঙ্গায় নামালেন!—আমি দারুণ বিস্ময় বোধ করলাম: কিরকম হল ব্যাপারটা?

: ব্যাপরটা খুবই সরল। দাঙ্গার সময় আমাদের নিজেদের মনই যথেষ্ট উত্তেজিত ছিল। সেই সময় করালীবাবু বগলাবাবুরা স্টেনগান, পিস্তল, জিপ আর নোটের তাড়া সামনে রেখে আমাদের বোঝালেন যে, আমরা যদি দাঙ্গায় না নামি তাহলে আর বাঙলাদেশে থাকতে পারবো না। জিন্না-সুরাবর্দীরা মিলে পুরো বাঙলা দেশটাকে গিলে খাবে। তাছাড়া এক তরফা মার খেলে তো চলবে না। প্রতিশোধ নিতে হবে। ঢিলের বদলে পাটকেল ছুঁড়তে হবে। নইলে জিন্না সুবার্বর্দীর দল সায়েস্তা হবে কি করে? ব্যাস আমরাও নেমে পড়লাম। দাঙ্গা থামল, দেশ ভাগ হল। করালীবাবু মন্ত্রী হলেন, বগলবাবু কাউন্সিলর। কিন্তু আমরা যে গুণ্ডা সেই গুণ্ডাই রয়ে গেলাম।

: দাঙ্গার সময় উত্তেজনাবশে যা করেছিলেন করেছিলেন, দাঙ্গার পর সে সব ছেড়ে দিলেন না কেন ?

: ছাড়বার উপায় ছিলনা। গান্ধীজী যখন দাঙ্গা থামাবার জন্ত বেলেঘাটায় এসে থাকেন, সেই সময় আমরা ঠিক করেছিলাম যে অস্ত্রশস্ত্র সব গান্ধীজীর কাছে জমা দিয়ে ওসব ছেড়ে দেব। কিন্তু করালী বাবু আমাদের বোঝালেন যে এসব ভাবপ্রবণতার ব্যাপার নয়। গান্ধীজী আজ বাদে কাল অন্যত্র চলে যাবেন। তখন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধলে আমরা বাঁচব কি করে? দাঙ্গা করি বা না করি, হাতের অস্ত্র যেন হাতেই থাকে। আমারাও তাই বুঝলাম। হাতের অস্ত্র হাতেই রয়ে গেল। ইতিমধ্যে সারা দেশময় রুস্তম হিসাবে আমাদের নামডাক হয়ে গেছে। 'বণ্টুর দল' শুনলে লোকে ভয়ে কাঁপে। আমরা রামের হয়ে শ্যামকে সায়েস্তা করি, শ্যামের হয়ে যদুকে 'টাইট' দিই, একে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করি, তাকে ধমকে পাড়া ছাড়া করি। এই সব হয়ে দাঁড়ালো নিত্যকার ঘটনা। করালীবাবু কাজের লোক। আমাদের দিয়ে তিনি তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে আগে হলেন দলের নেতা। তারপর হলেন মন্ত্রী। তখন তাঁর গদি নিরাপদ রাখবার জন্য বিরোধী দলকে সায়েস্তা করার ভার পড়ল আমাদের ওপর। করালীবাবুর নির্দেশে আমরা বোমা পটকা নিয়ে সভায় সভায় হামলা করতে লাগলাম। ওয়েলিংটন আর ডিক্সন লেনের হামলার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ?

: আছে বই কি। সে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

: হ্যাঁ, তাই বটে। প্রকাশ্য দিনের বেলায় স্টেনগান চালিয়ে চার জনকে খুন করা হয়েছিল।

: এ যে সাংঘাতিক কথা বলছেন বণ্টুবাবু। সেই হত্যাকাণ্ডের পেছনে করালীবাবু ছিলেন ?

: ছিলেন। এবং আমিই তার সাক্ষী। দেখলেন না, ব্যাপারটা পুলিশ একেবারে ধামাচাপা দিয়ে দিল।

তাই বটে। বেশ মনে পড়ছে অতবড় একটা হত্যাকাণ্ডে পুলিশ কোন তদন্তই করেনি। এতদিন বাদে তার কারণটা বুঝলাম।

: করালীবাবু দেখছি মারাত্মক লোক। অথচ খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি তিনি অহিংসার কথা বলছেন।

বণ্টু হো হো করে হেসে উঠল : সেই তো মজা অশোকবাবু। উনি

নিজে হাতে কাউকে খুন করেছেন কিনা জানিনা, তবে ওঁর প্ররোচনায় কলকাতায় বেশ কয়েকটা বড় বড় হত্যাকাণ্ড হয়েছে জানবেন।

: আপনি যে আরব্য উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর কাহিনী বলছেন বন্টুবাবু। এ সব সত্যি ?

: প্রত্যেকটি কথা সত্যি।—গম্ভীর ভাবে বলল বন্টু: করালী বাবু সারাজীবন চাকরী করেননি। বাড়ির অবস্থা ছিল খুব খারাপ। এর ওর চাঁদায় সংসার চলত। আর তিনি বছর মন্ত্রীগিরি করে ভদ্রলোক বউয়ের নামে বেনামীতে এন্টালীতে একখানা ম্যানসন বানিয়েছেন, ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েছেন আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বালির জমীদার বাড়িতে। এদিকে সেদিকে ছেলেমেয়ের নামে আরও যে সব সম্পত্তি কিনেছেন সেগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। বলতে পারেন, এত টাকা উনি কোথায় পেলেন ?

: কোথায় পেলেন ?

: পেলেন আমাদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে।

: কি ভাবে ?

: কলকাতায় বড় বড় চোরাকারবারী আছে। সকলের সঙ্গেই ওর ঘনিষ্ঠ আঁতাত। উনি তাঁদের টাউটগিরি করে মোটা টাকা পেয়ে থাকেন।

: তারা ওঁকে টাকা দেয় কেন ?

: কারণ উনি গভর্ণমেন্টের গোপন খবর সব আগে আগেই তাঁদের জানিয়ে দেন। তাদের গুদোম পাহারা দেন।

: গুদোম পাহারা দেন মানে ?

: যে যব চোরাগুদোমে পুলিশ পাঠানো সম্ভব নয় সেই সব চোরা-গুদোম পাহারা দেবার ভার পড়ে আমাদের উপর। আমরাও গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে চোরাকারবারীদের লুঠের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অস্ত্রধারণ করতে পেছপা হইনা।

: কিন্তু পুলিশ—

: পুলিশকে করালীবাবু তাঁর পকেটে পুরে রেখেছেন।

: তাই যদি হয় তাহলে করালীবাবুর নিজের লোক হয়ে আপনি পুলিশের হাতে মিথ্যে মামলায় ধরা পড়লেন কি করে ?

: কারণ করালীবাবু এখন আর আমাকে নিজের লোক বলে ভাবতে পারছেন না। গত এক বছর ধরে আমাদের মনকষাকষি চলছে।

: কেন ?

: সে অনেক ব্যাপার। আমার আর এসব ভাল লাগছেনা।

: সে কি ?—আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলাম না : এতদিন বাদে—

: হ্যাঁ। ভালমন্দ একটু দেরিতে বুঝতে শিখছি। মুখ্যু কিনা। বল্টু রসিকতার সুরে হাসল : সত্যি কথা কি জানেন। মাতব্বরী করার নেশাটা বড় মারাত্মক। এতদিন সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমি তো পেশাদার গুণ্ডা নই। ভদ্র সন্তান। শরীরে বাপ ঠাকুর্দার রক্ত রয়েছে। সেটা মাঝে মাঝে উল্টো গায়। আগে ভাবতাম, লোকে আমাকে ভয় খায়, সেইটাই আমার বড় কৃতিত্ব। এখন দেখছি লোকে আমাকে ভয় খায় বটে তবে সেই সঙ্গে নিদারুণ ঘৃণাও করে। সকলেই এড়িয়ে থাকতে চায়। আত্মীয় স্বজনের কাছে আমি প্রায় একঘরে হয়ে আছি। কিছুদিন আগে শিবপুরে আমার এক ভাগ্নীর বিয়ে হল। বাড়িশুদ্ধ সবাই সেখানে গেছে অথচ আমাকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করা হয়নি। ভাবলাম, ভাগ্নীর বিয়েতে আবার নেমন্তন্ন কিসের ? সন্ধ্যা বেলায় সোজা চলে গেলাম সেখানে। আমাকে দেখে বিয়ে বাড়িতে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এ ওকে চোখ ঠারে, সে তার কানে কানে ফিসফিস করে। আমি যেন ধূমকেতু। দাদা দিদি জামাইবাবু সকলেরই মুখ গম্ভীর। খুব অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। একটু বাদে দিদি আমায় আড়ালে ডেকে বলল, বল্টু, তুই ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে বস। বুঝলাম, আমাকে নিমন্ত্রিত লোকদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ভাঁড়ার ঘরে একবার ঘুরপাক খেয়ে সকলের অলক্ষ্যে সোজা বাসায় ফিরে এলাম। সত্যি কথা বলব অশোকবাবু, সেদিন আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তারপর অনুরাধার ব্যাপারটাই দেখুন। চাল নেই চুলো নেই—কে ওদের পোঁছে ? নিতান্ত দয়া পরবশ হয়ে আমিই স্থিতি করে দিয়েছি। বাপের হাজার চল্লিশেক টাকা জমা ছিল, তাই রক্ষে। নইলে এতদিন শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যেত। আমার সঙ্গে তার ব্যবহারটা দেখলেন তো। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। আমার ছোড়দা কিছুকাল আগে বিয়ে করেছেন। বউদি বেথুন কলেজের প্রফেসর। খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারেন। আর মানুষটাও চমৎকার। বাড়ির মধ্যে একমাত্র তিনিই আমায় একটু স্নেহ করতেন। একদিন কথায় কথায় বললেন, তিনি বেহালা শিখেছেন তাঁর দাদার কাছে আর সেই দাদাটি মারা গেছেন ডিক্সন লেনের হত্যাকাণ্ডে।

শুনেই মাথার মধ্যে চড়াক করে উঠল। লজ্জায় আমি আর বউদির মুখের দিকে তাকাতে পারিনা। তারপর থেকে আমি ছোট বউদিকে এড়িয়ে চলতাম। ক্রমে লোক পরম্পরায় তিনি জানতে পারেন যে ডিক্সন লেনের হামলায় আমি একজন প্রধান নায়ক ছিলাম। সেই থেকে তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না। এব্যাপারটায় আমি যে কত বড় ঘা খেয়েছি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না অশোকবাবু। অন্যায় যে করছি সেটা বরাবরই জানতাম কিন্তু অন্যায়টা কত সাংঘাতিক, সেটা আমি সেই প্রথম নিজের মধ্যে অনুভব করলাম।

: আপনার দাদারা কোন দিন কিছু বলেন নি ?

: গোড়ার দিকে ধমক-ধামক দিতেন। দাঙ্গার সময় একেবারে ছেড়ে দিলেন। তাঁদের আমি দোষ দিই না। নিজেদের কাজকর্ম ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে সকলকেই ব্যস্ত থাকতে হয়। আমাকে শাসন করার সময়ই বা কোথায় ? আর সে শাসন মানতই বা কে ?

: আপনি দাদাদের সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকেন তো ?

বল্টু একটু ভেবে বলল : এক হিসেবে থাকি আর এক হিসেবে থাকি না। ভাইরা সব একই বাড়িতে থাকে এবং একই হাঁড়িতে খায় কিন্তু আর সব ব্যাপারে সকলের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু খাওয়া আর শোয়ার। কিন্তু মাসের অর্ধেক দিনই আমি বাড়িতে খাই না বা শুই না। বউদিদের সঙ্গে কিছ কিছু যোগাযোগ থাকলেও দাদাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎই হয় না।

: আই সি। তাহলে কথাটা দাঁড়ালো এই যে আপনি বিভিন্ন কারণে অভ্যস্ত জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভাবছিলেন যে ও পথটা ছেড়ে দেবেন।

: ঠিক বলেছেন।

: কিন্তু তাতে করালীবাবুর সঙ্গে মন কষাকষি হল কেন ?

: করালীবাবু আমাকে কয়েকটা অন্যায় কাজ করতে বলেছিলেন। রাজি হইনি বলে অসন্তুষ্ট হলেন এবং এখন তার সন্দেহ হয়েছে আমি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছি।

: কি কাজ করতে আপনি রাজি হলেন না ?

: সিকিউরিটি এ্যাক্টের বিরুদ্ধে যখন খুব আন্দোলন উঠেছিল, সেই সময়

উনি সভা শোভাযাত্রার উপর বোমা ফেলতে বলেছিলেন। আমাকে নারাজ দেখে অন্য লোককে দিয়ে সেই কাজ করালেন কিন্তু এমনিই আমার অখ্যাতি যে লোকে বলল 'ওটা বন্টুর কীর্তি'। এর পর এলো ইলেকসন। উনি কলকাতায় দাঁড়াতে সাহস পেলেন না, গেলেন মফঃস্বলে। সেখানে ভোটারদের ভয় দেখাবার জন্য আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি গেলাম না। পর পর দুটো ঘটনায় আমার সম্বন্ধে ওর মনে একটা সন্দেহ ঢুকল। ঠিক ঐ সময় কলকাতার একটা ব্যাঙ্ক লুট হয়। সেটা যে কাদের কাজ তা আজও আমি জানতে পারিনি। করালীবাবু একদিন আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "বন্টু আমি খবর পেয়েছি তুমি ঐ ডাকাতিতে ছিলে। সি-আই-ডি পুলিশেরও রিপোর্ট সেই রকম। তোমাকে তো আর বাঁচানো যাবে না ভাই।" বুঝলাম, আমাকে Blackmail করতে চাইছে। লুটের বখরা চায়। বললাম, "আজ্ঞে না, আমি ওর মধ্যে ছিলাম না। পুলিস ভুল রিপোর্ট দিয়েছে।" তিনি বললেন, "ওকথা বললে কি চলে? কলকাতায় কে কি করছে না করছে, তা গোয়েন্দা পুলিশের নখদর্পণে।" শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। বললাম, "তাই যদি হয়, তাহলে আপনি এখনও জেলখানায় না গিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা বিচারে জেলে পাঠাচ্ছেন কি করে?" করালীবাবুর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বললেন, "যা খুশি করোগে। ছোট ভাইয়ের মত দেখি, তাই সময় থাকতে সতর্ক করে দিলাম। নইলে আমার আর কি।" সেই থেকে করালী বাবু আমাকে নানা ভাবে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঠিক কায়দা করে ফাঁসাতে পারছেন না। কারণ ওঁর ভয় আছে, আমি যদি ডকে উঠি তাহলে ওনার এতদিনের অপকীর্তি সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই উনি আমাকে হাজত পর্যন্ত টানছেন, আদালতে নিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না। বার বার খোঁচা খেতে খেতে আমারও রাগ চড়ে যেতে পারে। তখন একটা উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কা আছে। এবার জেল হাজতে গিয়ে একজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি আমায় কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকবার পরামর্শ দিলেন।

: ভাল পরামর্শই দিয়েছেন। এ রকম একজন পাওয়ারফুল লোক যদি ক্রমাগত আপনার পেছনে লেগে থাকে তাহলে আপনি এখানে টিকবেন কি

করে? প্রয়োজন বোধ করলে আপনাকে উনি পৃথিবী থেকেও সরিয়ে দিতে পারেন।

বল্টু হাসল : তা হয়ত পারে তবে সেটা করা খুব সহজ হবে না। বল্টু মজুমদারের উপর এ্যাটেম্পট্ করবে এমন সাহস কলকাতায় কারও নেই।

: এতে আর সাহসের কি আছে বল্টুবাবু। চোরা গোপ্তা ঝেড়ে দিলেই হল। আপনার শত্রু যে বড় সাংঘাতিক।

: ওতে আমি ভয় খাই না তবে নিজের মঙ্গলের জন্যই আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে থাকলে নিজে কিছু করি বা না করি দলের লোকদের সঙ্গেই ওঠ-বস করতে হবে। তাতে আমি যেখানে আছি, সেখানেই থেকে যাব। তাই জেল হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম বড়দির কাছে পাটনায়।

: আপনার জামাইবাবু কি করেন সেখানে?

: এ্যাডভোকেট।

: বয়স কত?

: পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

: তাহলে দিদি আপনার চেয়ে অনেক বড়।

: হ্যাঁ, ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম। আমাকে খুব ভালবাসেন।

: ভালই যদি বাসেন তাহলে এতকাল তিনি আপনাকে শোধরাবার চেষ্টা করেন নি কেন?

বল্টু একটু ভেবে বলল : করেন নি বললে ভুল হবে। আমাকে অনেক বার পাটনায় চলে যাবার জন্য চিঠি দিয়েছেন কিন্তু কারও সৎ পরামর্শ কানে তোলবার মত অবস্থায় তো ছিলাম না। অল্প বয়সেই যে লায়েক হয়ে গেছি।

: পাটনায় গিয়ে কি করবেন ঠিক করেছেন?

: তাই নিয়েই তো এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনার কাছে আজ সেই পরামর্শই করতে এসেছিলাম।

: কি বলুন তো।

: দিদির ইচ্ছে, আমি আবার লেখাপড়া সুরু করি। বলছেন, "অন্তত স্কুল ফাইনালটা পাশ কর। নইলে বাপ ঠাকুর্দার আত্মা স্বর্গেও শান্তি পাবে না।" ম্যাট্রিক পাশ করার পর বড়দির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর

বুড়ো বয়সে উনি আবার লেখাপড়া সুরু করেন। বছর দেড়েক আগে বি-এ পাশ করেছেন। এখন আবার এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ছেলে পুলে নেই। ঐ সব নিয়েই আছেন। এখন তাঁর খেয়াল চেপেছে, আমাকেও পাশ করিয়ে ছাড়বেন।

: আপনার দিদির ক্ষমতা আছে। তাঁর অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।— হাসিমুখে বললাম আমি : আপনার সম্বন্ধে তাঁর যে খেয়াল চেপেছে, সেটাকে বদখেয়াল কোন মতেই বলা চলে না।

: আপনি কি মনে করেন, এই বয়সে আবার পড়াশোনা সুরু করলে আমি পাশ করতে পারব ?

প্রশ্নটা কঠিন। লেখাপড়ায় ওর মাথা কি রকম তা জানি না। আর এত বছর অতি জঘন্য সমাজবিরোধী একটা দলে মাতব্বরী করবার পর শেষ পর্যন্ত পড়াশোনায় ওর মন বসবে কিনা তাও বলা শক্ত। ভদ্রমহিলা নিজে অনায়াসে পরীক্ষায় পাশ করছেন বলে মনে একটা আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি ভাবছেন, ভাইটিকেও পটাপট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে আনবেন। নিজের সুশৃঙ্খল জীবনের দৃষ্টি দিয়ে ভাইয়ের জীবনের বিশৃঙ্খলার গভীরতা তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। লেখাপড়ায় যে ধৈর্যের প্রয়োজন, বণ্টু সেই ধৈর্যের সাধনা করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভদ্রমহিলা যদি আরও পাঁচ সাত বছর আগে ওকে নিজের কাছে টেনে নিতেন, তাহলে ওর জীবন অন্যরকম হয়ে যেত। তবু বণ্টুকে নিরুৎসাহ করতে আমার মন চাইল না। দিদির এই অপ্রত্যাশিত ইচ্ছাটায় ও যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে ওর মনেও পড়াশোনা সম্পর্কে একটা নিবিড় আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। নইলে দিদির প্রস্তাবটা ও হেসেই উড়িয়ে দিত।

বললাম : দেখুন অমলবাবু, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। নেপোলিয়ানের অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দটার অস্তিত্ব ছিল না বলে শুনেছি। সঙ্কল্প যদি দৃঢ় হয়, তাহলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় পাশ করা হল সব চেয়ে সহজ কাজ। প্রতি বছর কত গবেট ডিগ্রি ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর সেই তুলনায় আপনি তো বেশ চালাক চতুর লোক। ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে আপনি নিশ্চয়ই পাশ করবেন।

বণ্টু চুপ করে রইল। আমার উৎসাহবাণী শুনেও পরীক্ষায় পাশ

করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত হতে পারেনি। তার আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি রবার্ট ব্রুসের দৃষ্টান্ত দিলাম।

: আপনি তাহলে বলছেন, আমি পড়াশোনায় লেগে যাব ?—বল্টুর মুখে একটা নার্ভাস হাসি ফুটে উঠল।

: অফকোর্স। নিশ্চয়ই। দিদি যখন বড়গলা করে কথাটা বলেছেন তখন একবার চেষ্টা করেই দেখুন না। লাভ ছাড়া লোকসান তো কিছু নেই।

বল্টু অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে শেষে বলল : অল রাইট, লেগেই দেখা যাক। যাই হোক মশাই, এসব কথা আপনি আর কাউকে বলবেন না। ব্যাপারটা আমি কলকাতায় একেবারে গোপন রাখতে চাই।

: নাঃ, আমি আর বলব কাকে।

: অনুরাধাকেও নয়।—বল্টু আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করল।

: সে কি ! তাদের কাছে গোপন করতে চাইছেন কেন ?—আমি বিস্ময় বোধ করলাম।

: না, কলকাতায় আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না।

: কিন্তু কোনদিন ঘটনাক্রমে যদি অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং সে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে ?

: পাটনায় যাওয়ার কথা ছাড়া আর কিছু বলবেন না।

: যাবার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন না ?

: হ্যাঁ, আজ বিকেলে একবার যাব।

: সেখানে তাঁদের কি বলবেন ?

: বলব কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ব্যাস, আর কিছু নয়। পড়াশুনোর কথা একদম চেপে যাব। না হলে ঠাট্টা মস্করা হবে। ঐ যে মেয়েটি দেখছেন, ওর বড় দেমাক। দুপাতা পড়ে ওর ধারণা হয়েছে, আমাকে ও পায়ের তলায় চেপে রাখতে পারে। কি করব, নিজেই নিজের সর্বনাশ করে রেখেছি, তাই সব সহ্য করে যাই। ওর দেমাক যে আমি ভাঙতে পারলাম না, সেইটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আফশোষ রয়ে গেল অশোকবাবু। যাক, যাবার সময় তা নিয়ে আমি আর মনে কোন কালি রাখতে চাই না। যা খুশি হোকগে। আমার সঙ্গে কতটুকুই বা সম্পর্ক।

: আপনি অকারণে সেন্টিমেন্টাল হচ্ছেন বন্টুবাবু।—আমি প্রতিবাদ করলাম : ভাই-বোনের—

: ও প্রসঙ্গ থাক।—বন্টু হেসে ফেলল : ও ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না তা সে আপনি যতই যুক্তি দেখান। সুতরাং মতের অমিল সম্বন্ধে আমাদের মতের মিল হওয়াই ভাল। আমার একান্ত অনুরোধ, এই চায়ের দোকানে বসে আপনার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হল, তা যেন তৃতীয় কানে না যায়।

: বেশ তাই হবে।—আমি রাজি হয়ে গেলাম। অনুরাধার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কিনা কে জানে। দেখা হলেও সে আমায় কাছে বন্টুর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবে—এমন ধারণাই বা করছি কেন? আর যদি জানতে চায়, তাহলে বলে দেব যে কিছু জানি না। তাতে আর আমার ক্ষতি কি? বন্টুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু তাতো অনুরাধা জানেই।

: কিন্তু বন্টুবাবু, আপনি কলকাতা থেকে চলে গেলে মিসেস সরকার বেশ একটু অসুবিধায় পড়বেন।

বন্টু ভ্রূ কুঁচকে বলল : কেন? তাদের আবার অসুবিধা কিসের?

: সংসারে তো পুরুষমানুষ নেই। তার উপর মিসেস সরকার অসুস্থ। আপনি তবু ছেলের মত দেখাশোনা করছিলেন।

: মিসেস সরকার অসুস্থ ঠিকই, তবে অক্ষম নন। তাঁর মত বুদ্ধি বিবেচনা এবং কর্মদক্ষতা খুব কম লোকেরই দেখেছি। মেয়েও বড় হয়েছে। আমাকে সে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। তা ছাড়া বাড়িতে ভাল বিশ্বাসী ঝি আছে। সুতরাং কলকাতা সহরে বাস করতে আর অসুবিধা কোথায়?

: তবু সংসারে পুরুষমানুষের প্রয়োজন। মেয়েরা কি সব কাজ করতে পারে।

: ওই বাড়ির তিনতলায় বর্মা ফেরৎ একটা গুজরাটি পরিবার আছেন। তাঁদের সঙ্গে মিসেস সরকারের রেঙ্গুনের পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ওঁদের দেখাশোনা করেন। ইদানিং সরকার বাড়ির সঙ্গে আমায় সম্পর্কটা খুবই শিথিল হয়ে আসছিল।

: কেন?

: কারণ বেশি ঘনিষ্ঠতার আর প্রয়োজন ছিলনা। আমি না থাকলে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না।

: এটা আপনার রাগের কথা।

: না। মিসেস সরকারের উপর আমার কোন রাগ নেই। তিনি অতি চমৎকার মানুষ। তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং চিরকাল শ্রদ্ধা করব। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনার সঙ্গেও তো ওঁদের আলাপ পরিচয় হয়েছে। মাঝে মাঝে এক আধবার গিয়ে না হয় খোঁজ খবর করে আসবেন। মিসেস সরকারকে আপনারও নিশ্চয় ভাল লাগবে।

: আপনার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন?—আমি হাসলাম।

: না না, তা নয়। ওঁদের সম্বন্ধে আমার যতটুকু দায়িত্ব ছিল, পালন করেছি। এখন আর কোন দায়িত্ব নেই। সম্পর্কটা নিতান্তই সামাজিক ভদ্রতার। সেই হিসাবেই কথাটা বললাম।

: না মশাই, সে আমি পারব না। খেয়ালী লোক। কোন দায়িত্বের মধ্যে যেতে সাহস হয় না। তা ছাড়া আমার অনেক কাজ। কারখানায় শীঘ্রিরই গোলমাল বাধবে।

: কিসের গোলমাল?

: মালিক শ্রমিকের চিরকেলে বিরোধ।

: কোন কারখানায় কাজ করেন?

: বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। এতকাল মালিক ছিল জোসেফ ম্যাকেঞ্জি, এখন মালিক হয়েছে ঘনশ্যাম জালান।

: ঘনশ্যাম জালান?—বল্টু ভ্রু কোঁচকালো: মুক্তারাম স্ট্রীটে বাড়ি?

: হ্যাঁ, আপনি চেনেন নাকি?

: চিনি বৈকি। শালা যে দিনে ডাকাতি করে। করালী বাঁড়ুজ্যে ওর মাইনে করা লোক। প্রত্যেক মাসে টাকা খায়।

: কেন?

: কারণ ওর সমস্ত ব্যবসাই চোরাকারবার। তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশে একটা করে লোক মরেছে আর ঘনশ্যামের ঘরে এক লাখ করে টাকা জমেছে। তখন ছিল সুরাবর্দীর সঙ্গে বখরা, এখন করালীবাবু এবং তাঁর দলের সঙ্গে।

: বলেন কি মশাই!

: আর বলেন কি।—বল্টু হাসল : ছেচল্লিশের দাঙ্গায় যে সোনাদানা হীরে জহরত লুট হয়েছিল সেটা কোথায় গেল বলতে পারেন ?

: কোথায় ?

: ঘনশ্যামের সিন্দুকে।

: কি করে গেল ?

: গুণ্ডাদের কাছ থেকে থোকে থোকে কিনে নিয়েছে। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা নগদ টাকায় তখন ওর হাত গিজগিজ করছে। সোনারূপো এবং দামী পাথর পেলেই কিনে নিত।

: পুলিশ জানে না ?

বল্টু বলল : পুলিশের ওপর আপনার দেখছি অগাধ ভক্তি। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় যদি পুলিশ অফিসারদের বাড়ি সার্চ করেন তাহলে কি পাবেন জানেন ?

: কি পাব ?

: যা পাবার নয় তাই। পুলিশের বিরুদ্ধে আর কিছু বলতে চাই না। কারণ এতকাল তাদের সঙ্গে আমার সদ্ভাবই ছিল এবং আমার সঙ্গে পুলিশের সদ্ভাব থাকার মানেটা বুঝতেই পারছেন। থাকগে, যা বলছিলাম, আপনারা খুব খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছেন।

: সেটা আমরাও বুঝতে পারছি। চোরাকারবার করা আর কারখানা চালানো এক জিনিস নয়। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আরও কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বিদায় নেবার সময় আমি বললাম : বল্টুবাবু, একটা কথার জবাব দেবেন ? পৃথিবীতে এতলোক থাকতে আপনি আপনার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন ? আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ তো নয়।

: তা নয় বটে, তবে সকলের সঙ্গে তো সব রকমের আলোচনা করা যায় না। আমার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা, তারা এসব কথা শুনলে হয় হাসবে, না হয় অবিশ্বাস করবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লেগেছিল। আপনি উদারিক মন। আমাকে ঘৃণা করেন না। তাই চলে এলাম। বহুদিন বহুলোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কে কি রকম লোক তা অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝে ফেলতে পারি।

এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে আমি বললাম : তাহলে আপনি দু একদিনের মধ্যেই পাটনায় চলে যাচ্ছেন।

: দু একদিনের মধ্যে নয়। আজ রাত্রেই। এসেছিলাম আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার একটা দলিল সই করতে। কলকাতা আর আমার ভাল লাগছে না। বালিতে মামার বাড়িতে এসে উঠেছি। পাড়ায় ঢুকিনি আর ঢুকবোও না। কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই। কলকাতা ছাড়তে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আচ্ছা, এবার ওঠা যাক, আমার আবার এটর্নীর বাড়িতে যেতে হবে।

: হ্যাঁ, ওঠা যাক। কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। নমস্কার।

: নমস্কার। Good Luck.

বণ্টুকে ট্রামে তুলে দিয়ে মেসে ফিরে এলাম। তার জীবনে যে নতুন উপলব্ধির ঢেউ লেগেছে, তার দোলায় আমার মনটাও যেন দুলে উঠেছে। এতকালের একটা পাকা ক্রিমিনাল প্রায় রাতারাতি পাল্টে গেল—এ যেন অলৌকিক ঘটনা। বিশ্বাস করতেই কেমন কেমন লাগে। অথচ অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। সমস্ত ব্যাপারটা সারাদিন আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। ওর জীবনে এতবড় একটা মানসিক বিপ্লব কেমন করে সম্ভব হল? যে মানুষ জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হতেও পিছপা হয়নি, সেই মানুষ বউদির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাকে জীবনের এতবড ক্ষতি বলে গ্রহণ করল কেন? অনেক ভাবতে ভাবতে শেষে মনে হল, অপরাধ প্রবণতা বণ্টুব বংশগতি নয়। তার বাপ ঠাকুর্দা স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে সে ওসব জিনিস পায়নি। আসলে সে নষ্ট হয়েছে সঙ্গদোষে। বয়ঃসন্ধির সময় যখন মানুষের চরিত্রের বনিয়াদ গড়ে ওঠে, তখন তার রাশ আলগা ছিল। ফলে তার মনে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কোন ভাল আদর্শ সামনে রেখে সে এগোতে পারিনি। যা কিছু আপাত-উত্তেজক, তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে। মাতব্বরী, গুণ্ডামী, নেশা, জুয়া—ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর রোমাঞ্চ এবং শিহরণ আছে। তার উপর কবালীবাবুদের মত রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ওদের বুঝিয়েছিলেন যে, অপর সম্প্রদায়ের লোকের উপর হামলা করা একটা "মহৎ সামাজিক কর্তব্য"।

তাতে অপরাধ একটা নতুন মাহাত্ম্য লাভ করে। এমনি ঘটনা পরম্পরায় বল্টু ক্রমে ক্রমে ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে। করালীবাবুরা সেখানেই ওদের ছেড়ে দেননি। দাঙ্গার পর দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য ওদের প্রাইভেট আর্মির মত ব্যবহার করেছেন। তাঁদের রাজনৈতিক দাবা খেলায় ওরা ছিল বোড়ের চাল। নির্বোধ বলে অতি সহজেই ওরা তাঁদের চক্রান্ত জালে জড়িয়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত ওদের মাথায় পা দিয়ে করালীবাবুরা সমাজের শীর্ষে গিয়ে স্থান লাভ করেছেন। গুণ্ডা দস্যু ডাকাতদের সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিহাসে পড়েছি হিটলার, মুসোলিনী এবং ফ্রাঙ্কো এই পন্থায় যথাক্রমে জার্মানী, ইটালী এবং স্পেনের কর্তা হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও যে ছোট আকারে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেইটাই শুধু জানতাম না। বল্টু আমার চোখের সামনে সমাজের একটা বিশেষ ছবির আবরণ উন্মোচন করে গেছে। হিটলার মুসোলিনীর ক্ষমতালাভের কাহিনী যখন পড়েছি, তখন ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর লাগত। ভাবতাম দেশের অধিকাংশ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকটা লোক স্রেফ গুণ্ডামী করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতায় কিভাবে? নিজের দেশের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, সেটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। মানুষ মাত্রই নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয়। তারা কোন গোলমাল ঝঞ্চাটের মধ্যে সাধারণত যেতে চায় না। সুতরাং সুসংগঠিত গুণ্ডার দল দিয়ে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা মোটেই কঠিন কাজ নয়। 'বল্টুর দল' সম্বন্ধে কলকাতার লোকেরা মনে যে আতঙ্ক আছে, সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং এই বল্টুর দলকে পেছনে রেখে যে কোন চতুর ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক নেতাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করে নিতে পারেন। আর কিছু না হোক নিজের প্রতিপক্ষ অথবা বিরোধী দলকে জব্দ করতে পারেন অনায়াসেই। মন্ত্রী, চোরাকারবারী, পুলিস এবং গুণ্ডার মধ্যে যে অখণ্ড যোগসূত্র রয়েছে, সেটা দেখতে পেয়ে মনটা কেমন দমে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বল্টুর পরিবর্তন মানুষের সৎবুদ্ধির অমরতা সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাসকেও দৃঢ়তর করল। এতদিন বাদে বল্টু মনুষ্যত্বের আয়নায় নিজের প্রকৃত চেহারাটা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এবার ওর জেলে যাওয়া সত্যিই সার্থক। পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে কিনা জানিনা। না পারার কোন হেতু নেই। আর পাশ না করলেও কোন লোকসান হবে না।

পড়াশোনার মধ্য দিয়ে মন এবং বুদ্ধিবৃত্তির যে চর্চা হবে তাতে ওর জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। নতুন জীবনে ওর হারাবার কিছুই নেই। সবটুকুই লাভ।

মিসেস সরকার বলেছিলেন, বল্টুর মধ্যে একটা মৌলিক মহত্ব লুকিয়ে আছে। এই ধারনাটা একেবারে অমূলক বলে মনে হয়না। যারা দুঃসাহসী, বেপরোয়া এবং কাজের লোক, তাদের মধ্যে যে একটা শক্তি আছে, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রত্যেক শক্তিই একদিকে সৃজনশীল, অন্যদিকে বিনাশক। আণবিক শক্তি দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে লোপাট করে দেওয়া যায়, আবার সেই শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে ফল ফুল রূপ রস গন্ধে ভরিয়েও তোলা যায়। শক্তিটা কি ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেইটাই আসল কথা। বল্টু যদি তার শক্তিটাকে বিনাশের কাজে না লাগিয়ে সৃজনের কাজে লাগায় তাহলে সমাজ তার কাছ থেকে অনেক উপকার পেতে পারে।

বল্টুর সম্বন্ধে মনটা আমার খুব সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। আমি তাকে কখনও কড়া কথা বলিনি। কিন্তু আমার সামনেই অনুরাধা একদিন তার আত্মাভিমানে আঘাত দিয়ে অবজ্ঞার সুরে অনেক কটুকথা বলেছিল। তখন বল্টু আমার কাছে নিছক গুণ্ডা। তাই তার লাঞ্ছনা মনে মনে উপভোগ করেছিলাম। কোন যুবকের পক্ষে ক্রমাগত কোন যুবতীর ঘৃণা অথবা অবজ্ঞার ভার বহন করা যে কত কঠিন তা আজ বুঝতে পারছি। তবে বল্টুর রূপান্তরে অনুরাধার একটা নেতিমূলক ভূমিকাও আছে। তার ছোট বউদির মৌন এবং অনুরাধার মুখরতা—দুটোই বল্টুর মধ্যে আত্মগ্লানির সৃষ্টি করছিল। একজন কাছে আসতে গিয়ে দূরে সরে গেছে, আর একজন কাছে থেকে ক্রমাগত ঘা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বল্টুর সঙ্গে দুজনের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও ফলটা দাঁড়িয়েছে এক। উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তাতে জল চাপিয়ে দিলে জলটা ফুটতে ফুটতে বাষ্প হয়ে এক সময় উবে যায়। তখন আর জলের কোন অস্তিত্ব থাকেনা। না না দিক থেকে ঘা খেতে খেতে বল্টুর মনের মধ্যেও জলের স্ফুটন চলছিল। বাইরে থেকে সেটা টের পাওয়া যায়নি। এবার জেলখানায় গিয়ে সে একেবারেই বদলে গেছে।

বল্টুর সম্বন্ধে আমার মনে একটা অসাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি হল। লোকটা যেখানেই থাকুক ওর উপর আমার নজর রাখতে হবে। শেষপর্যন্ত জীবনের কোন পথে গিয়ে দাঁড়ায় সেটা জানা দরকার।

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে পারিবারিক প্রয়োজনে অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে আমাকে বেনারসে যেতে হয়েছিল। যখন ফিরে এলাম তখন বল্টু আমার চেতনার দ্বিতীয় স্তরে চলে গেছে। মাঝে মাঝে তার কথা মনে হয়, তবে সে আর আমার নিয়মিত চিন্তার বিষয় নয়। মিসেস সরকারদের বাসায় আমি আর যাইনি অথবা অনুরাধার সঙ্গেও আমার আর দেখা হয়নি।

ঐ সময় আমাদের কারখানায় বেশ গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। কাজেই মনটা সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে ইঞ্জিনিয়ার টেকনিসিয়ান ওয়ার্কম্যান কেরানী বেয়ারা নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় হাজার দুই। তাদের সমবেত পরিশ্রমে কারখানায় মাসে প্রায় এক কোটি টাকার মালপত্র উৎপন্ন হয়। আর সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে মাসে তারা মাইনে পায় তিন লক্ষ টাকার মত। ঘনশ্যামবাবু চোরাকারবারের রাজা। শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। এতকাল যে সব 'ব্যবসা' করে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন, তাতে বেশি কর্মচারীর প্রয়োজন হয় না। দুই একজন বিশ্বস্ত অনুচর আর কিছু দালাল দিয়েই কাজ চলে। কোম্পানীটা কেনার সময় সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন, দশ বিশটা চোরা গুদোম রাখা আর একটা কারখানা চালানো একই রকমের ব্যাপার। হয়ত তাঁর ধারণা ছিল, কারখানাটা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় একটা যন্ত্র। একদিক দিয়ে তিনি মূলধন ঢালবেন আর অন্যদিক দিয়ে যন্ত্রপাতি বেরুতে থাকবে আর সেগুলো বাজারে বেচে টাকাগুলো সিন্দুকে নিয়ে তুলবেন! কারখানা চালাতে এসে কর্মচারীর সংখ্যা এবং মাসিক বেতনের বিল দেখে বোধ হয় খুশি হতে পারেন নি। তিনি চান যে তাঁর জমাখরচের খাতায় জমার ঘরটা ক্রমাগত ভরে উঠুক কিন্তু খরচের ঘরে যেন আঁচড়ও না পড়ে। শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য খরচের ঘরে মাস মাস তিন লক্ষাধিক টাকার অঙ্ক বসছে দেখে তাদের উপর তাঁর জাতক্রোধ দেখা গেল। সবাইয়ের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন, কারখানায় অনেক ফালতু লোক আছে। তারা সব ফাঁকি দিয়ে তাঁর টাকা মারছে। অবিলম্বে কোম্পানীর খরচ কমাবার জন্য কিছু লোক কমিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু লোক ছাটাই করার পথে একটা বাধা ছিল। জোসেফ ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে কোম্পানী কেনার সময় তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে মালিকানা হস্তান্তর হলেও কর্মচারীদের চাকরীর ধারাবাহিকতা এবং বেতনের হার অটুট থাকবে। আর গুরুতর অপরাধ (গ্রস মিস কনডাক্ট)

না করলে এক বছরের মধ্যে কাউকে ছাঁটাই করা চলবে না। সুতরাং জালান সাহেব হাতে না মেরে ভাতে মারার পন্থায় মনোযোগ দিলেন। ব্যয় হ্রাসের অজুহাতে নানারকম জুলুমবাজী সুরু হল। 'ফ্যাক্টরী মাষ্টার' নাম দিয়ে তিনি এক নতুন পদ সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর শ্যালক ঢনঢনিয়া এসে বসল সেই পদে। লোকটা লেখাপড়া কিছু জানে না। এতকাল দেশে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে দিন কাটছিল। অশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তার একটা উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কর্মকর্তা হয়ে বসলে কারখানার অবস্থা কি হয়ে দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। ব্যাপার দেখে কোম্পানীর ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিসিয়ানরা পদত্যাগ করে অন্য কোম্পানীতে চলে গেলেন। জালান সাহেব সেই সব শূন্য পদে আর নতুন লোক নিলেন না। তাঁদের জায়গায় বসানো হল ঢনঢনিয়ার পেটোয়া কয়েকজন অকেজো লোককে আর ঢনঢনিয়া হয়ে বসল জেনারেল ম্যানেজার। বেশ বোঝা গেল, বাজারে আমাদের কারখানার মালপত্রের যে সুনাম ছিল তা এবার নষ্ট হবে। যে লোকগুলোকে মাথায় বসানো হয়েছে তারা অপরের নির্দেশে কাজ করতে পারে। নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করতে পারে না। সে রকম মৌলিকতা কিছু নেই। থাকলে অনেকদিন আগেই মাথায় গিয়ে বসতে পারত। নতুন ধরনের কোন কাজ পেলে তারা একেবারেই ল্যাজে গোবরে হয়ে যাবে।

কারখানার ভিতর শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য একটা ভাল ক্যান্টিন ছিল। যুদ্ধের সময় থেকে সেই ক্যান্টিনের চালের অর্ধেক খরচ বহন করতেন কোম্পানী কর্তৃপক্ষ। ফলে শ্রমিক কর্মচারীরা নামমাত্র খরচে সেখানে মিল খেতে পেতেন। জালান সাহেব হঠাৎ নোটিশ দিলেন যে কোম্পানী আর ক্যান্টিনের চালের খরচ দেবে না। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও নোটিশটা রদ হল না।

কিছুদিন বাদে ঢালাই ঘরে ঢনঢনিয়া সাহেব একজন কামারকে মা বোন তুলে গাল দিলেন। লেদ ডিপার্টমেন্টের একটা পুরোনো মেসিন ভেঙ্গে পড়ায় সেখানকার তিনজন পুরোনো শ্রমিককে মোটা টাকা ফাইন করা হল, স্টোরের তেরোজন কর্মচারীর উপর জারী হল চার্জশীট। সব মিলে কারখানা একেবারে গরম। বেশ বোঝা গেল, জালান-ঢনঢনিয়া প্ল্যান করে শ্রমিকদের পেছনে লেগেছেন। কাউকে স্বস্তিতে কাজ করতে দেবেন না। তাঁরা হয়ত ভেবেছেন, সরাসরি ছাঁটাই করতে যখন বাধা আছে, তখন খুঁচিয়ে

খুঁচিয়ে একদল লোককে কারখানা ছাড়া করাই ভাল। কিন্তু দেশে বেকার সমস্যা প্রবল। একটা চাকরী ছেড়ে আর একটা চাকরী জুটিয়ে নেওয়া খুব সহজ নয়। তাই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সত্ত্বেও দুই একজনের বেশি কেউ চাকরী ছাড়লনা।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কারখানায় লোক ছাঁটাইয়ের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় নি। কোম্পানীর হাতে প্রচুর কাজ। জোসেফ ম্যাকেঞ্জির নিয়মে কাজ করলে বরং আরও কিছু নূতন লোক নেবার প্রয়োজন হয়। আমরা সকলেই আগের চেয়ে অনেক বেশি করে খাটছি। তাতে জালান সাহেবের মুনাফার আকারটা বেশ স্ফীত হচ্ছে কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। কালো-বাজারে এক টাকায় একশ টাকা লাভ করা মন তাঁর শিল্প উৎপাদনেও সেই হারে মুনাফা চায়। তাই তিনি অল্প লোক দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে মুনাফার দিকটা চোরাবাজারের হারে তোলবার চেষ্টা করছেন।

এই সমস্ত ঘটনায় একদিকে শ্রমিকরা যেমন ভীত হয়ে পড়ছিলেন, অন্য দিকে তাদের ক্রোধও বেড়ে উঠছিল। কারখানায় বহুকাল ধরে একটা রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন আছে কিন্তু নানা কারণে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ঢালাই ঘরের কিছু লোক সেই ইউনিয়নটাকে ভালভাবে চালু করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং মাস কয়েকের মধ্যে কারখানার প্রায় অর্ধেক শ্রমিক কর্মচারী সেই ইউনিয়নের সদস্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঢনঢনিয়া এবং জালান সাহেবের কানেও পৌছোলো। গুজব রটল ঢনঢনিয়া একটা বিরাট ছাঁটাই লিস্ট তৈরি করছেন। যারা যারা ইউনিয়নের নেতা, তাদের আর চাকরী থাকবে না। মাস খানেক বাদে সত্যিই একটা ছাঁটাই লিস্ট বেরুলো। তবে তাতে ইউনিয়নের কোন নেতার নাম নেই, নাম আছে ঢালাইঘরের তেরো জন হেল্পারের। সকাল বেলায় ছাঁটাই নোটিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের ইঙ্গিতে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং ঢনঢনিয়া আফিসে আসতেই কারখানার শ্রমিকরা মারমুখী হয়ে তাকে ঘেরাও করে ফেলল। ভয়ে ঢনঢনিয়ার নাড়ী শুকিয়ে গেল। তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। এতকাল সকলের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন, এবার নিজের মাথার উপর এত মানুষের ছড়ি ঘুরছে দেখে ভদ্রলোক কোলাপ্স করলেন। টেলিফোন পেয়ে জালান সাহেবও এসে গেলেন এবং শ্রমিকদের ভাবগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ ছাঁটাই নোটিশটা প্রত্যাহার করলেন।

এই ঘটনার পর ইউনিয়ন বেশ জোরদার হয়ে উঠল। কেরানীবাবু এবং টেকনিসিয়ানরা এতদিন পর্যন্ত ইউনিয়নের বাইরে ছিলেন। এবার তাঁরাও এর মধ্যে ঢুকলেন। ইউনিয়নের বার্ষিক নির্বাচনে সেক্রেটারী হলেন ঢালাই ঘরের সিরাজুদ্দীন এবং আমি হলাম একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট। আগে সমস্ত রকম আন্দোলনকেই মোটামুটি এড়িয়ে চলতাম। ভাবতাম, আমি একজন লেখক। লিখে পেট চলেনা বলে চাকরী করছি। লেখক হিসাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় নিরপেক্ষ রাখতে হবে। সুতরাং আমি যদি কোন রাজনৈতিক সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই তাহলে আমার দৃষ্টি একপেশে হয়ে যাবে। আমি আর নিরপেক্ষ থাকতে পারব না। কিন্তু এখন দেখছি "লেখকের নিরপেক্ষতা" অনেকটা আজগুবী কল্পনার মত। লেখক যখন মানুষ তখন সে স্বভাবতই সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যে আছে শ্রেণীবিন্যাস। লেখক যে শ্রেণীতে জন্মেছে এবং যে শ্রেণীর মধ্যে মানুষ হয়েছে, সেই শ্রেণীর ধ্যানধারণাই তার নিজস্ব ধ্যানধারণা হয়ে উঠেছে। তার নিরপেক্ষতাও সেই ধ্যানধারণার অতীত নয়। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতার অর্থ পরোক্ষভাবে মালিককে সাহায্য করা। মালিকরা শ্রমিকের শ্রম-শক্তি শোষণ করে নিজেদের ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াচ্ছে। তাই তাদের সব সময়ের লক্ষ্য হল, কি করে শ্রমিককে আরও ভাল ভাবে শোষণ করা যায়। আর শ্রমিকের লক্ষ্য হচ্ছে কি করে সে মালিকের কাছ থেকে তার শ্রমশক্তির ন্যায্য মজুরী আদায় করে নিতে পারে। ছোট বড়র এই অসমান বিরোধে যে নিরপেক্ষ সে আসলে মালিকেরই দালাল। আমি নিজে যখন শ্রমজীবি তখন নিজের শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মালিকের দালালী করব কোন লজ্জায়? এই সত্য উপলব্ধির পর আমি ইউনিয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে থাকি এবং সিরাজুদ্দীন সাহেবের অনুরোধে ড্রাফট্সম্যানদের প্রতিনিধি হিসাবে ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করি। কারখানার ছুটির পর আমাকে রোজই একবার করে ইউনিয়ন আপিসে গিয়ে বসতে হয়। তাই মেসে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আড্ডা ইয়ারকিও প্রায় বন্ধ। লেখার কাজও অতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু তাতে আমি মোটেই অসুখী নই। আন্দোলনের উত্তেজনায় মাসগুলো কোথা দিয়ে কেমনভাবে যে কেটে যাচ্ছে তা টেরই পাচ্ছিনা।

ডিসেম্বর মাসের এক রবিবার সকালে আমি সবে মেস থেকে বেরুবো বেরুবো করছি—এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিরঞ্জন সেন এসে হাজির। প্রায় বছরখানেক আগে আমাকে "সুন্দরী পত্নীর" গান শোনাবার লোভ দেখিয়ে সেই যে ভদ্রলোক মেস ছেড়ে বাসায় উঠে গেলেন, তারপর আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারাটা আরও চকচকে হয়েছে আর শরীরে মাংসও বেড়েছে বেশ। নমস্কার বিনিময়ের পর আমার খাটের কোনায় এসে বসলেন।

: কি ব্যাপার নিরঞ্জনবাবু, এতদিন কোথায় ছিলেন?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

: আছি কলকাতাতেই।—নিরঞ্জনবাবু হাসিমুখে জবাব দিলেন।

: কি আশ্চর্য! কলকাতাতেই আছেন অথচ আজ এক বছরের মধ্যে আমাদের কথা আপনার মনে পড়েনি!

: আর মশাই, বউও এসে পৌঁছোলো আর কোম্পানীও যেন ফিঙে হয়ে লাগল আমার পেছনে। মফঃস্বলে টুর করিয়ে করিয়ে করিয়ে জান খতম করে দিচ্ছে। কলকাতায় যে দুদিন সুস্থির হয়ে বসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করব তার কি উপায় আছে! তা, আপনার শরীর-টরীর ভাল?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, একরকম কেটে যাচ্ছে। আপনারা সব ভাল?

: চলছে।

: মিসেস সেনকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়েছেন?

: হ্যাঁ। না দিলে কি রক্ষে ছিল। বিয়ে তো করেননি। মেয়েছেলের জেদ কি জিনিস তা জানেন না। ভর্তি করতে দুদিন দেরি হয়েছিল বলে কেঁদে কেটে আবহাওয়া গরম করে তুলেছিল।

আমি হেসে ফেললাম: যাক ভালই হয়েছে।

: আপনি কোন নতুন বইটই লিখলেন নাকি?

: না, কিছু লেখা হয়নি।

: সে আমি জানি। হরিপদবাবুর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছে শুনলাম মেসে আপনি খুব অসুবিধায় আছেন। অবশেষে আপনার জন্য একটা ভাল বাসা যোগাড় করেছি।

: তাই নাকি ?

: হ্যাঁ। হরিপদবাবুর কাছ থেকে আপনার কথা শুনে অবধি আপনার উপযুক্ত একটা ঘরের সন্ধান করছিলাম। কপালগুণে একটা ভাল অফার পেয়ে গেলাম।

: কি রকম ?

: আমার এক মারাঠী বন্ধু আছে। নাম মধু ফাড়কে। একটা বিলিতী ওষুধ কোম্পানীর কলকাতার প্রতিনিধি। কাপালীটোলায় একটা ছোট দু'কামরার ফ্ল্যাটে বাস করে। সম্প্রতি সে ডিপো ম্যানেজারের পদে প্রোমোশান পেয়ে পাটনায় চলে যাবার অর্ডার পেয়েছে। সেই ফ্ল্যাটটায় আপনি যেতে পারেন।

: ভাড়া কত ?

: পঁয়তাল্লিশ। পুরোনো ভাড়া চলছে।

: কিন্তু ফাড়কে সাহেব বাড়ি ছাড়লেই তার ভাড়া বেড়ে যাবে।

: ফাড়কে বাড়ি ছাড়বে না। বাড়িটা তার নামেই থাকবে। সে ওটা একেবারে হাতছাড়া করতে চায়না।

: তাহলে কি রকম হবে ?—আমি ঘাবড়ে গেলাম।

: ফাড়কে আবার ঘুরে ফিরে কলকাতায় পোস্ট হতে চায়। কিন্তু ডিপো ম্যানেজার হয়ে কলকাতায় আসতে হলে যে গ্রেডে উঠতে হয়, সেই গ্রেডে উঠতে কম করে ওর তিনটি বছর লাগবে। আপনি এই তিন বছর ওর ফ্ল্যাটটা এনজয় করুন।

: কিন্তু তিনি যদি দু-তিনমাস বাদেই আবার ফিরে আসেন ?

: না সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। নিতান্তই যদি আসে, তাতেও আপনার ক্ষতি হবে না। বাড়িতে দু'খানা ঘর রয়েছে। আপনি অন্যত্র উঠে যাবার সময় পাবেন।

: ফাড়কে ব্যাচিলার বুঝি ?

: হ্যাঁ, তবে আর বেশি দিন নয়। ধর্মের ষাঁড়কে এবার গোয়ালে ঢুকতে হবে। বেশ মেজাজী লোক। কলকাতার উপর বড্ড মায়া। আগে তো ভেবেছিল বাড়িটায় তালা লাগিয়ে তিন বছর ভাড়া টেনে যাবে। আবার যখন কলকাতায় ফিরে আসবে তখন এত সস্তায় এত ভাল বাড়ি তো আর পাবেনা।

: তা ঠিক। বাড়ির কাছাকাছি হোটেল টোটেল আছে তো ?

: হ্যাঁ, বাড়ির নীচেই পাঞ্জাবী হোটেল। ফাড়কে সেখানেই খায়।

: ভাট্‌স্‌ নাইস। তাহলে আমার ব্যবস্থা করে দিন। আপাতত তিন বছরের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যাক।

নিরঞ্জনবাবু বললেন : চলুন, এক্ষুণি ফিক্স করিয়ে দিচ্ছি। তার সঙ্গে আমার সকালে দেখা করার কথা আছে।

আমি বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে নিরঞ্জনবাবু মিহি গলায় বললেন : আরও একটা কথা আছে। আজ রাত্রে আপনি আমাদের বাসায় খাবেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : কেন ? ব্যাপার কি ?

: ব্যাপার আর কি, এমনিই। ওয়াইফের কাছে আপনার গল্প করেছি তো। প্রায়ই আপনাকে নেমন্তন্ন করতে বলে। এতদিন সময় করে উঠতে পারছিলাম না।

: আপনার বাসায় যাব, তার আবার নিমন্ত্রণ কি। তবে ভাত খাবার ব্যবস্থা না করে চায়ের ব্যবস্থা করলে হতনা ?

: কেন বলুন তো ?

: রান্নাবান্নার ব্যাপার থাকলে মিসেস সেন সারাক্ষণ সেখানেই আটক থাকবেন। তাঁর সঙ্গে ভাল করে গল্পও করা চলবে না আর তাঁর গানও শোনা যাবেনা।

: না না, রাঁধবার আলাদা লোক আছে। মিসেস সেনের হাতে রান্নাঘরের ভার থাকলে এতদিনে আমাকে বাসা ছেড়ে আবার মেসে ফিরে আসতে হত। গোটা কতক ডিগ্রিই নিতে পারবে। সংসারের কাজে কর্মে একেবারে গুড ফর নাথিং।

: আপনি এখনই অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। বয়স বাড়লে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

নিরঞ্জনবাবু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন : যার হবার, তার অল্প বয়সেই হয়। যার হবার নয়, তার সারা জীবনেও হয় না। যাকগে, আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসছেন।

: হ্যাঁ যাব। মিসেস সেনের গান শুনব বলে এক বছর ধরে অপেক্ষা করে

আছি। এ সুযোগ কি ছাড়তে পারি! উপরি পাওনা হিসাবে ভালমন্দ খাওয়াটা তো রয়েছেই।

ফাড়কে সাহেব সৌখীন এবং দিলদরিয়া মানুষ। বয়স বছর ত্রিশেক হবে। ঘরের আসলাবপত্র সাজসজ্জা দেখে বোঝা গেল, পয়সা কড়িও রোজগার করেন। ক'বছর কলকাতায় থেকে বাঙলাও শিখে নিয়েছেন। সহরটার উপর সত্যিই তাঁর খুব মায়া। এক লাফে তিনশ' টাকা মাইনে বাড়ছে বলে ভদ্রলোক পাটনায় না গিয়ে পারছেন না। তিন বছর বাদে কলকাতায় ফিরে আসতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

আমাকে 'লেখক' জেনে ফাড়কে খুব আপ্যায়িত করে বললেন: আমার আসবাবপত্র সব এখানে থাকবে। আপনি নিজের মত করে ব্যবহার করবেন। তবে দাদা, মাঝে মাঝে যদি কলকাতায় বেড়াতে আসি তাহলে দয়া করে একটু থাকবার জায়গা দেবেন। শুধু এই দাবিটুকু রইল।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার বাড়িতে আপনি থাকবেন, তাতে আর আমার দয়া করার কি আছে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় বাড়িওয়ালার দিক থেকে কোন আপত্তি—

: না, সে ভয় নেই। বাড়িওয়ালা থাকে শ্যামবাজার। সে এখানে আসে না। তার দারওয়ানই ভাড়া টাড়া আদায় করে। আমার কাছ থেকে প্রচুর বকশিশ পায়। যাবার আগে তার সঙ্গে আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব। বরং সে আপনাকে হেল্প করবে।

কথাবার্তা পাকা করে যখন আমরা বাইরে বেরুলাম তখন শীতের সূর্য মাথায় উঠেছে। নিরঞ্জনবাবু আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউ মার্কেটে চলে গেলেন। আমি বাসে চেপে মেসে ফিরলাম।

অনেক সময় অনেক আকস্মিক ঘটনা বড় বিস্ময়কর লাগে। নিরঞ্জনবাবুর পরিত্যক্ত সীটেই বর্তমানে আমি বাস করছি। কদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিছুটা সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এতদিনের অদর্শনে তাঁকে আমি ভুলতেই বসেছিলাম। আজ সকালে হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হয়ে অযাচিতভাবে আমার উপকার করে গেলেন। পৃথিবীতে মানুষের গতিবিধি সত্যিই বড় বিচিত্র।

দুপুরে একটা ঘুম লাগিয়ে সন্ধ্যায় নিরঞ্জনবাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। দেশবন্ধু পার্কের পূব দিকে একটা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি। ধবধবে দেওয়াল চকচকে মেঝে ফ্লোরোসেন্টের আলোয় ঝকমক করছে। বসবার ঘরে ছোট নীচু একখানা তক্তাপোষের উপর পাতলা একটি গদ্দি দিয়ে শান্তিনিকেতনের নক্সা কাটা একটা গেরুয়া রঙের চাদর বিছানো রয়েছে। তারই মধ্যিখানে একটা পিতলের রেকাবের উপর ধুপদানীতে ধুপকাঠি পুড়ছে। ঘরখানা তারই গন্ধে ভরপুর। বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে খান চারেক বেতের চেয়ার আর একটা টিপয়। উত্তরের দেওয়ালে শাদা ধাতুর ফ্রেমে আঁটা একখানা ফোটোগ্রাফ। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, 'অসুখের পর তোলা' বলে নিরঞ্জনবাবু মেসে আমায় তাঁর স্ত্রীর যে ফোটোগ্রাফ দেখিয়েছিলেন, ওটা তারই বৃহত্তর সংস্করণ।

ঘরে দামী আসবাব কিছু নেই কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে বেশ একটা শ্রী আছে।

আমি চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম। নিরঞ্জনবাবু অন্য একটা চেয়ার টেনে বসলেন আমার সামনে।

মিনিট পনেরো বাদে বাতাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে যে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, তিনিই যে গৃহকর্ত্রী, তাতে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

ঃ এই যে অশোকবাবু, আমার ওয়াইফ ললিতা। আর ইনি হলেন, মানে চিনতেই পারছ, স্বনামধন্য—

ঃ থাক থাক, no adjectives please. —আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করলাম ঃ নমস্কার।

মিসেস সেন হাতজোড় করে কপালে স্পর্শ করলেন। তাঁর আঙটির লাল পাথরটা বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠল। আমি নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম ঃ বসুন।

ঃ না না, ওকি আপনি বসুন।—মিসেস সেন চেয়ারটা আবার যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে অন্য একটা চেয়ার টেনে আলগোছে বসে পড়লেন।

বছরখানেক আগে ভদ্রমহিলার ফোটোগ্রাফ দেখেই মনে হয়েছিল, উনি রূপসী। চোখের সামনে জীবন্ত মানুষটাকে দেখে সেই ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হল। আমার দৃষ্টি একাগ্রভাবে তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে গেল। চেহারাটা একটু মোটার দিকে কিন্তু তাতে ওঁকে মোটেই বে-মানান দেখাচ্ছে

না। সাজ-পোশাকের চাকচিক্য, অঙ্গরাগের সুদূরদর্শী ব্যবহার এবং অলঙ্কারের বৈচিত্র্য ফ্লোরোসেন্ট আলোয় ওঁর বাহ্যাবরণ রূপকথার নায়িকার মত মোহ সৃষ্টি করেছে। আমি বেশ কয়েক মিনিট বিমুগ্ধ হয়ে রইলাম এবং সম্ভবত নিজের অগোচরে নিরঞ্জনবাবুর সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষাও বোধ করছিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারে সুন্দরী মহিলার অভাব নেই কিন্তু 'গ্ল্যামার' অন্য জিনিস। মিসেস সেন সেই গ্ল্যামারের অধিকারী এবং নিরঞ্জনবাবুর আর্থিক স্বচ্ছলতাবশত সেটা ভালভাবে চর্চা করার অবকাশও উনি পেয়েছেন।

: অনেকদিন আগেই আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হবার কথা কিন্তু আপনি কলকাতায় আসার পর নিরঞ্জনবাবু আমাদের একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন বলে সেটা সম্ভব হয়নি। এখন দেখছি, নিরঞ্জনবাবুরও দোষ নেই। যেখানে শাস্ত্র বলছে, মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, সেখানে মানুষের তো হতেই পারে।

কথার ইঙ্গিতটা না বুঝতে পেরে মিসেস সেন সলজ্জ চোখে জিজ্ঞাসুভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। নিরঞ্জনবাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন : কি রকম ?

বললাম : বিশ্বামিত্রের মত জবরদস্ত মুনির তপস্যাভঙ্গ—

: খুব ল্যাঙ দিচ্ছেন।—নিরঞ্জনবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন এবং তাঁর স্ত্রী মুখে হাসির রেখা টেনে চোখ নামিয়ে নিলেন।

ক্রমে ক্রমে গল্প গুজব জমে উঠল। মিসেস সেনের আলাপ ব্যবহার অত্যন্ত শিষ্টাচার পূর্ণ। ভদ্রমহিলা আর্টটাকে বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন। নিরঞ্জনবাবু আমার কাছে স্ত্রীকে যে রকম অবুঝ এবং ভাবপ্রবণ মেয়ে বলে চিত্রিত করেছিলেন আসলে তিনি মোটেই সেরকম নন। আমার সঙ্গে তিনি বেশ ধীর স্থিরভাবে বুদ্ধি বিবেচনা রেখে কথা বলছিলেন। গান, বাজনা, সাহিত্য, পোশাক আসাকের ফ্যাসন, রাজনীতি, সিনেমা সব বিষয়েই মোটামুটি ওয়াকেবহাল। সহরের শিক্ষিত সংস্কৃত পরিবারের মেয়েদের যে সব গুণ থাকে, তিনি তার কোনটা থেকেই বঞ্চিত নন। হাসিমুখে মিষ্টি স্বরে নম্রভাবে কথা বলেন। আলাপে আচরণে কিছুটা কৃত্রিমতা থাকলেও আমি তাঁর সাহচর্য বেশ সানন্দেই উপভোগ করছিলাম। সুন্দরী সুসজ্জিতা বুদ্ধিমতী মহিলারা যখন সচেতন অথচ পরোক্ষভাবে অপরের কাছে নিজেদের রূপ-গুণের আবরণ উন্মোচন করতে থাকেন তখন গুণগ্রাহীর চিত্তে একটা গভীর

রোমান্টিক আবেগের সৃষ্টি হয়। আমি সেই আবেগে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এরপর যখন মিসেস সেন এস্‌রাজের সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগলেন তখন আমার মনটা দারুণ ভাবালু হয়ে উঠল। বসে বসে নিজের মনে মনে নানারকম কল্পচিত্র দেখতে লাগলাম।

তারপর আহার। ততক্ষণে মিসেস সেন আরও সহজ হয়ে উঠেছেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে সব জিনিসই একটু বেশি বেশি খাইয়ে দিলেন। রাত্তি ন'টায় বিদায় নেবার সময় এমন অনুনয়ের সুরে 'আবার আসবেন' কথাটা উচ্চারণ করলেন যে সত্যিই আমার মন কেমন করতে লাগল।

রাস্তায় বেশ শীত। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কভাবে কখন যে শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি তা আমার খেয়ালই ছিল না। মিসেস সেনের কথার সুর এবং গানের রেশ তখনও আমার কানের মধ্যে গুঞ্জিত হচ্ছে। একটা নিদারুণ মোহ এবং প্রলোভন সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। না, ললিতা সেনের দিকে কোন লোভ নেই। তিনি লোভনীয় ঠিকই তবে আমার কাছে লোভালোভের অতীত কারণ তিনি আমার বন্ধুপত্নী। এ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা আমার মজ্জাগত! জটিলতাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভয় পাই। তাই কোন অস্বাভাবিক প্রণয় চিন্তাকে মনে স্থান দিই না। মিসেস সেন আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হঠাৎ অতি তীব্র শক্তি সঞ্চার করেছেন কিন্তু সেটা একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক। মনে হচ্ছিল, নিরঞ্জনবাবু না জানি কত সুখী। এমন একজন রূপসী এবং গুণী মহিলার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করে ওঁর জীবনটা রঙে রসে কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাড়িতে যার এত বড় জীবন্ত আকর্ষণ, বাইরের জগতকে তিনি যে কিছুটা বিস্মৃত হবেন, তা আর আশ্চর্য কি।

একদিন আমি ওকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, যে ওঁর স্ত্রীভাগ্য ঈর্ষার বস্তু। আজ সেই ঠাট্টাটা আমাকেই ব্যঙ্গ করতে লাগল। বন্ধুমহলে প্রেম-বিবাহ দাম্পত্য-জীবনের চিরাচরিত একঘেয়েমি নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে আমরা অনেক সময় সিনিক সাজবার চেষ্টা করি কিন্তু ভেবে দেখলাম সেই সিনিসিজম একেবারে অসার। ইন্দ্রের ঐরাবৎ যেমন গঙ্গার স্রোত বাঁধতে এসে নিজেই ভেসে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তেমনি নরনারীর আদিম আকর্ষণের উদ্দাম

স্রোতে পৃথিবীর সমস্ত সংশয়বাদ একদিনেই কোথায় যে ভেসে যেতে পারে তার ঠিকানা নেই।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মানুষের মত বোধ হ'তে লাগল। খুব অল্প বয়সেই নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেস-বোর্ডিং-এ বাস করছি। কোন মেয়ের সঙ্গে কখনও সামান্যতম রঙিন সম্পর্কও গড়ে উঠেছে বলে মনে পড়ে না। আমার কোন সহপাঠিনী নেই কারণ আমি টেকনিকাল স্কুলের ছাত্র। বউদির বোন অথবা দিদির ননদদের দেখবার সুযোগ হয়নি। রেলস্টেশন, হোটেল, সমুদ্রের তীর অথবা পাহাড়ের চূড়ায় আকস্মিকভাবেও কখনও কোন অপরিচিতার সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠেনি। আজও পর্যন্ত কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে না পারার হতাশা-বোধ আমার মনটাকে বেশ দুর্বল করে ফেলতে লাগল। ললিতা সেনের ম গ্ল্যামারওয়ালা মেয়ে না হোক, নিতান্ত সাদামাঠা হাসিখুশি একটা মেয়ে তো অনায়াসেই একটা চিঠি লিখে জানাতে পারত 'তোমাকে ভালবাসি'। তাহলে আমি নিশ্চয়ই খুব সুখী হতাম। কিন্তু স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করেও কোন সম্ভাব্য প্রেমিকা খুঁজে পেলাম না। অবশেষে ও চিন্তা ত্যাগ করে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হল।

নতুন বাসায় উঠে গেলাম সপ্তাহের মাঝামাঝি। ফাড়কে সাহেবকে রাত্রের গাড়িতে তুলে দিয়ে ফেরবার পথে বউবাজার-সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর জংসনে নেমে সিগারেট কেনবার জন্য মোড়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় চোখের সামনে অনুরাধাকে দেখে আমার বুকের রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা এমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে আমি কিছুটা অপ্রস্তুতবোধ করতে লাগলাম।

অনুরাধা হাসিমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল: অশোকবাবু, এতদিন কোথায় গিয়েছিলেন?

: এখানেই ছিলাম। আপনারা সব ভাল আছেন? আপনার মা?

: হ্যাঁ, মা ভাল আছেন। তিনি রোজ আপনার কথা বলেন। আপনি তো কই আর আমাদের বাসায় আসেন না।

কেন যাইনি তার কারণ আমি নিজেও খুঁজে পেলাম না। বললাম: হ্যাঁ,

অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আপিসের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এইবার একদিন যাব। আপনি এত রাত্তিরে কোথা থেকে ?

হাতের বই-খাতা দেখিয়ে অনুরাধা বলল : বাসায় ফিরছি। প্রফেসরের কাছে পড়তে গিয়েছিলাম। ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেল কি-না। আমার আবার ইকনমিক্সে অনার্স আছে, তাই একটু গাইড্যান্স দরকার হয়। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, অনুরাধাদের বাসাটা কাছেই এবং আমার নতুন বাসাটাও দূরে নয়। অর্থাৎ আমরা অনেকটা পড়শী হয়ে উঠেছি।

বললাম : আমি সম্প্রতি আপনাদের বাসার কাছাকাছি উঠে এসেছি। কাপালীটোলা লেন এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

: মেস ?

: মেস নয় বাসা।

: আপনার ফ্যামিলি এসেছেন বুঝি ?

: না, আমি একলাই থাকি। হঠাৎ পেয়ে গেলাম ফ্ল্যাটটা। মেসে খুব অসুবিধা হচ্ছিল।

: রান্নাবান্না করে কে ?

: হোটেলে খাই।

: বলেন কি ? শরীর ভেঙ্গে যাবে যে।

: এতকাল মেস-বোর্ডিং-এ থেকেও যখন শরীর টিকে আছে তখন রাতারাতি কিছু হবে না।—

: অমলদার খবর কিছু জানেন ?

: অমলবাবু—হ্যাঁ—পাটনায়—

: পাটনায় গেছে তা জানি। তার পর ?—অনুরাধা কৌতুকের ছলে ভ্রু বাঁকালো। তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি মুক্তোর মত ঝকঝক করে উঠল। সবুজ পেড়ে সাদা সাড়ি আর হাতে বোনা হাল্কা রঙের উলের ব্লাউসের উপর টুইডের পুরো হাতা কোট। কানে ছোট দুটো সোনার মাকড়ি। চুলের বেণী দুটো কোটের তলায় চাপা। কপালের উপর কয়েক গাছি চুল অগোছালো। বাঁ গালে একটা কালির দাগ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেকক্ষণ পড়াশোনা করে কিছুটা ক্লান্ত। অনুরাধার সান্নিধ্য আমার মনে প্রাণে একটা অস্বাভাবিক উষ্ণতা জাগিয়ে তুলেছে। ওর সঙ্গে কথা বলার

চেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মনে কথা বলার ঝোঁক যেন আমি সামলাতে পারছিনা। প্রশ্নের জবাব দিতে তাই একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে আর জবাবটা পরিপূর্ণও হচ্ছে না।

: তারপর, মানে, তারপর আর কি ?

: তারপর ওবলিভিয়ন ?—অনুরাধা হাসতে লাগল : মতলবটা কি বলুন তো ?

: কার মতলব ?

: অমলদার পাটনায় পলায়নের ? সাংঘাতিক ওয়ারাণ্ট টোয়ারাণ্ট কিছু বেরিয়েছে নাকি ?

: তেমন তো কিছু শুনিনি। পাটনায় সে তার দিদির কাছে গেছে।—আর বেশি কিছু বলা চলে না। বণ্টুর নিষেধ ছিল।

অনুরাধা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ললিতা সেনের আতিথ্য গ্রহণের পর আমার চিত্ত রোমান্স পিপাসায় কাতর হয়ে উঠেছিল। অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছিলাম, আমার চারিপাশে সম্ভাব্য প্রেমিকা তো দূরের কথা, ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও কেউ নেই। এই উপলব্ধি মনোমুগ্ধকর নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। সত্যি কথা বলতে কি, ললিতা সেনের নেমন্তন্ন খাবার পর থেকে আমি নিদারুণ হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। অনুরাধার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন আমাকে সেই মানসিক অবসন্নতা থেকে হঠাৎ মুক্ত করে দিয়েছে।

: আমাদের বাসায় চলুন।—অনুরাধা গ্রীবা বাঁকিয়ে অনুরোধ করল।

: আজ ? এক্ষুণি ?

: হ্যাঁ, কাছেই যখন থাকেন তখন—

: আজ থাক। রবিবার বিকেলে আসব।

: ঠিক আসবেন তো ? না কি, আবার ডুব মারবেন ?

: আসব।

আমার সঙ্গে কয়েক পা দক্ষিণ দিকে এসে অনুরাধা তাদের গলিতে ঢুকে গেল। একটা সুনিবিড় উত্তেজনাময় আনন্দ আমার মনের ভারসাম্য বেশ কিছুটা নাড়াচাড়া করে দিয়ে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার উপর এলোমেলো ঘুরতে লাগলাম। এই কদিন অনুরাধার কথা আমার মনে পড়েনি কেন ? আশ্চর্য। অনুরাধা আমার প্রেমিকা নয় ঠিকই কিন্তু সে যে

আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ পোষণ করে, সেইটুকুও কিছু কম প্রাপ্তি নয়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত আর্দ্র হয়ে উঠল। অনুরাধা এবং তার মা দুজনেই আমাকে খুব পছন্দ করেন। তবুও যে আমি এতদিন ওদের বাসায় যাইনি কেন, তা ভেবে পেলাম না। বল্টুরই বা খবর কি? সাত আট মাস আগে সেই যে সে পাটনায় চলে গেল, তারপর আর তো তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। কারখানার আন্দোলনে জড়িয়ে পুরোনো দুনিয়াটাকে আমি যে প্রায় ভুলতে বসেছি।

পরের রবিবার সন্ধ্যায় অনুরাধাদের বাসায় গেলাম। দরজায় টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কপাট উন্মুক্ত হয়ে গেল। ডান হাতে পর্দাটা সরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো অনুরাধা। মনে হল যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমারই প্রতীক্ষা করছিল।

ঃ আসুন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ইলেকট্রিকের আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। এর আগে যতবার তাকে দেখেছি, প্রত্যেক বারই সে আটপৌরে সাদাসিধে পোশাকে ছিল। কিন্তু আজ সে সুসজ্জিত। সবুজ ফ্লানেলের ব্লাউজ আর সূর্যমুখী রঙের সিল্কের সাড়িতে তার নরম নমনীয় দেহ আবৃত। আঁটোসাটো খোঁপার মূলে একটা সাদা ফুলের মালা। প্রসারিত চোখ দুটি কাজলের রেখায় উজ্জ্বলতর এবং বাঙ্ময়। ঠোঁট দুটি রসে টসটসে। কানে লাল পাথরের টুকরো। গলার হার বুকের শুভ্র মসৃন পটভূমিকায় বিচ্ছুরিত। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট সোনার ঘড়ি আর ডান হাতে গোটাকতক সরু সরু চুড়ি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলাম। অনুরাধা দেখতে সুশ্রী তা আগেই জানতাম। আজ মনে হল, অনুরাধা অতি আকর্ষণীয়া মেয়ে। তার শরীরের দৈর্ঘতা, বিস্তৃতি, বিভিন্ন অঙ্গের সংস্থান, পরিপুষ্টি এবং বিন্যাসের মধ্যে অতি দুর্লভ একটা ভারসাম্য আছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ললিতা সেনের সঙ্গে অনুরাধার একটা তুলনামূলক প্রভেদ বিশ্লেষণের চিন্তা আমার মনটাকে অবরোধ করল কিন্তু সেটা করবার অবকাশ পেলাম না।

ঃ মা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় আসবেন না।—ঘরের মধ্যিখানে ঠিক

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বলল অনুরাধা। তার হাসিখুশিভাবটা আমাকে মুহূর্তেই অভিভূত করে ফেলল।

: কেন ?—তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

: মায়ের ধারণা, লেখকদের কোন কথা মনে থাকে না। গল্পের প্লট ছাড়া আর সবই তারা ভুলে যেতে ভালবাসে।—চোখে মুখে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল অনুরাধা। এতক্ষণ মোটামুটি একটা নিরাসক্ত অনুভূতি নিয়েই আমি ওর দৈহিক সৌন্দর্যের দ্যুতিটুকু উপভোগ করছিলাম কিন্তু ওর বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি এবং ঠোঁটের ইঙ্গিতময় হাসির আভাস হঠাৎ আমার সমস্ত শিরা উপশিরায় একটা নিবিড় আলোড়ন এনে দিল। এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম যে কথার জবাব দিতে পারলাম না।

: কি দেখছেন ?—চাপা গলায় প্রশ্ন করে সসঙ্কোচে নিজের দিকে তাকাল অনুরাধা। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

: দেখছিলাম আপনার খোঁপাটা।

অনুরাধা ডান হাতখানা খোঁপায় রেখে বলল : কেন ?

: চমৎকার ডিজাইন করেছেন।

তার মুখে আবার একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। মেয়েদের রূপের প্রশংসা করা কোন কোন পরিবারে মানহানির সামিল বলে শুনেছি। সুতরাং যতদূর সম্ভব সতর্ক থাকা দরকার।

: হ্যাঁ, কি বলছিলেন ? লেখকদের কিছু মনে থাকে না ?

: মা তাই বলছিলেন।

বললাম : খাঁটি লেখকরা তেমন হতে পারেন। আমি লেখক কাম শ্রমিক। কাজেই আমার সে 'গুণ' নেই।

: হুঁ, তাই দেখছি। বেটার লেট দ্যান নেভার।

: কেন ?—অনুরাধার পিছনে পিছনে তার মায়ের ঘরে যাবার সময় প্রশ্ন করলাম আমি।

: বিকেলে আসবার কথা ছিল আর কখন এলেন ?—এই অনুযোগ আমার কাছে অনেকটা অভিমানের মত শোনালো। মনে মনে বেশ একটু অসামাল বোধ করতে লাগলাম।

: আসুন।—মিসেস সরকারের আহ্বান। আজও তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তবে আজ তাঁর বিছানাপত্র সাজ পোশাকে কোন আগোছালো ভাব নেই। মুখখানা উজ্জ্বল। চুলটা আঁচড়ে এলো খোঁপায় বেঁধে রেখেছেন। বিছানায় শুয়ে না থাকলে তাঁকে অসুস্থ ভাববার কোন হেতু থাকত না।

মিসেস সরকারের মুখোমুখি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম আমি। অনুরাধা মায়ের পায়ের কাছে ডান কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে পা ঝুলিয়ে বসল।

মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বললেন : অনু আজ সারা বিকেল ছটফট করেছে। আপনি এলেন না দেখে হতাশ হয়ে বলছিল, বোধ হয় এ্যাপয়েন্টমেন্টটা আপনার মনে নেই। আমি বললাম, তাতো হতেই পারে। লেখক কবি এবং শিল্পীরা সাধারণত আপনভোলা লোক। সব সময় সব কথা তাঁদের মনে থাকে না।

: আমাকে তাঁদের দলে ফেলা ঠিক নয়। আমি কারখানার ড্রাফট্‌স্‌ম্যান। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রদূত। মাটিতে পা রেখেই আমাকে চলতে হয়।

অনুরাধা ঠোঁট টিপে হাসল : অর্থাৎ আপনি খুব বাস্তববাদী। এইত? মুখে বাস্তবতার কথা বলেন অথচ বইতো লেখেন ষোলো আনা রোমান্টিক।

মিথ্যা নয়। নিজেও সে কথাটা ভাল করে জানি। উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ওর মনের পরিণত এবং অপরিণত অবস্থার ব্যবধান এবং অসঙ্গতি আমার কাছে দস্তর মত বিভ্রান্তিকর। ঠিক সেই সময় মিসেস সরকার আমার কুশল প্রশ্ন করে আমাকে সঙ্কটাবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

: আপনি অনেকদিন বাদে আমাদের বাসায় এলেন। শরীর টরীর ভাল তো?

: হ্যাঁ ভাল। আপনাকেও তো বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।

: আমার শরীরও বেশ ভাল যাচ্ছে।—মিসেস সরকার হাসলেন : হ্যাঁ, অমলের খবর কি বলতো বাবা। ও-হো, আমি বারবার আপনাকে 'তুমি' বলে ফেলি।

: তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি তো বলেছি, আমাকে তুমিই বলবেন।

: বেশ, তাই বলব।

আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে ওঁর বাধো-বাধো ঠেকবার কোন কারন নেই। তবু যে আমাকে বাবা বাছা বলার দিকেই ওঁর স্বাভাবিক প্রবণতা, সেটা লক্ষ্য করে আমি কৌতুক বোধ করি। বাইরের বয়স দিয়ে মনের গতিবিধি নির্ণয় করা খুব মুস্কিল। সহরের উঁচু সমাজে ওঁর বয়সী অনেক মহিলারা এখনও প্রজাপতির স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন। ওঁর কাছে যারা সন্তান, তাদের কাছে তারা যে সম্ভাব্য প্রণয়ী নয়, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। জীবনে ক্রমাগত মার খেতে খেতে মিসেস সরকার নিজেকে এত প্রবীণ বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে, কম বয়সী সকলেই ওঁর কাছে এক পুরুষ নীচের লোক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

: আমার ছেলে নেই। তাই কাউকে ছেলের মত ভাবতে পেলে মনে মনে তৃপ্তি পাই।—কেমন করুণ সুরে বললেন তিনি।

: সেটা আমি বুঝতে পারি।

: তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার কোন অহঙ্কার নেই।

অহঙ্কার? কিসের অহঙ্কার? অহঙ্কার করবার মত কোন গুণ আমার আছে? লেখা? অসম্ভব। লেখার জন্য কোন অহঙ্কার আমি পোষণ করতে পারি না। তাহলে সেটা আত্মপ্রবঞ্চনা হয়ে যাবে। সুতরাং অহঙ্কার না থাকা আমার বিনয় নয়। কিন্তু অহঙ্কার একেবারে নেই, সে কথাও সত্য নয়। নিজেকে আমি কুসংস্কারমুক্ত উদার মানুষ বলে মনে করি। সে আমার মস্ত অহঙ্কার। সেখানে আঘাত লাগলে মনটা নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াবে। মিসেস সরকার আমাকে বাইরে থেকে দেখছেন। কাজেই আমার চরিত্রের সেই দিকটা কোনদিনই ওঁর নজরে পড়বে না।

: হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অমলের খবর কি? বেশ কিছুকাল নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ একদিন এসে বলল, পাটনায় চলে যাচ্ছে দিদির কাছে। তারপর আর কোন সংবাদ নেই।

বললাম: ব্যাস, আমিও ঐটুকু জানি।

: এভাবে হঠাৎ চলে গেল কেন?

: আমার মনে হয়—অনুরাধা কনুই ছেড়ে উঠে বসল। আমার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের সুরে বলল: কোন গুরুতর মামলায় জড়িয়ে—

: না না, যতদূর জানি, সে রকম কিছু নয়।—আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না: কেন, যাবার সময় সে আপনাদের কাছে কিছু বলে যায় নি?

বিবর্ণ বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে রেঙ্গুনের জন্ম প্রাণটা বড় কাঁদে। আমার জীবনে যা কিছু সুন্দর শুভ্র প্রাণময় এবং সুগন্ধ সবই সেই রেঙ্গুনের স্মৃতি।—চোখ বুঁজে বড় করে একটা শ্বাস টানলেন মিসেস সরকার: রেঙ্গুনে জীবনের অসংখ্য প্রাপ্তিতে আমার মুঠি উপচে পড়েছিল আর এই কলকাতায় সেই মুঠি খুলে সব কেড়ে নিয়েছেন ভগবান। সেই হিসাবে কলকাতা আমার কাছে শ্মশানের প্রতীক। মাঝে মাঝে ভাবি, আবার যদি রেঙ্গুনে ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় অনেক শান্তি পেতাম। রেঙ্গুন আমার সত্যিকারের মা। যেদিন মায়ের কাছ ছাড়া হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমার সর্বনাশ সুরু হয়েছে।

রেঙ্গুন সম্বন্ধে মিসেস সরকারের এই ভাবপ্রবণতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ওঁর বাল্য শৈশব যৌবন প্রণয় বিবাহ মাতৃত্ব সবই সেই রেঙ্গুনের স্মৃতি। অতীতের বিরাট সমারোহের পটভূমিকায় বন্ধ্যা বর্তমান যে কি ভয়াবহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন তা এই মুহূর্তে আমার চেতনার প্রতি বিন্দু দিয়ে অনুভব করছি। তাঁর খেদোক্তিতে ঘরের আবহাওয়া একটা বিষণ্ণ হাহাকারে ভরে উঠেছে।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে চায়ের সরঞ্জাম হাতে করে ঘরে ঢুকল অনুরাধা। তার উপস্থিতিতে গুমোট ভাবটা অনেক পাতলা হয়ে গেল। ততক্ষণে মিসেস সরকারও নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বললেন: অনুর কাছে শুনলাম, তুমি আমাদের বাসার কাছাকাছি কোথায় উঠে এসেছ।

: হ্যাঁ, কাপালীটোলায়।

: খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই?

: না, হোটেলে খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।

: একলা একলা বাসায় থাকতে ভয় করে না?—কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: কিসের ভয়?

: ভূতের।—অনুরাধা মুখ টিপে হাসল।

বললাম: আমাদের দারওয়ান যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া আর তার গলার আওয়াজ সেই রকম বাজখাই। ভূত তো ভূত পেত্নীরাও তাকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না।

: পেত্নীরা বুঝি ভূতের চেয়ে বেশি সাংঘাতিক ?—অনুরাধা ঠোঁট টিপে হেসে ভ্রু বাঁকালো। আমি আনমনা হয়ে গেলাম। মিসেস সরকার জোরে হেসে উঠলেন।

: সাংঘাতিক হোক না হোক nagging তো বটেই।

: মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা বুঝি এই ?—মিসেস সরকার হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন।

: মেয়েদের সম্বন্ধে নয়, পেত্নীদের সম্বন্ধে।—কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম।

বন্ধুমহলে সিনিক সেজে বাহবা নেবার বিপদ এই যে অন্য জায়গায় গিয়েও মুখ দিয়ে সেই সব কথা বেমক্কা বেরিয়ে যায়। তার ফলে অনেক সময় বেকুব বনতে হয়। নিজেকে আয়ত্তে রাখা যে কত কঠিন, তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

: পেত্নীরাও যাকে ভয় খায়, তাকে দেখে মানুষের তো মূর্চ্ছা যাবার কথা।

: মানুষ যে ভূতপেত্নীর চেয়ে ভয়ঙ্কর। দশ পনেরো বছর আগে কলকাতায় কত ভূতুড়ে বাড়ি ছিল। ভূত পেত্নীরা সেখানে সংসার পেতে পুরুষানুক্রমে দিব্বি বাস করছিল। দেশ ভাগাভাগির পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা এসে রাতারাতি সেই সব ভূত পেত্নীদের বাস্তুহারা করে নিজেরাই সেখানে সংসার পেতে বসেছে। ভূত মানুষকে ভয় খায়। মানুষ ভূতকে ভয় খায় না।

এরপর ভূতের গল্প জমল। রাত আটটার সময় আমি বিদায় চাইলাম।

মিসেস সরকার বললেন: আবার এস বাবা। এখন তো কাছেই থাক। তোমরা এলে গেলে মনটা ভাল থাকে। তাছাড়া মেয়েটাও তো লোকজনের সঙ্গে মিশতে পায় না। ওর বয়সে রেঙ্গুনে আমি হৈ হৈ করে জীবন কাটিয়েছি। আর ও বেচারী রোগীর সেবা করতে করতেই গেল।

: হ্যাঁ, আসব মাঝে মাঝে। তাছাড়া আপনাদের যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমায় খবর পাঠাবেন। ঠিকানাটা দিয়ে যাচ্ছি।

এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে মিসেস সরকারের হাতে দিয়ে দিলাম।

অনুরাধা এলো আমার পেছন পেছন। সেদিনের মত বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল: অশোকবাবু।

আমি তৎক্ষণাৎ পেছনে ফিরলাম। এতক্ষণ যেন মনে মনে এই আহ্বানেরই প্রতীক্ষা করেছি।

অনুরাধা তার ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা আঁটা খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরল।

: বাড়ি গিয়ে এটা পড়ে দেখবেন।—লজ্জা, শঙ্কা এবং দ্বিধায় তার গলার স্বরটা বাষ্পাচ্ছন্ন। মন্ত্রের মত সেটা আমার চেতনাকে কেমন অবশ করে দিল। বহুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কে যেন আমার কণ্ঠের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। অনুরাধার চোখের দুটি কালো তারা ছাড়া আর কিছুই আমার চোখের সামনে নেই। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকের মধ্যে দিয়ে দুর্বার বেগে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শিরা উপশিরায়।

: নিন।—অনুরাধা মিনতি করল।

: কি আছে ওতে?—আমার গলার স্বর যে এত ফিসফিসে হতে পারে তা আমি নিজেও জানতাম না।

: বাড়িতে গিয়েই দেখবেন। হাসতে পারবেন না কিন্তু।—তার মুখে আগের সেই রহস্যাবেশের চিহ্ন নেই।

: হাসব!—আমি বিস্ময় বোধ করলাম।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ হাসির ব্যাপার। মাকে বলবেন না। প্লিজ। অমলদাকেও নয়। বুঝলেন? তাহলে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব।—চটুল ভঙ্গিতে বলল অনুরাধা।

: আমি হাসব, আপনি কাঁদবেন—ব্যাপার কি?—এতক্ষণ আমি সহজ স্বরে কথা বললাম।

: হ্যাঁ, খুব মজা। নিয়ে যান না।

খামটা গ্রহণ করে তখনই খুলতে যাচ্ছিলাম। অনুরাধা আমার হাত চেপে ধরল।

: না না, এখানে নয়। বাড়ি গিয়ে। প্লিজ অশোকবাবু।

ব্যাপারটার হ্রস্বদীর্ঘ কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিভ্রান্ত এবং উত্তেজিত মনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় এসে পড়তেই আমার ধৈর্যহানি ঘটল। ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম।

ছোট্ট চিঠি—

অশোকবাবু—

সেদিন আমায় নিয়ে যে গল্পটা লিখতে চেয়েছিলেন, সেটা আমিই লেখবার চেষ্টা করেছি।

পড়ে দেখবেন কেমন হয়েছে। অনুগ্রহ করে কাউকে বলবেন না। তাহলে কিন্তু ভারী লজ্জা পাব। আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম। রাগ করবেন না।

ইতি—

অনু

এই চিঠির তলায় পৃষ্ঠা দশেকের একটা পাণ্ডুলিপি। কেরামতি আছে অনুরাধার। আমাকে এক মুহূর্তেই ওলট পালট করে দিয়েছিল। কল্পনার স্বর্গ থেকে এক ধাক্কায় মাটির পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে কিছুটা চোট খেলেও নিজের কমিক চরিত্রটা উপভোগ করলাম। সত্যি কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে খামের মধ্যে অনুরাধার প্রণয়বার্তা আছে। এমন একটা অযৌক্তিক ধারণা যে কি করে সৃষ্টি হল তা বলতে পারবনা। মনে হয়, সন্ধ্যায় অনুরাধাকে নতুন রূপে আবিষ্কার করার পরে আমার মধ্যে যে চিত্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, চিঠির আদান প্রদানে সেটা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। তাতে আমার মানসিক ভারসাম্য কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

বাড়ি গিয়ে অনুরাধার গল্পটাও পড়ে ফেললাম। যেমনটি আমি বলেছিলাম, ঠিক সেই রকমই লিখেছে। অর্থাৎ জলজ্যান্ত লেখককে দেখে পাঠিকার 'পতন ও মূর্ছা' দিয়ে গল্প শেষ। পাঠিকার খামে মোড়া পত্র পেয়ে লেখকের 'পতন এবং মূর্ছা' লিখলে গল্পটা আরও ভালো জমত। আমি মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিলাম। কিন্তু হেসে যে সব জিনিস উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেটা টের পেলাম আরও কিছুক্ষণ বাদে।

একথা বলাই বাহুল্য যে অনুরাধার চিঠি মোটেই প্রণয়জ্ঞাপক নয়। সাহিত্য চর্চার কথা মুখে প্রকাশ করতে লজ্জা পেয়েছে বলে অমন একটা ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাব। আমার মত অন্য যে কোন লেখকের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই সে এই ভাবে তার কাছে উপস্থিত হত। আমি এখানে নিতান্তই আকস্মিক। ঘটনার এই হচ্ছে একমাত্র সরল ব্যাখ্যা। কিন্তু মানুষের মন ঘটনার ব্যাখ্যা জেনেই তৃপ্ত হয় না। সে তার চাওয়া পাওয়া দিয়ে বাইরের ঘটনাচক্র আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। আমি নিরাসক্ত বৈরাগী নই। নারীর ভালবাসায় আমার লোভ ষোল আনা। যতই সময় কাটতে লাগল ততই

আমি সমস্ত ব্যপারাটা সেই ভাবে ভাবতে সুরু করলাম। গোড়ায় চিঠিটাকে প্রণয়লিপি ভেবে মনটা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল, সেখানে অনুরাধা আমার প্রণয়ী। মন সেখান থেকে কিছুতেই যেন পিছু হটতে রাজি নয়। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমার মনে অনুরাধার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে। ধারণাটা ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু অনুরাগ ভ্রান্ত নয়। পৃথিবীর জল বাষ্প হয় আকাশে উড়ে গিয়ে মেঘে জমাট বাঁধে। কিন্তু জল আর মেঘ দুটি পৃথক সত্তা। মেঘ পৃথিবীর জলের নিয়মে বাঁধা নয়। মেঘ চলে তার নিজের খেয়ালে বাতাসের তালে তাল দিয়ে, আর জল চলে স্রোতে স্রোতে গা ভাসিয়ে উঁচু থেকে নীচের দিকে। অনুরাধার সম্বন্ধে আমার অনুরাগ যেখান থেকেই জন্ম লাভ করুক, সে তার নিজস্ব নিয়মে চলবে। তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, অনুরাধার প্রণয়চিন্তা ক্রমে ক্রমে আমার মনটাকে অবরোধ করে ফেলতে লাগল। ধরে নিচ্ছি, অনুরাধা আমাকে ও দৃষ্টিতে আদৌ দেখেনি। হয়ত আমাকে সে নিছক পারিবারিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার মন যদি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারি। পৃথিবীতে সব প্রেমিক প্রেমিকাই কি একই মুহূর্তে পরস্পরের প্রেম পড়েছে? তাতো নয়। প্রেমে পড়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকা খুবই স্বাভাবিক। একজন আগে আর একজন পরে প্রেমে পড়তে পারে। তাতে প্রেম কিছু অপ্রেম হয়ে ওঠেনা। সুতরাং আমারও হতাশ বোধ করার কিছু নেই।

প্রেমের প্রশ্নটাকে এই ভাবে মীমাংসার পর্যায়ে এনে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুমোনো বড় কঠিন। ঘরের বাতাস হঠাৎ অনুরাধার দেহের সৌরভে ভরে উঠেছে। অনুরাধা কখনও এই ঘরে আসেনি। এখানে তার প্রসাধনের সুগন্ধ অলৌকিক ঘটনার মত লাগছে। বিছানায় উঠে বসে ঘন করে শ্বাস টানলাম। ল্যাভেণ্ডারের স্নিগ্ধ আমেজ। আমার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। ঘরের জমাট অন্ধকার যেন অনুরাধার দেহের সুবাস দিয়ে বোনা। বিচিত্র রহস্য! উঠে গিয়ে দেওয়ালের সুইচ টিপে আবার ফিরে এলাম খাটের কাছে। আ-হাঃ, বালিশের পাশে পড়ে আছে অনুরাধার গন্ধ শুদ্ধ খাম খানা। সেটা তুলে নাকে চেপে ধরলাম। গন্ধের স্মৃতিতে এত মাদকতা

আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। খামখানা যেখানে ছিল সেখানে রেখে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে মনে হল, কারখানা থেকে ফিরে গল্পের মতামত জানাবার ছুতো করে অনুরাধাদের বাসায় যেতে হবে। তাকে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করছে। গতকাল সে আমার জন্য সারা বিকেল ছটফট করেছিল। কথাটা মিসেস সরকারই বলেছেন। কিন্তু কেন? আমার জন্য অনুরাধার সেই ব্যাকুলতার কারণটাতো কাল আমি একবারও ভেবে দেখিনি। নিছক একটা গল্প পড়াবার জন্য? তাহলে বিশেষ সাজগোজের উদ্দেশ্যটা কি? সে কি আমার জন্য নয়? গতকাল ছবিটা আমি একদিক থেকেই দেখেছি। সকালে 'ছটফট' কথাটা মনে হতেই ছবির অন্য দিকটায় নজর ফেলবার চেষ্টা করলাম। আমি একাই তার সম্বন্ধে এক তরফা দুর্বল হয়ে পড়েছি এইটাই কি পূর্ণাঙ্গ সত্য? দুর্বলতাটা পারস্পরিক নয়—এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? আমার সঙ্গ যে সে কামনা করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই যদি হয়, তাহলে ভালবাসলেই বা ক্ষতি কি? না, কোন ক্ষতি নেই। নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলাম।

মনটা সারাদিন আশা আশঙ্কায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে রইল। অনুরাধাকে কেন্দ্র করে একটা করুণ নিবিড় মমত্ববোধ আমার চেতনাকে আত্মমুখী করে তুলতে লাগল। মনে হল এতকাল আমি যেন অনুরাধার প্রতীক্ষা করেই কাল গুণেছি। তাকে হঠাৎ আবিষ্কার করার মধ্যে একটা অলৌকিক পূর্ব নির্দিষ্টতা আছে। নইলে সুদূর রেঙ্গুনের মেয়ে এত পথ ঘুরে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধল কেন? সরকার পরিবারের সঙ্গে বল্টুর মাধ্যমে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটাও যেন অতীন্দ্রিয় রহস্যে আবৃত। আমি জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলি, আমি যুক্তিবাদী। অলৌকিকতায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু বেশ অনুভব করছি, মনটা যুক্তির পথ ছেড়ে আবেগাশ্রয়ী হবার জন্য অন্ধ ভাবে ছুটে চলেছে। তাকে রোধ করার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বিশেষ ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলায় অজ্ঞানতাও নিদারুণ মোহময় হয়ে ওঠে দেখা যাচ্ছে।

সেদিন বিকেলে কারখানায় একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটল। জলন্ত লোহার বালতি কনভেয়ারে চাপিয়ে একদিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার সময় একটা

লোহার ডাণ্ডায় ঘা খেয়ে হঠাৎ ছলকে গেছে। জন চারেক কুলি তাতে বিশেষ জখম হয়েছে। তার মধ্যে একজনের অবস্থা খুবঁ খারাপ। তাদের হাসপাতালে পাঠানো, বাড়িতে খবর দেওয়া, তদন্তে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজগুলো সেরে ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আপন আপন বাসায় ফিরতে প্রায় মাঝ রাত্তির হয়ে গেল। কাজেই অনুরাধাদের বাসায় যাবার প্রশ্নই উঠল না।

পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম, যার অবস্থা খারাপ ছিল, সে মারা গেছে। বাকি সকলের অবস্থা ভালর দিকে। মনটা বেশ দমে গেল। কারখানায় গভীর শোকের ছায়া পড়েছে। সব জায়গায় কেমন একটা থমথমে ভাব।

হতাহতদের ক্ষতিপূরণ আদাদের প্রশ্ন নিয়ে ছুটির পর ইউনিয়নের একটা মিটিং ডাকা হল এবং সে মিটিং শেষ হল রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময়।

এই সমস্ত অবাঞ্ছিত এবং বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্যে অনুরাধার কথা যে আমার তেমন করে মনে পড়েনি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তৃতীয়দিন হাসপাতালে সহকর্মীদের সুস্থ দেখে সন্ধ্যার পর বাসায় ফেরবার পথে বৌবাজারের জংসন পেরুবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল, অনুরাধাদের বাসায় যাওয়া হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার প্রণয়োচ্ছ্বাসের প্রাথমিক উগ্রতা কমে গেছে। মনের সেই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আর নেই। অনুরাধার সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা কিছুমাত্র হ্রাস না পেলেও কারখানার রূঢ় এবং বাস্তব ঘটনাবলী আমাকে অনেকে ধীর স্থির করে দিয়ে গেছে। সেই দুর্ঘটনার সঙ্গে অনুরাধার অবশ্য কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমার মনের দুই পাল্লায় দাঁড়িয়ে চিন্তায় ভারসাম্য এনে দিয়েছে। আমি পরিণত বয়স্ক যুবক। কলেজের ছাত্রের মত কাঁচা বয়সের প্রথম প্রেমের উন্মত্ততা প্রকাশ করা আমার পক্ষে শোভন নয়। অনুরাধার হৃদয় জয় করতে হলে আমাকে ভব্য, শোভন এবং মর্যাদাব্যঞ্জক পথে এগোতে হবে। উচ্ছ্বাসটা নিজের মধ্যে সংযত করে ঘটনাকে কিছুটা তার নিজের গতিপথেই চলতে দেওয়া উচিত। আপাতত কিছুকাল না হয় অনুরাধাদের বাড়িতে নাই গেলাম। একটু সংযম অভ্যাস করেই দেখা যাক, মনের জোর কিরকম।

পরপর দুটো রবিবার অর্থাৎ দুটো সপ্তাহ বেশ সহজ ভাবেই কেটে গেল। অনুরাধাকে বাহ্যত দূরে সরিয়ে রাখলেও সে আমার মনের মধ্যে বেশ জীবন্ত

হয়ে রইল। তৃতীয় রবিবারের সকাল বেলায় তাদের বাড়িতে যাবার জন্য মনটা বেশ আকুল হয়ে উঠেছিল কিন্তু আমি জোর করে সিদ্ধান্ত করলাম যে, পরের রবিবারের আগে সেখানে যাওয়া হবে না।

দুপুরে খেয়ে একটা ঘুম লাগিয়ে চৌরঙ্গীতে সিনেমা দেখতে চলে গেলাম। সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এসে দেখি, অনুরাধা আশুতোষের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে আনমনে রাস্তার চলমান দৃশ্য দেখছে। আমাকে সে দেখতে পায়নি। কাজেই ইচ্ছে করলে আমি তাকে এড়িয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলানো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল।

পেছন থেকে গিয়ে ডাকলাম : হ্যালো।

অনুরাধা চকিতে ফিরে তাকিয়ে আমায় দেখে হেসে ফেলল : আপনি! বাব্বা, আমি চমকে উঠছিলাম।

: কেন ?

: ভাবলাম কোন টেডি বয়-টয় হবে।

: আই সি। তা, সন্ধ্যাবেলায় এখানে যে ?

: কিছু নয়।—অনুরাধা বাঁ হাতে কোটের দুটো বোতাম আটকে দিল : বিকেলে একা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পায়ে পায়ে এখানে চলে এসেছি। এইবার ফিরব।

: বাসে যাবেন ?

: না, বাসে ভীষণ ভীড়। হেঁটেই ফিরব। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

: আমিও বাসার দিকে। চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

: চলুন। আজ আপনার বাসাটা দেখে যাই। ডুব মেরে বেশিদিন বাড়িতে বসে থাকলে এসে ধরে নিয়ে যাব।

আমরা পাশাপাশি উত্তরমুখো হাঁটতে লাগলাম। অনুরাধার সঙ্গলাভের লোভে যেচে গিয়ে তাকে পাকড়াও করলেও বহুক্ষণ কোন কথা খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ ওর সেই গল্পটার কথা মনে পড়ল।

: আপনার গল্পটা পড়েছি।

: পড়েছেন ? একদম বাজে হয়েছে। তাই না ?—আমার মুখের দিকে তাকাল সে।

: কই, না। আমার তো খারাপ লাগেনি।

: ও আপনি আমার মন রাখবার জন্য বলছেন।

: না, না।

অনুরাধা খিলখিল করে হেসে উঠল : থাক, ও অধ্যায়ের এখানেই শেষ হোক।

: কেন?

: কারণ গল্প-লেখক হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। একদিন দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ ওটা লিখে ফেলেছিলাম, আর একদিন দুর্বল মুহূর্তে আপনাকে ওটা দেখতে দিয়েছিলাম। এখন যদি আর এক দুর্বল মুহূর্তে আপনার কথা শুনে নিশ্চিত হই যে, সত্যিই গল্পটা উতরে গেছে তাহলে অন্য এক দুর্বল মুহূর্তে লজ্জায় আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

: সে কি!—ওর কথা বলার ভঙ্গি শুনে আমি হেসে ফেললাম।

: হ্যাঁ, সত্যি। জানেন অশোকবাবু, গল্প লেখার মত আমি আরও অনেক কিছুতেই হাত লাগিয়েছি। কোথাও সুবিধা করতে পারিনি।

: কি রকম?

: এই ধরুন গান, সেতার, কবিতা—হোয়াট নট?

: কোনটায় কতখানি এগিয়ে থামলেন?

: গান আর সেতারটা পার্কসার্কাসের বাসা ছাড়ার পর আর চর্চা করার অবকাশ পাইনি। কবিতা শুরু করেছিলাম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে, শেষ করেছি বি-এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর।

: শেষ করলেন কেন?

: কারণ কবিতাগুলো কবিতা না হয়ে পদ্য হয়ে যাচ্ছিল।

: কবিতা পদ্য হবে না তো কি গল্প পদ্য হবে? আপনার কবিতাগুলো আমায় পড়তে দেবেন।

: সে সব আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

: কেন?

: কয়েকটা কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছিলাম। ছাপাও হল না, ফেরতও এল না। বুঝতে পারলাম, পত্রিকায় ছাপার উপযুক্ত কবিতা লিখতে পারিনি। আজকাল গদ্য কবিতার যুগ চলছে। স্বভাবতই আমার মেলানো কবিতাগুলো ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছে। তারপর কিছুকাল গদ্য

কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম। সুবিধা হল না। লিখতে গেলেই মিলে যায়। তখন দুত্তোর বলে দিলাম সব উনোনে ঢেলে।

: আপনি দেখছি, সত্যিই আত্মহত্যা করতে পারেন।

: কি করে বুঝলেন?

: শুনেছি, মানুষ সব চেয়ে বেশি ভালবাসে তার সন্তানকে। নিজের লেখা সে তো সন্তানের মতই। তাকে যে নির্বিকার চিত্তে আগুনে তুলে দিতে পারে, সে নিজেকেও আনায়াসে দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে পারে।

: ওহ্ নো, প্লিজ। তুলনাটা আমার পক্ষে বড় নির্মম হচ্ছে অশোকবাবু। Let us talk something else।

আমি হাসতে হাসতে বললাম: ঠিক আছে। এই হল আমাদের বাসা। দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাট। আর ঐ হল আমার হোটেল। এখন কি খাবেন বলুন। চা? কফি? কোকো?

অনুরাধা বাড়িটার আগামাথা চোখ বুলিয়ে বলল: বেশ বড় ম্যানসন দেখছি।

: বাড়িটা বড়, ফ্ল্যাটগুলো ছোট ছোট। এই হল মেন গেট। ভিতরে ঢুকে ডানদিকে সিঁড়ি। হ্যাঁ, তাহলে কফি বলে দিচ্ছি।

: কি দরকার? দু-চার মিনিট বসেই চলে যাব।

: এক পেয়ালা কফি খেতে দু-চার মিনিটের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না।

হোটেলের ম্যানেজারকে কফির অর্ডার দিয়ে অনুরাধাকে সঙ্গে করে দোতলায় উঠে ঘরের দরজা খুলে বললাম: আসুন।

অনুরাধা চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে ভিতরে ঢুকে বলল: ফ্ল্যাটটা বেশ কমপ্যাক্ট। আপনার তো ফার্নিচারও অনেক রয়েছে দেখছি।

: আমার নয়। যাঁর ফ্ল্যাটে বাস করছি, ওগুলো তাঁর। আমি পাহারা দিচ্ছি।

: কি রকম?

বাড়ির ব্যবস্থাটা সব খুলে বললাম। অনুরাধা টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে চুলের আলগা পিনগুলো ভাল করে এঁটে দিতে লাগল। আমি তার মুখোমুখি খাটের উপর গিয়ে বসলাম।

: তাহলে আপনি একদিনকা সুলতানের মত তিন বছরের ফ্ল্যাটওয়ালা ?—অনুরাধা হাসতে লাগল : তিন বছর বাদে কি করবেন ?

: তিন বছরের আগেই কিছু একটা করে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

: আচ্ছা অশোকবাবু, অমলদা আপনাকে চিঠি লেখে না ?

: আমাকে ? নাঃ। কেন ?

: এমনিই জানতে চাইলাম। আমাদের কাছেও কোন চিঠি লেখে না। —গম্ভীর গলায় বলল অনুরাধা। আমি কোন মন্তব্য করলাম না।

: কলকাতার বীর বাহাদুর বল্টু মজুমদারের কাছে কলকাতাটা হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল কেন বলতে পারেন অশোকবাবু ?

'অমলদা' ব্যঙ্গের সুরে বল্টু মজুমদার হয়ে উঠলেও প্রশ্নটার মধ্যে আন্তরিক জিজ্ঞাসা আছে তা বুঝতে কষ্ট হল না।

বললাম : সঠিক কারণটা আমার পক্ষে বলা শক্ত, তবে ভদ্রলোক যখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সহরটা তাঁর ভাল লাগছিল না।

: এমনও তো হতে পারে যে সহরে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। —গোয়েন্দার মত প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: কি রকম ?

: ধরুন কোন সিরিয়াস ক্রাইমের—

: ওহো, আপনি বেশ অবসেসনে ভুগছেন। আমি যতদূর জানি, গত এক বছরের মধ্যে বল্টুবাবু কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

: কি করে জানলেন ? আপনি তো তার তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন।

: তা নই বটে, তবে কিছুকাল ধরে তাঁর উপর আমার দৃষ্টি রয়েছে তো। কোন অন্যায় কাজ করলে বুঝতে পারতাম।

অনুরাধা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল : তাহলে হঠাৎ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন ?

বললাম : পৃথিবীতে কেউই বেশিদিন পেছিয়ে পড়ে থাকতে চায় না।

: তাহলে একি তার এগোবার আয়োজন ?

: নিশ্চয়ই।

: এগোবার ইচ্ছা থাকলেই কি এগোনো যায় ?

: ইচ্ছা থাকলে যায় কি না বলা শক্ত, তবে চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই যায়। সামনে এগোতে হলে আগে পেছনের টান আলগা করে নেওয়া চাই।

: আপনি কি মনে করেন, অমলবাবুর পেছনের টান আলগা হয়েছে?

: হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

: বিশেষ ক্ষেত্রে হয়েছে কি না সেইটাই আমার প্রশ্ন।

: হয়েছে বলেই তো আমি মনে করি।

: আপনার এমন মনে করার হেতু?

: পাটনা যাবার আগে অমলবাবু সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা করেছিলেন।—অসতর্ক মুহূর্তে গোপন কথাটা প্রকাশ করে ফেললাম।

: তাই নাকি?—অনুরাধা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা টেনে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এসে বসে বলল: আপনাকে কি বলেছে বলুন দেখি?

: তেমন কিছু নয়। এতদিনকার জীবনে তাঁর অশ্রদ্ধা এসে গেছে। পরিবর্তন চান। কলকাতায় থাকলে সেটা সম্ভব হবে না বলে বাইরে চলে গেছেন। সুতরাং এর মধ্যে 'মতলব' 'চক্রান্ত' ইত্যাদি খুঁজতে গেলে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না।

অনুরাধা জিভ কেটে লজ্জিতভাবে বলল: না না ছিঃ, আমি ওগুলো ঠাট্টা করে বলি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

হোটেল থেকে কফি আর পেস্ট্রি দিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুরাধা ভীষণ গম্ভীর হয়ে রইল। বুঝলাম, আমার শ্লেষটা ওর গায়ে লেগেছে। কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। শ্লেষটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আপনিই। আমি ওকে কোন আঘাত দিতে চাইনি।

: না না, আপনাকে ভুল বুঝব কেন? I just made a fun। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, বল্টুবাবু অনেক দিন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে দেখলেন ওতে সুখও নেই, শান্তিও নেই। তাই এবার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

: না, বিস্ময় নয়।—অন্যমনস্কভাবে বলল অনুরাধা: আমার বরং ভয়—মানে—

: ভয়! ভয় কিসের?

অনুরাধা মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলল : মানুষের মন চঞ্চল। শুভ বুদ্ধি কতদিন স্থায়ী হবে কে বলতে পারে?

একটু ভেবে বললাম : আমি যতদূর বুঝেছি, এ ভয় অমূলক। অনেকদিন ধরে অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে যে ভালমন্দ বুঝতে শেখে তার সিদ্ধান্ত খুব দৃঢ় হয়।

: তাহলে কি এবার "দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর?"—অনুরাধা অনেকক্ষণ বাদে সহজ কৌতুকের সুরে কথা বলল।

: উঁহু—"এবার ফিরাও মোরে।"

আমরা দুজনেই হাসলাম।

: যাই বলুন, ব্যাপারটা খুব নাটকীয়।—বলল অনুরাধা।

বললাম : নাটক তো জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। উল্টো করে বললে, জীবনটাই নাটক।

: এখানে আপনার ভূমিকা কি বিবেকের?

: কি রকম?

: শুনেছি যাত্রার দলে বিবেক বলে একটা চরিত্র থাকে। তাঁর কাজ হচ্ছে গানের মধ্যে দিয়ে সু এবং কু সম্বন্ধে পাত্রপাত্রী এবং দর্শকদের সচেতন করে দেওয়া। যে লোকটাকে এতকাল এত চেষ্টা করেও শোধরানো যায়নি, আপনার সঙ্গে আলাপ হতে না হতে সে শুধরে গেল—

আমি একটু জোরে হেসে উঠলাম : আজ্ঞে না, আমি এখানে বিবেক নই। নিছক দর্শক। তাঁকে ভালমন্দের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা আমার দিক থেকে কখনও হয়নি কারণ ততখানি ঘনিষ্ঠতা আমার সঙ্গে ছিল না। ব্যাপারটা কাকতালীয়।

: মানে?

: একটা কাক একটা তালগাছের পাতায় যেই না এসে বসেছে, অমনি গাছ থেকে একটা তাল খসে পড়ল। তাতে একদল লোক ভাবল, কাক এসে বসার ফলেই তালটা পড়েছে। কিন্তু আসলে দুটোর সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না।

: ছিল না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

: তা হয়তো যায় না। তবে একথা বেশ বলা যায় যে তালগাছে কাক এসে বসবে সারা বছরই কিন্তু ভাদ্র মাসের আগে গাছ থেকে তাল খসবে না।

: কেন ?

: কারণ ঐ সময় তাল পাকবে এবং তাতে তার বোঁটার আকর্ষণের চেয়ে মাধ্যাকর্ষণের জোর বেশি হবে। অবশ্য আপনি যদি মনে করেন, আমার জন্যই অমলবাবু বদলে গেলেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। দয়া করে অমলবাবুকেও সেটা বুঝিয়ে দেবেন। ফাঁকতালে নিজের সুনাম বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

অনুরাধা কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাসিমুখে বলল : আপনার তো এমনিই অনেক সুনাম—আরও চাই ? বাব্বা, খুব নামের কাঙাল তো !

: আমার মোটেই সুনাম নেই। থাক, আমার সম্বন্ধে আর কিছু নয়। হ্যাঁ, কফিটা কেমন লাগছে ? হোটেলটা খারাপ নয়। কি বলুন ?

অনুরাধা অন্যমনস্কভাবে বলল : মন্দ নয়। আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, অমলবাবু একেবারে বদলে যেতে পারে ?

: এ তো ভূত ভগবানের ব্যাপার নয় যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠবে। বদলে যাবে কি যাবে না, অথবা কতটুকু বদলাতে পারে, সে সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ইতিহাসে বদলাবার নজির কিছু কম নেই।

: মায়ের চিরকালই ধারণা, অমলদার মধ্যে একটা গ্রেটনেস আছে। সেটা কি নিছক মায়ের আত্মতুষ্টি ?

: তাও বলতে পারব না। আপনি অমলবাবুর সম্বন্ধে এখনই এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন ? আরও কিছুকাল অপেক্ষা করলে নিজেই তার পরিবর্তন দেখবার সুযোগ পাবেন। চিরকাল সে কি আর আপনাদের চোখের আড়ালে থাকবে ?

অনুরাধার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। মাথা হেঁট করে সে কাপড়ের আঁচল খুঁটতে লাগল। হঠাৎ কেন যে এমন অপ্রতিভ হয়ে গেল বুঝলাম না। আমি পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বাললাম।

: জানেন অশোকবাবু, এর মধ্যে আমার একটা ব্যক্তিগত ট্রাজেডি আছে। —তার গলায় বেশ একটা আত্মবিলাপের সুর।

: ট্রাজেডি ? আপনার ? কি রকম ?

: লোকটাকে বদলাবার জন্য আমি গত তিন বছর ধরে কত চেষ্টা করেছি কিন্তু এতটুকু নরম করতে পারিনি। মনে মনে একটা অহংকার পুষছিলাম,

আমার একটা ষ্ট্রং পার্সোনালিটি আছে। এখন দেখছি, সেটা একেবারে ভিত্তিহীন। খুব ঘনিষ্ঠ লোকের উপরও আমার কোন প্রভাব নেই।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম : ঠিক তা নয়। আপনার তিরস্কারের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব অমলবাবুকে দুর্বল করে ফেলছিল বই কি।

: কি করে জানলেন ?—অনুরাধা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

: তার কথাবার্তায় টের পেয়েছি।

: সত্যি ?—তার মুখে একটা. করুণ হাসি ফুটে উঠল : কি বলেছে আপনাকে ?

: বলেছিল, সকলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞা কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

: কিন্তু সেটা তো রাগের কথা অশোকবাবু।—আবার নরম হয়ে গেল অনুরাধা।

: রাগ হলেই বা ক্ষতি কি। কারও উপর রাগ করে কেউ যদি খারাপ থেকে ভাল হয়, তাতে আর লোকসান কোথায় ?

: তা ঠিক। আমাদের উপর রাগ করে অমলবাবু যদি স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ফিরে আসে—সেই ভাল। তবে কি জানেন, আমাকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমার অনেক নিন্দামন্দ করে গেছে ?

যতদুর মনে পড়ে, নিন্দা করেছে। কিন্তু সেটা শ্রুতিকটু হবে বলে আমি আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। বললাম : নাঃ, আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেনি। আর আপনাকে তার ক্ষমা করার প্রশ্নই বা উঠছে কিসে ?

: আমি দিনের পর দিন তাকে যেভাবে আঘাত করেছি, তাতে যে কোন লোকই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। সেইজন্যই তো যাবার দিন আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। মাঝে মাঝে তাই মনটায় কেমন লাগে।

সেটা আমিও বুঝতে পারি। বল্টু পৃথিবীতে অনেক মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে কিন্তু সরকার পরিবারে সে এসেছিল দেবতার আশীর্বাদের মত। ওদের সে পরম উপকার করে গেছে। তাই তার সম্বন্ধে ওদের একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো তার সম্বন্ধে বেশি দায়িত্ব বোধ করেই তাকে আঘাত দিয়ে দিয়ে ভাল করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বল্টু সেটাকে আঘাত হিসাবেই গ্রহণ করেছে। আঘাতকারীর মনে কি ছিল, তা

সে তলিয়ে দেখবার অবকাশ পায়নি। আজ তাই পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আঘাত বুমেরাংয়ের মত আঘাতকারীকেই পাল্টা আঘাত দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? নিজের রূঢ় আচরণের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে অনুরাধা তার মানবিক মহানুভবতাই প্রকাশ করেছে। ওর মনের ঐশ্বর্য বাইরের চাকচিক্যের মতই মনোরম। ভাবলাম বল্টুর ভাল হওয়া যখন ওর এতখানি কাম্য, তখন বল্টু ভাল হোক—ভাল হোক। মনে মনে আমি সহস্রবার তার মঙ্গল কামনা করলাম।

: আমাকে ক্ষমা করুক আর না করুক, সে যদি সত্যিই ভাল হয়ে যায়, তাহলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না—এটুকু জানবেন।

: জানি।—বললাম আমি : আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অমলবাবু এবার বদলে যাবেই। সেটা একেবারে Fait accompli।

: আমি এতকাল যা চেয়েছি, এবার সে তাই হতে চলেছে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে আমি আর কেউ নই।—ঠোঁট দুটো চেপে গালে কয়েকটা সুন্দর রেখা ফেলে একটা অসহায়ভাব প্রকাশ করল অনুরাধা। গলার স্বরটা এত করুণ লাগল যে আমি তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে পারলাম না।

: আরে দূর! মান-অভিমান রাগ বিদ্বেষের চেয়ে জীবন অনেক বড়, মিস —আই মিন, হ্যাঁ। জীবন অনেক বড়। দেখবেন, ওসব পুরানো কথা কারো মনেই থাকবে না।

অনুরাধা হাসতে হাসতে বলল : আপনি খুব আশাবাদী।

কথাটা সত্য কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রশংসাটা যখন সেই দিক থেকেই এল তখন চুপচাপ মেনে নেওয়াই ভাল। হঠাৎ অনুরাধা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল।

: আরে বাব্বা, গল্পে গল্পে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। মা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন। এবার চলি।

: চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।—আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

: ধন্যবাদ। আপনাকে আজ খুব বিব্রত করলাম।—কৌতুকের সুরে বলল অনুরাধা।

: হ্যাঁ, এতদিন আমি একতরফা আপনাদের বিব্রত করছি তো!

অনুরাধা হাসতে হাসতে বলল : ওঃ, আপনি এত তাড়াতাড়ি রিঅ্যাক্ট করেন যে আপনাকে ম্যানেজ করাই মুস্কিল।

রাস্তায় নেমে আমি বললাম : আমাকে ম্যানেজ করতে লাগে না। আমি এমনিই ম্যানেজ্‌ড হয়ে থাকি।

: ইস্।—মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গি করল অনুরাধা।

পথে আর বিশেষ কথাবার্তা হল না। তাদের গলির মোড়ে পৌঁছে আমি বললাম : এবার ফিরি।

: কেন, আমাদের বাসায় আসবেন না?—অনুরাধা অনুনয় করল।

: আজ থাক।

: তাহলে কবে আসবেন?

: সামনের রবিবারে আসবার চেষ্টা করব।

: মনে থাকবে তো?

: থাকবে।

: ধন্যবাদ।

ফেরার পথে মনটা বেশ খুঁতখুঁত করতে লাগল। এতদিন ভাবছিলাম, অনুরাধার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের প্রেমের পথটাকে আরও ছোট করে আনব কিন্তু সে পথে আজ পদক্ষেপই করা যায়নি। বণ্টুকে নিয়ে সারাক্ষণ অনুরাধা এমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিল যে ও ধরনের কোন প্রসঙ্গে যাওয়ার কোন অবকাশই মেলেনি। ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক যে তা নিয়ে কোন অভিযোগ পোষণ করা যায় না। ওদের জীবনে বণ্টুর ভূমিকা যে-রকম গুরুত্বপূর্ণ তাতে তার সম্বন্ধে সব সময়ই ওরা ভাবপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। তবু অনুরাধা যদি কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার সম্বন্ধেও একটু ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করত তাহলে আমি খুব খুশি হতাম। বলতে বাধা নেই, মনে মনে আমি একটু অভিমান বোধ করতে লাগলাম।

পরের রবিবারে ওদের বাসায় যাবার কথা আছে। ভাবলাম, নাই বা গেলাম। আমার যাওয়া না-যাওয়ার ব্যাপারটা যখন অনুরাধার কাছে নিছক একটা সামাজিক ভব্যতার প্রশ্ন, তখন আমিই বা তার সম্বন্ধে অত কাতর হয়ে উঠব কেন? নিজের আসক্তি সম্বন্ধেও কিছুটা দার্শনিক অনাসক্তি রাখা ভাল।

কিন্তু নিজের মনের জোর পরীক্ষা করার সুযোগটা আর পাওয়া গেল না। শুক্রবার সন্ধ্যার পর বাসায় পৌছতে না পৌছতে দারোয়ান এসে হাজির।

: সেলাম হুজুর।

: সেলাম। বাত কেয়া হায় ভাই?

শার্টের পকেট থেকে একখানা ভাজ-করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে দারোয়ান বলল: সামকো বখ্‌ত্‌ এক আওরাত আপকো তালাসমে আয়ী থী। মায় নে কহা, বাবুজি আভিতক লওটা নেহি, তো ফির উনহোনে এক কাগজ লী ঔর এহি খত লিখকর আপকো লিয়ে ছোড় গয়ী।

: আওরাত?—চিঠিটা নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

: জি।

: ঠিক হায়, মায় দেখতা হুঁ।

ভাঁজ খুলে দেখি অনুরাধার লেখা—

অশোকবাবু,

চিঠি পেয়েই চলে আসুন। দারুণ সুখবর আছে। সন্ধ্যায় এখানেই খাবেন।—অনুরাধা।

চিঠি পড়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, কি সুখবর শোনাবে অনুরাধা? তার পরীক্ষার এখনও দেরি আছে। কাজেই পাস করার সংবাদ নিশ্চয়ই নয়। মায়ের খবর ভাল—সে তো আমি দেখেই এসেছিলাম। বাড়িতে আর কি সুসংবাদ তৈরি হতে পারে? বল্টু কলকাতায় এসেছে নাকি? বোধ হয় তাই হবে। কিংবা বল্টু হয়তো এতদিন বাদে চিঠি লিখেছে। বল্টুর সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কিছু কম নয়। সে যদি এসে থাকে অথবা চিঠি লিখে থাকে তাহলে ঘটনাটা আমার পক্ষেও যথেষ্ট কৌতূহলজনক।

তাড়াতাড়ি নিজেকে ধোয়ামোছা করে পোশাক বদলে সাড়ে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। অনুরাধা আজ যেমন হাসিখুশি আর তেমনি সুসজ্জিত। কিন্তু তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য মিসেস সরকারের স্থানবদল। তিনি অনুরাধার পড়ার ঘরে ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন। তার মুখের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। ঘরে ঢুকতেই তিনি কেমন একটা উচ্ছল স্বরে আমাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর সামনে একটা ফোল্ডিং চেয়ার। সেটার উপর বসলাম আমি। অনুরাধা মায়ের

পেছনে ইজিচেয়ারের দু দিকে দুটো হাত দিয়ে আমার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

: জানেন অশোকবাবু, এইমাত্র আপনাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে একটা বাজি হয়ে গেল।

: কি রকম ?

: মা বলছিলেন, আপনি আসবেন না। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আসবেন।

: বাজিটা তাহলে আপনিই জিতেছেন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমার আসা সম্বন্ধে আপনি এত সুনিশ্চিত হলেন কি করে? জ্যোতিষ-চর্চার অভ্যাস আছে নাকি ?

: উহুঁ।—চোখেমুখে একটা ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল অনুরাধা।

: তবে ?

: Intuition।

মিসেস সরকার হাসতে লাগলেন।

: Intuition, অর্থাৎ ?—আমি কিছুটা বেকুবের মত প্রশ্ন করলাম।

: অর্থাৎ Intuition। বাঙলায় সহজাত-বোধি বলতে পারেন।—অনুরাধা দুর্বিনীতের স্বরে জবাব দিল। তার অর্থপূর্ণ চাপা হাসিটা আমার দৃষ্টি এড়াল না। কেন জানি না, আমি একটু নার্ভাস বোধ করলাম।

মিসেস সরকার বললেন: মেয়ের বয়স বাড়ছে, তবু ছেলেমানুষী যাচ্ছে না। তোমায় কেন আসতে লিখেছে জান ?

: কেন বলুন তো ?

: আমার শরীরটা অনেক দিন ধরে বেশ ভাল যাচ্ছিল। আজ সকালে বিছানা থেকে উঠে দেখি, বেশ হাঁটতে পারছি। সাহস বেড়ে গেল। হেঁটে হেঁটেই এ ঘরে চলে এলাম। তাই দেখে মেয়ে একেবারে আনন্দে নেচে উঠেছে। বাড়িশুদ্ধ লোককে ডেকে মাকে দেখিয়েছে। এইবার তোমার পালা। তোমাকে না দেখানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিল না।

: আপনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন! সত্যিই তো বড় সুখবর।—আমি উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ না করে পারলাম না: এই খবরটার জন্য অনুরাধা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের অধিকারী।

: শুধু হাঁটা নয়, ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, একমাসের মধ্যে মা স্বাভাবিকভাবে রাস্তাঘাটেও চলেফিরে বেড়াতে পারবেন।—বলল অনুরাধা।

: চমৎকার। শুনে সত্যিই বড় খুশি হলাম।

: মা, একটু হাঁট না, অশোকবাবু দেখুন।—পেছন থেকে দুই হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে গালে গাল দিয়ে আবদার করল অনুরাধা। মায়ের অসুখ সেরে যাওয়ায় সে যে সত্যিই আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার আবদার, ছেলেমানুষী এবং অশান্ত আচরণ আমার বেশ ভাল লাগছিল।

মিসেস সরকার পরিহাসের সুরে বললেন: আমি কি সার্কাসের হাতি যে সকলের সামনেই একবার করে হেঁটে দেখাতে হবে যে আমি দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারি।

: কিছু মনে করবেন না।—বললাম আমি: আমারও ইচ্ছে করছে আপনাকে হাঁটা অবস্থায় দেখতে। অবশ্য যদি কষ্ট না হয়।

মিসেস সরকারও নিশ্চয়ই মনে মনে হেঁটে দেখাবার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট পা ফেলে ঘরের একদিক থেকে আর একদিকে আনাগোনা করতে লাগলেন।

অনুরাধা হাততালি দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল: Mother is really wonderful।—মিসেস সরকার তার পিঠে হাত দিয়ে একটু আদর করে আবার এসে বসলেন আমার সামনে। মেয়ের চেয়ে মায়ের উচ্ছ্বাস যে কম নয়, সেটা বুঝতে পারলাম।

: সত্যিই আজ বড় আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে প্রতিদিন কামনা করেছি, আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।

: ধন্যবাদ। তোমাদের সকলের সদিচ্ছাই আমাকে ভাল করে তুলেছে। আহা, আজ অমল থাকলে তারও বড় আনন্দ হত। আমার এই জীবনটার জন্য তার কাছেই আমি ঋণী।

ঘরের সকলেই কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল। আজকের দিনে বল্টুর অনুপস্থিতি সত্যিই যে বড় আফশোসের ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখলাম, মায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার হাসিখুশি মুখখানাও অন্ধকার হয়ে গেছে।

: তাকে একটা চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে দিলে হয়।

: ঠিকানা জানেন ?—গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল অনুরাধা।

: না জানি না। তবে প্রয়োজন হলে তার দাদাদের কাছ থেকে জেনে আসতে পারি।

: দাদারা আপনাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।

: কেন?

: সে যে ত্যাজ্যভ্রাতা। তাও জানেন না?

: মানে?

: মানে বাবারা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, ওর দাদারা তেমনি ছোট ভাইকে ত্যাজ্যভ্রাতা করেছেন।—বাঁকা স্বরে বলল অনুরাধা।

: না, এ খবর আমার জানা ছিল না। অমলবাবু তো কই কোনদিন তেমন কথা বলেন নি।

: আঃ অনু, কি যা তা বলছ অশোককে।—মিসেস সরকার মেয়েকে মৃদু ভৎর্সনা করলেন।

অনুরাধা মায়ের কথায় কান না দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল: দাদারা ত্যাগ না করলে ছোট ভাই কখনও দাঙ্গা-গুণ্ডামী করে জীবন কাটাতে পারে?

এতক্ষণে আমি অনুরাধার ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের আসল লক্ষ্য খুঁজে পেলাম। আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগটা খুবই স্বাভাবিক। বল্টু নিজেই আমাকে বলেছে, দাদারা তাকে দাঙ্গার সময় একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তা না দিয়েই বা উপায় কি ছিল? সাবালক ভাইয়ের উপর চোখ রাঙাতে গেলে উল্টো মার খেতে কতক্ষণ! তাছাড়া যে ভাই মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকে তার সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্বমুক্ত করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। নইলে ঝুটঝামেলা পোহাতে হয়। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বল্টুর দাদাদের বিরুদ্ধে অনুরাধার এই ক্ষোভের সত্যিই কোন কারণ থাকতে পারে না। বর্তমান যুগে মানুষ নিজেকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তার উপর অমন ভাইকে সামলানো কি সহজ কথা!

বললাম: ভাইকে ত্যাজ্য করলেও ভাইয়ের ঠিকানাটা বলতে আপত্তি কিসের?

: না, আপনি সেখানে যাবেন না। কি দরকার? অমলবাবুর দলের লোক মনে করে আপনাকে তাঁরা অপমানও তো করতে পারেন। অমলবাবু চিরকাল পাটনায় থাকবেন না। একদিন না একদিন কাজকর্মে তাঁকে

কলকাতায় আসতেই হবে। মায়ের খবর তখনই জানতে পারবেন। এমন তো নয় যে মায়ের খবর শোনবার জন্যে তিনি একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। সুতরাং এত ব্যস্ততা কিসের?—ঝাঁঝের সঙ্গে বলল অনুরাধা।

আমি চুপ করে রইলাম। মিসেস সরকার আপত্তির সুরে বললেন: উদ্গ্রীব হয়ে আছে বই কি। আমি তো তার পর নই।

: তা বটে। বললাম আমি: আপনার উপর আপনার মেয়ের যতটুকু দাবি, তারও ততটুকু। হিসেবে তাই আসে।

: তা হতে পারে।—গম্ভীর গলায় জবাব দিল অনুরাধা: তবে এতদিন কলকাতা ছেড়েছেন, কই একখানা চিঠি লিখেও তো মায়ের খবর নেননি।

: এ অনুযোগ অর্থহীন।—বললেন মিসেস সরকার: চিঠিপত্র লেখা অভ্যাসের জিনিস। সকলে ওটায় রপ্ত হয় না। কই, আমরাও তো তার খোঁজখবর করি না।

: কি করে করব? আমরা কি তার ঠিকানা জানি? আর চিঠি লিখলে জবাব দেবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

: ঠিকানা জানি না সেটা তার দোষ নয়। যাবার দিন ঠিকানাটা চেয়ে নিলেই হত। আমার শরীর খারাপ। সব কথা সব সময় মনে থাকে না। তুমি কেন ঠিকানাটা রেখে দিলে না?

: ঠিকানা চাইব? বাব্বা, তাহলে বোধহয় দুই-একটা চড়চাপড় খেতে হত। আমার উপর কি রকম রেগে ছিলেন দেখনি। তাছাড়া, উনি যে সত্যিই স্থায়ীভাবে পাটনায় চলে যাচ্ছেন, তাই বা তখন কে জানত!

: তবে আর মিছিমিছি তার বিরুদ্ধে অনুযোগ করছ কেন?

আমি বললাম: ঠিক আছে। আমি তার ঠিকানা যোগাড় করে দেব।

: নো, নেভার।—দৃঢ়কণ্ঠে নিষেধ করল অনুরাধা: আপনি কিছুতেই তার দাদাদের কাছে যেতে পারবেন না। আপনার একটা মান-সম্মান নেই?

বললাম: অমলবাবুর উপর আপনি সঙ্গত কারণেই চটতে পারেন কিন্তু তার দাদাদের প্রতি আপনার বিরূপ মনোভাব পোষণের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁদের আপনি চেনেন না। যতদূর জানি, তাঁরা শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক।

: আমি তাঁদের চিনি না ঠিকই, তবে যতদূর বুঝি, তাঁরা শিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক হলেও স্বার্থপর এবং হৃদয়হীন।

: ছিঃ, ছিঃ অনু, You are going out of your way to condemn persons whom you do not know। অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অশিষ্ট কথা বলা অতি অভদ্রতা। বিশেষ করে, তাঁরাও তোমার দাদার মত। কিছু মনে কোরো না বাবা অশোক, মেয়েটা বড় ছেলেমানুষী করে। কইরে, অশোককে চা খাওয়াবার নাম করে ডেকে এনে তুই যে একেবারে পরনিন্দায় মেতে উঠলি! সাড়ে আটটা বাজতে চলল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার মুখের অন্ধকার ভাবটা কেটে গেল।

: এক্সকিউজ মি অশোকবাবু, একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।—চক্ষের পলকে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিসেস সরকার বললেন: পাগলী মেয়ে! কখন যে কি বলে খেয়াল থাকে না। যাবার সময় অমল ওর সঙ্গে কথা বলেনি, সেই রাগে গুমরে মরছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।

: না, এতে আর মনে করার কি আছে।

: তা বাবা, অমলেরও খুব দোষ নেই। ওকি তার সঙ্গে কম দুর্ব্যবহার করেছে? যতদিন মেয়ে স্কুলে পড়ত ততদিন দুটিতে খুব আপন-আপন ভাব ছিল। কলেজে ঢোকার পর থেকে সেই যে মেয়ের মাথায় অমলকে ভাল করার ঝোঁক চাপল, তাতেই হল মনোমালিন্যের সূত্রপাত। আমি অনেক বুঝিয়েছি যে আঘাত দিয়ে সব সময় মন্দকে ভাল করা যায় না। কিন্তু ওরও জেদ চেপে গেছে। আমার কথা কানে তুলল না।

আমি হাসতে লাগলাম।

: কিন্তু বাবা, সেটা অনুর বাইরের রূপ। মনে মনে ও অমলের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী। ওর ধারণা, অমলের দাদারা ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি বলেই ছেলেটা বদসঙ্গে মিশে বয়ে গেছে। তাই ও তাঁদের ক্ষমা করতে পারে না। আসলে এটা ওর অভিমান। অমলের দাদাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে নাকি?

: আজ্ঞে না।—বললাম আমি: তবে দরকার পড়লে আলাপ করে নিতে পারি। আপনি কি তাকে চিঠি লিখতে চান?

মিসেস সরকার অনেকক্ষণ ভেবে বললেন: কটা দিন না হয় থাক—মেয়ের যখন এত আপত্তি। মনে হয়, শীগগিরই ও কলকাতায় আসবে। পাটনায় গেছে সে তো কম দিন নয়।

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস সরকার বললেন : জান বাবা, আজ সকালে ডাক্তার এসে যখন বললেন, আবার আমি স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় হাঁটা-চলা করতে পারব, তখন বুক থেকে যেন একটা পাহাড় নেমে গেল। ভাবনায় চিন্তায় প্রাণটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছিল।

: কেন ?

: তোমার কাছে আর লুকোব কি, তুমি আমার ছেলের মত। আয় তো কিছু নেই, শুধু ব্যয়। ফুটো কলসিতে আর কতদিন জল ধরে রাখা যাবে ? রাজার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাচ্ছে আর আমার তো সামান্য পুঁজি। তাছাড়া মেয়েটাও বড় হয়েছে। দুদিন বাদে বিয়েথা করে স্বামীর সংসার সামলাতে যাবে। তখন আমার মত অথর্ব মানুষকে আগলাবে কে ? শরীরটা সেরে উঠলে তবু একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে বাকী জীবনটা একরকম কাটিয়ে দিতে পারব।

কথাটা ঠিকই। জীবনযাত্রার ব্যয় যে রকম লাফে লাফে বেড়ে যাচ্ছে তাতে মিসেস সরকারের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য হতে বেশি দেরি লাগবে না। আর মেয়ের বিয়ে হওয়ায় সে অন্য পরিবারের লোক হয়ে যায়। তার উপর মা বাবার দাবি ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে। সে অবস্থায় শয্যাশায়ী মিসেস সরকারের পক্ষে একা একা জীবন কাটানো কঠিন বই কি !

অনুরাধার বিয়ে ? কার সঙ্গে ? মনটা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। মিসেস সরকার আজ এ প্রসঙ্গ তুললেন কেন ? কোনো পাত্রটাত্র ঠিক আছে নাকি ?

: মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে বুঝি ?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে ফেললাম।

মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বললেন : না, কথাবার্তা কিছু হয়নি। মেয়ের বিয়ে কি সোজা কথা বাবা ? সক্ষম বাপ-মা পর্যন্ত কন্যাদায়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আর আমি তো বিধবা অসুস্থ আত্মীয়-বান্ধবহীন মা। দুদিন বাদে প্রশ্নটা আসবে, তাই বললাম।

: তা বটে !

: মেয়ের বিয়ে নিতান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।—বললেন মিসেস সরকার। : ও ব্যাপারে নিজে যতখানি স্বাধীনতা নিয়েছি, মেয়েরও ততখানি

স্বাধীনতা রয়েছে। ও যদি নিজে পছন্দ করে কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাতে আমি কোন দিনই বাধা দেব না অথবা সে ছেলের ভালমন্দ নিয়েও কখনও কোন প্রশ্ন তুলব না। মেয়ের আত্মশক্তির উপর আমার পুরো আস্থা আছে। ভগবান যদি বিবাদী না হন, তাহলে মেয়ে আমার নিজের যোগ্যতায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ওকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয় কিন্তু আসলে ও খুব সিরিয়াস মেয়ে। যে ওকে বিয়ে করবে সে সত্যিই সুখী হবে। মনের প্রসারতায়, দায়িত্ববোধে, মায়া-মমতায় কোথাও ওর কোনো খুঁত নেই। তবে কি জান বাবা, নিজে পছন্দ করে বিয়ে করা খুব সহজ কাজ নয়। ও অনেকটা যোগাযোগের ব্যাপার। সেইটাই তো আমায় ভয়। মেয়ে যদি নিজের বিয়ের ভারটা নিজের হাতে না রেখে মনে মনে আমার উপরই চাপিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলেই আমি গেছি। আমার পক্ষে একটি সৎপাত্র সংগ্রহ করা কত কঠিন বল তো?

ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মিসেস সরকারের সমস্যাটাও আমি বুঝলাম। উনি নিজে নিজের পতি নির্বাচন করেছিলেন। জীবনে বিপর্যয় এসেছে বটে তবে দাম্পত্যজীবনে অসুখী হন নি। স্বভাবতই ঐ দিকেই ওঁর ঝোঁক বেশি। তাছাড়া অন্যরকম বিয়েতে কিছুটা অসুবিধাও বোধ হয় আছে। অনুরাধা অসবর্ণ বিবাহের সন্তান। সেটা ছোটখাট একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই জন্য উনি চান যে অনুরাধা তার মায়ের মত নিজের বিয়ের ব্যাপারটা নিজের দায়িত্বের মধ্যে রাখুক। ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুর মত প্রশ্নটার আলোচনা করলেন। আমি যে তাঁর কন্যার প্রেমিক অথবা কোনদিন তার পতিও হয়ে উঠতে পারি—এমন একটা সম্ভাবনার কথা তিনি কোনদিন ভুলেও চিন্তা করেছেন বলে মনে হল না। তাতে আমি মনে মনে কেমন হতাশা বোধ করতে লাগলাম। তাহলে কি আমাকে উনি অযোগ্য বলে মনে করেন? চিন্তাটা আমাকে বেশ একটু পীড়া দিতে লাগল। প্রশ্নটা যে আসলে অপ্রাসঙ্গিক—সে কথা তখন একবারও মনে হয়নি। একটু বাদেই ফিরে এল অনুরাধা। চা নয়, নৈশ-ভোজ। কাজেই ওঘর থেকে উঠে আমাকে খাবারঘরে গিয়ে ঢুকতে হল। পরিবেশন করল অনুরাধা এবং মিসেস সরকার আমার পাশে বসে তদারক করলেন। আমি এমন অন্যমনস্কভাবে খেতে লাগলাম যে, মিসেস সরকার বর্মাদেশের রান্নাবান্না সম্বন্ধে যে সব গল্প করলেন তা ঠিক সুসংবদ্ধভাবে আমার কানে ঢুকল না।

মাঝে মাঝে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে মন কেমন করে উঠতে লাগল। তাকে এত সুন্দর, এত উজ্জ্বল এবং এত রহস্যময় লাগছে যে বুকের ভেতরটা কেমন যেন টাটিয়ে উঠছে। আমার আবেগ যখনই কোনো গভীর সংবেদনায় অনুরণিত হয় তখনই বুকের মধ্যে একটা করুণ ট্রাজেডির সুর বাজে। বহুক্ষণ চোখ দুটো অনুরাধার গতিভঙ্গির উপর নিবদ্ধ করে রাখলাম। কি জানি কেন, আমার মনে হতে লাগল, অনুরাধা আমার ধরা-ছোঁয়ার অতীত নিছক একটা আইডিয়া। তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না শুধু স্বপ্নাবেশে দেখা যায়। ছুঁতে গেলে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য কণ্ঠে পরিহাসের হাসি হেসে উঠবে। এই অদ্ভুত ধারণাটা আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে পরের বার অনুরাধা মিষ্টির প্লেট দেবার জন্য আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে স্পর্শ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। প্লেটটা টেবিলের উপর নামাতেই আমি তার হাতখানা ধরে ফেললাম। অনুরাধা জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল আমার মুখের দিকে। আমার কোনো জবাব ছিল না। মিসেস সরকার আমায় উদ্ধার করলেন।

: আঙটির পাথরটা দেখছ? হ্যাঁ, ভারী চমৎকার দীপ্তি! এক জহুরীর কাছ থেকে অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিলেন ওর বাবা।

বুঝলাম হঠকারিতা করে ফেলেছি। আঙটির দিকে তাকিয়ে আমার বুক টিপ টিপ করতে লাগল। অনুরাধার হাতের উষ্ণ নরম কব্জি তখনও আমার বাঁ হাতের মুঠোয়। আবার অনুরাধার মুখের দিকে তাকালাম। এবার সে মুখ টিপে হাসছে। নার্ভাস হয়ে হাতটা তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলাম।

: হল দেখা? বাবা, আপনি যে জুয়েলারীতেও ইন্টারেস্টেড তা তো জানতাম না।—গলার স্বরটা পরিহাসের মত শোনাল। তাহলে কি অনুরাধার কাছে ধরা পড়ে গেছি?

: আপনি আজ একটু অন্যমনস্ক রয়েছেন অশোকবাবু।

: আমি? কই না।—মনে হল শেষের কথাটাও যেন অর্থপূর্ণ। যেন আমাকে ও মানসিক অস্থিরতা সম্বন্ধে সচেতন করে দেবার জন্য কথাটা উচ্চারণ করছে।

: তাহলে এত কম কথা বলছেন কেন? কারখানায় কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?

: না, কিছু হয়নি। আমাকে আবার অন্যমনস্ক দেখলেন কোথায়? আপনার আঙটিটা সত্যিই চমৎকার!

অনুরাধা নিজের হাতটা তার চোখের সামনে তুলে আঙটিটা দেখতে লাগল।

খাওয়া সেরে রাত নটায় যখন বিদায় চাইলাম, তখন অনুরাধা বলল: চলুন আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় আমি বললাম: আমি আসবই, সেটা আপনি সহজাত বোধি দিয়ে জানতেন। জিনিসটা এখনও বোধগম্য হচ্ছে না।

: জিনিসটা কমনসেন্স। আপনার প্রকৃতিটা আমি বেশ ভাল করেই জানি কিনা।

: আমার প্রকৃতি আপনি জানেন?

: হ্যাঁ জানি, আপনি অতিমাত্রায় ভদ্র অর্থাৎ ফর্মাল। আন্তরিকতা থাক বা না থাক, বাইরে ভদ্রতার নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাই আসবার অনুরোধ জানালে আপনি যে না এসে পারবেন না, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

: আমি ফর্মাল—

: হ্যাঁ।—অনুরাধা হাল্কা সুরে উচ্চারণ করল: নইলে আমাকে এতদিনেও 'তুমি' বলতে পারলেন না কেন?

: 'তুমি' বললে তুমি খুশি হবে?

অনুরাধা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল: খুশি হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নয়। আসল কথা, আপনি ঠিক আমাদের আপন-আপন ভাবতে পারেন না। শিষ্টাচারের আবরণে নিজেকে ঢেকে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন। মা বলেন, আপনার অহংকার নেই কিন্তু আমি জানি আপনি ভীষণ দাম্ভিক। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে পৃথক করে রাখেন। তাই ছোট বড় কারও সঙ্গে মিশতেই আপনার আপত্তি নেই অথচ সত্যি করে আপনি কারও সঙ্গেই মেশেন না। কেউ আপনার অন্তরঙ্গ নয়, কেউ আপনার আত্মীয় হয়ে ওঠে না।

কথাগুলো প্রশংসা নয়। কাজেই আমি হকচকিয়ে গেলাম। নিজের সম্বন্ধে সব মানুষই এক তরফা উঁচু ধারণা পোষণ করে। আমি তার ব্যতিক্রম নই। কিন্তু আমি এও জানি যে নিজের কাছে নিজের প্রকৃতির যে সব দোষ

অস্পষ্ট থাকে, বাইরের লোকের কাছে সেগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কিন্তু অনুরাধা আমাকে প্রায় ভণ্ডামীর দোষে দোষী করে ফেলেছে। হজম কর আমার পক্ষে একটু কঠিন। যাই হোক, আমি প্রতিবাদ করলাম না। বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। অনুরাধার অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে। নইলে এত বড় গলা করে বলছে কেন?

: ঠিক বলেছি কি-না?—হাসিমুখে হাল্কা সুরে প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: হতে পারে। কোনো মানুষই দোষত্রুটির অতীত নয় আর আমি তো অতি সামান্য মানুষ। আচ্ছা এবার চলি। আপনিও আসুন। শীতের রাত। রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে।

: রাগ করলেন নাকি?

: রাগ? কেন?

: ওইসব কথা বললাম বলে।

: ফুঃ, অত সহজে আমি রাগি না।

: রাগেন ঠিকই, তবে রাগ প্রকাশ করেন না। সেইটাই আপনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এবার আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেন নি।—অনুরাধা হেসে উঠল: তাই আবার আমায় 'আপনি' বললেন।

: সেটা রাগ নয়, অভ্যাস।

: সত্যি?

: সত্যি।

: আবার কবে আসবেন?

: যেদিন সময় পাব।

: কবে সময় পাবেন?

: নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

: রবিবারে আসবেন তো?

: চেষ্টা করব।

: অর্থাৎ আসবেন না।—মুখ ভার করল অনুরাধা।

: যদি কোনো কাজে আটকে না যাই তাহলে আসতে পারি।

: রবিবারে তো আপনার আসবার কথা ছিল।

: আজকে আসবার কথা ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে সব প্রোগ্রামই রদবদল হয়। দরকার পড়লে কালও আপনাদের বাসায় আসতে পারি।

অনুরাধা বহুক্ষণ মৌন থেকে শেষে নিরুৎসাহভাবে বলল : আচ্ছা আসুন।

আমি বাসার দিকে পা বাড়ালাম। মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। অনুরাধা যেভাবে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছে, তাতে মোটেই উৎসাহ বোধ করতে পারছি না। মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ-ব্যবহারে আন্তরিকতার চেয়ে লৌকিকতা বেশি? অনুরাধা এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল কোন্ সূত্র থেকে? আর আমি যে দাম্ভিক, সেটাই বা ও ধরল কি করে? কোন ব্যাপারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ করা তো আমার স্বভাব নয়।

অনেক ভেবে ভেবে শেষে মনে হল, অনুরাধার ধারণার মধ্যে সত্য আছে। লোকের কাছে আমি যে সব সময় উদার এবং মহানুভব হবার চেষ্টা করি, তার সবটুকু বোধ হয় আন্তরিক নয়। নিজের সেই দম্ভ বজায় রাখবার জন্য অনেক সময়ই মনোবাসনার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। চরিত্রের এই দ্বৈধতা ঢাকবার জন্য শিষ্টাচারকে প্রাধান্য না দিয়ে উপায় থাকে না। অর্থাৎ ফর্মালিটির আড়ালে আত্মগোপন করেই সাধারণত আমি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি। কিন্তু সেটাকে খারাপ ভাববার কি আছে? ভাল হবার চেষ্টায় আত্মপ্রবঞ্চনা করা অন্যায় নয় নিশ্চয়ই।

অনুরাধা যে অত্যন্ত চতুর মেয়ে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। তার অন্তর্দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। নইলে এত অল্প পরিচয়ে সে আমার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটায় নজর ফেলল কি করে? কিন্তু হঠাৎ সে আমার চরিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে গেল কেন? বেশ একটু ধাঁধাঁ লাগল। নিজের কথা বুঝতে আমার কষ্ট নেই। অনুরাধার প্রতি আমার আসক্তি আছে। তাকে নিয়ে মনে মনে আমি বিশ্লেষণ অথবা ভাঙাগড়া করতে পারি। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অনুরাধা? আমাকে সে ভালই দেখুক আর মন্দই দেখুক, একাগ্রভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে সেটা কিসের ইঙ্গিত?

ক্রমে ক্রমে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আজ অনুরাধার সাজসজ্জা, কথাবার্তা এবং চালচলনের মধ্যে কেমন যেন একটা হেঁয়ালীর আমেজ ছিল। দুর্বল মুহূর্তে আমি যে তার হাতখানা নিজের মুঠিতে তুলে নিয়েছিলাম, সেই স্মৃতি আমাকে লোভাতুর করে তুলতে লাগল। রবিবারে নিশ্চয়ই ওদের বাসায় যেতে হবে।

পরদিন শনিবার। কারখানায় ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক ছিল। বাসায় ফিরতে রাত দশটা বাজল।

ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়ছি, এমন সময় দারোয়ান একখানা খামে মোড়া চিঠি দিয়ে বলল: মেমসাব আজ ভি আয়ী থী। লেফাফা ছোড় গয়ী।

: আজ ভি আয়ী থী? ঠিক হ্যায়, ময় দেখতা হুঁ।

অনুরাধার চিঠি—

অশোকবাবু,

কাল অনেক বাজে কথা বলেছি। আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তা তখনই বুঝেছিলাম। অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করবেন। মাঝে মাঝে কেন যে এমন প্রগলভ হয়ে উঠি, তা ভেবে পাই না। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু মজা করবার জন্য ওসব বলেছি। ও আমার মনের কথা নয়। আপনি চলে যাবার পর সারা রাত, সারা সকাল আমার খুব অস্বস্তিতে কেটেছে। তাই এই চিঠি লিখছি। রবিবারে না এলে ধরে নেব আপনার রাগ যায়নি। আমাকে ক্ষমা করবেন—প্লীজ।

—অনুরাধা

চিঠিটা পড়ে এত আনন্দ হল যে বার বার সেটা পড়তে লাগলাম। ও আমার মনের কথা নয়। তোমার মনের কথাটা কি? আমি যে তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি, তা কি তোমার মন টের পায়? গতকাল তোমার হাতখানা যখন চেপে ধরেছিলাম, তখন সেই স্পর্শের ভাষায় আমি যেসব কথা বলেছি, তা কি তুমি একটুও বুঝতে পারনি? তোমাকে ক্ষমা করার প্রশ্ন আসছে কি করে? তুমি কি ভাব, আমি তোমার উপর রাগতে পারি? অসম্ভব। চিরকাল তুমি এমনি প্রগলভ থেকো। তোমার প্রগলভতায় আমার পুরো প্রশ্রয় আছে।

অনুরাধার চিঠির জবাবটা আমি এইভাবে মনে মনে আওড়াতে লাগলাম

কিন্তু কোন চিঠি লিখলাম না—কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। সকাল হলেই রবিবার। সুতরাং কয়েক ঘণ্টা কোনো মতে কাটিয়ে দিতে পারলে নিজের বক্তব্য সামনা সামনিই তাকে শোনাতে পারব। যেভাবে আমি ভাবছি, সেভাবে হয়তো বলা যাবে না কিন্তু এই চিঠির সূত্রে কাল তাকে যে করেই হোক বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার সম্বন্ধে আমার ষোলো আনা দুর্বলতা রয়েছে। ফর্মালিটিতে যখন তার এত আপত্তি তখন ইনফর্মাল হয়েই দেখা যাক।

রাত্রে আমার চমৎকার ঘুম হল। সকালে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে না বুলোতে হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

: খোলা আছে।—বললাম আমি।

কপাট ঠেলে আমার সামনে দাঁড়াল বল্টু মজুমদার। পরনে খাকির ট্রাউজার আর হাতা-গোটানো সাদা পপলিনের শার্ট। দেখে আমি তাজ্জব। মাত্র একদিন আগে তাকে কলকাতায় আনার প্রশ্ন নিয়ে সরকার বাড়িতে কত নরম-গরম আলোচনাই হল আর সেই ব্যক্তি স্বয়ং আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। একেই বলে ঘটনাচক্র।

: আসুন, আসুন অমলবাবু। ওঃ আপনার পরমায়ু অনেক।

: আরে মশাই, আপনি এত ঘন ঘন বাসা বদল করেন কেন? খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান।—বল্টু এগিয়ে এসে চেয়ারে বসবার আগে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে টেবলের উপর রাখল: হাঁ, কি বললেন? পরমায়ু অনেক? কেন আমায় নিয়ে খিস্তি-খেউড় হচ্ছিল বুঝি?

: ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন। আপনি নেই বলে সকলেরই মন খারাপ।

বল্টুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

: সে কি কথা আশাকবাবু। আমি নেই বলে যাদের মন খারাপ হতে পারে, তাদের সঙ্গে তো আপনার চেনাশোনা থাকার কথা নয়। তারা তো থাকে সমাজের বাইরে।

: আজ্ঞে না, তারা বাড়ির বাইরেই বড় একটা বেরুতে পায় না। যাক, সে কথা পরে হবে। আগে আপনার খবর শুনি। হঠাৎ কলকাতায়?

: আর বলেন কেন, বাড়িটা ভাগ হয়ে গেল। আমার অংশের দখল নেবার জন্য আমাকে আসতে হয়েছে। কাল এসেছি, আজ চলে যাব।

: আই সি। তাহলে পাটনায় পড়াশোনাই চালাচ্ছেন?

বল্টু মাথা নেড়ে বলল : উহুঁ। চাকরি করছি।

: চাকরি করছেন ?—

: আজ্ঞে হ্যাঁ।—বল্টু হাসল : খালাসীর চাকরি।

: কি রকম হল ব্যাপারটা ?

: মজার ব্যাপার আর কি। এখান থেকে গিয়ে স্কুল ফাইন্যালের বইটই সব কিনে পড়তে শুরু করে দিলাম। দেখে জামাইবাবু হেসেই বাঁচেন না। বললেন, "শিং ভেঙে বাছুর হবার শখ মাথায় চাপাল কে ? তোমার দিদি নিশ্চয়ই। ছেলেপুলে নেই, সংসারের ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে না, তাই বুড়ো বয়সে বি-এ এম-এ পাস করে সময় কাটাচ্ছেন। তাতে বিদ্যে কতটুকু বাড়ছে জানি না, বুদ্ধি দিন দিন কমে যাচ্ছে। ওসব পড়াশোনার বাতিক ছেড়ে কাজ-কর্ম কর। স্কুল ফাইনাল পাশ না করলে কেউ বড় হতে পারবে না, তার কি মানে আছে ? হাতের কাজটাজ কিছু জান ? না, তা জানবে কি করে ? এতকাল তো গুণ্ডামী বদমাইসী করে কাটিয়েছ।" বললাম, মোটর চালাতে এবং মোটর সারতে জানি। জামাইবাবু বললেন, "ড্রাইভারের চাকরি করলে তোমার দিদি আবার নাক সেঁটকাতে শুরু করবেন। সুতরাং ওটা থাক। কলকারখানায় মেকানিকের কাজে যেতে পার কি না দেখছি। এতকাল যে-ভাবে জীবন কাটিয়েছ তাতে কলকারখানার কড়া রুটিনের মধ্যে না থাকলে আবার তোমার ব্রেন ডেভিল্‌স্ ওয়ার্কশপ হয়ে উঠবে। পড়াশোনা করতে গেলে একেবারেই শেষ। কারণ পাশ করতে পারবে না, মন ভাঙবে, আবার যা ছিলে তাই হয়ে যাবে।" ডিহরীর সিমেণ্ট কারখানার চিফ কেমিস্ট জামাইবাবুর বন্ধু। মাস খানেক বাদে একখানা চিঠি লিখে তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গিয়ে দেখলাম, একমাত্র ক্রেন খালাসীর কাজ ছাড়া আর কোন চাকরি খালি নেই। মাইনে সবশুদ্ধ সত্তর টাকা। শুনলাম ক্রেন চালাতে শিখলে চাকরির অভাব হয় না আর মাইনেও পাঁচ সাত শয়ে ওঠে। তাই আপাতত খালাসীগিরিই করছি। কাজটা ভাল করে শিখে কোন বড় কোম্পানীতে চলে যাব।

: বলেন কি বল্টুবাবু !

: আর বলব কি।—বল্টু মুখ টিপে হাসল : আমাদের ওখানেও খুব জোরালো ইউনিয়ন আছে। মাস মাস চাঁদা নেয়। সভা-সমিতিতেও ডাকে। আমি বলেছি ঠিক হ্যায়, কলকাতায় অশোকবাবু লেবার ইউনিয়নের কাজ

করে, এখানে আমিও তাই করব। কারখানায় মজুররা খেটে খেটে মরবে আর লাভের সরটা মেরে নিয়ে যাবেন শেঠ ডালমিয়া। এ যে ভারী মজার ব্যাপার। এখন অনেক জিনিস বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি অশোকবাবু। আগে বুঝতাম না। তাহলে কি ঘনশ্যাম জালানের চোরা গুদোম পাহারা দিতে যাই? আর সে ভুল হচ্ছে না। আসুন হাত মেলান।

বল্টু যে সত্যিই শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে, তা ওর কথাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ যখন কোন আন্দোলনে প্রথম প্রবেশ করে তখন তার উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাস দুই-ই একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আন্দোলনের মূল মর্মের চেয়ে ধ্বনিগুলোই তার কাছে বেশি অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। আসলে কথাটা শুনিয়ে ও আমার কাছ থেকে একটু বাহবা পেতে চায়। সে বাহবা সত্যিই ওর প্রাপ্য। চোরাকারবারীর গুদোম পাহারা দেওয়া গুণ্ডা যখন আন্তরিকভাবে লেবার ইউনিয়নের কর্মী হয় তখন সেটাকে তার জীবনের মস্ত কৃতিত্ব বলে মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বল্টু বেশ জোর দিয়ে সেটা ঝাঁকিয়ে দিল।

: কিন্তু দিদির কথাটাও ফেলতে পারলাম না। পড়াশোনাও করছি। কাউকে বলবেন না, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। অঙ্কে কাঁচা। জামাইবাবুর সেই কেমিস্ট বন্ধু আমার আগ্রহ দেখে বেশ যত্ন করে আমায় অঙ্ক শেখাচ্ছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় পাশ করেও যেতে পারি। কি বলুন?

: পাশ করবেন বই কি। এই ক'মাসে আপনার এত উন্নতি হয়েছে যে আমি আপনার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি না। দিন এবার আপনার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিই।

বল্টু হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিল। দেখলাম তার মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। সে তো বরাবরই সুপুরুষ। কিন্তু তবুও এতদিন তার মুখে কোথায় যেন একটা অবিদ্যার কালিমা ছিল। আজ ওর মুখখানা শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক ও অমলিন। হয়তো সেটা আমার নিজের মনের ছায়া কিন্তু সেটা অস্পষ্ট নয়। ওকে দেখে এবং ওর কথা শুনে সত্যিই বড় আনন্দ হচ্ছে।

: হ্যা, কি বলছিলেন, আমি চলে যেতে কাদের মন খারাপ হয়েছে?

বললাম: আপনার জন্য একটা ভাল খবর আছে বল্টুবাবু। মিসেস সরকারের অসুখ সেরে গেছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ তিনি এখন দিব্বি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। ডাক্তার বলেছে দুচার দিনের মধ্যে রাস্তায় বেরুতে পারবেন।

ঃ সত্যি ?

ঃ সত্যি বই কি। পরন্তু তিনি আমার সামনেই ঘরে পায়চারী করলেন। বাড়িতে কত আনন্দ কিন্তু আপনি নেই বলে সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। মিসেস সরকার শুধু চোখের জল ফেলতেই বাকী রেখেছেন। অনুরাধার অবস্থাও তাই।

বল্টু বহুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। শেষে মুখে একটা নিস্পৃহভাব ফুটিয়ে বলল ঃ সুসংবাদ শুনে খুশি হলাম। তবে আমার থাকা না থাকায় তাদের আনন্দ নষ্ট হবে কেন, তাতো ভেবে পাচ্ছি না।

ঃ এ কি কথা বলছেন অমলবাবু। আপনি তাঁদের পরিবারের ছেলের মত। আপনার কাছে মিসেস সরকারের কত ঋণ। নিজের মেয়েকে তিনি যতটুকু ভালবাসেন, আপনার প্রতি তাঁর ভালবাসা তার থেকে এক তিল কম নয়। তাছাড়া অনুরাধার সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভুল। আপনি চলে যাবার পর সে একেবারে মন-মরা হয়ে আছে। শুনলাম যাবার সময় আপনি নাকি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন নি। দ্যাট্স ব্যাড।

বল্টু গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা বিশ্বাস করবার আগ্রহ রয়েছে কিন্তু কোথায় যেন বাধছে।

ঃ আপনি এত কথা জানলেন কি করে ?—হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল সে।

ঃ অনুরাধার কাছেই শুনেছি।

ঃ প্রায়ই সেখানে যান বুঝি ?

প্রশ্ন শুনে মাথার মধ্যে চিড়বিড় করে উঠল।

ঃ প্রায়ই নয়, তবে যেতে হয়েছে। দেখা হলে অনুরাধা ছাড়তে চায় না।

ঃ ঘন ঘন দেখা হয় নাকি ?

আমি বেশ নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। এভাবে জেরা করে কি জানতে চায় বল্টু ? অনুরাধাকে নিয়ে আমি যে একটু রোমান্সের স্বপ্ন দেখছি সেটা কি ও আন্দাজ করতে পেরেছে ? লজ্জায় মনটা কেমন শিরশির করতে লাগল।

ঃ নাঃ, ঘন ঘন দেখা হবে কি করে। আজকাল বাসাটা কাছাকাছি হয়ে

গেছে। তাই পথেঘাটে কখনও কখনও দেখা হয়। একদিন তো নিজেই এসেছিল এখানে।—দেখা-সাক্ষাতের দায়িত্বটা আমি অনুরাধার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলাম।

অবশ্য আমি যদি অনুরাধার সঙ্গে প্রণয়চর্চা করি, তাতে বণ্টুর কাছে আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। অনুরাধা বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে এবং আমিও পরিণত-বয়স্ক যুবক। আমাদের দুজনের মধ্যে রোমান্সের সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাতে বণ্টুর কিছু বলবার থাকতে পারে না। বিশেষ করে সে যখন অনুরাধার প্রণয়প্রার্থী নয়। তবুও অনুরাধার সম্পর্কে বণ্টুর এসব প্রশ্নের জবাব দিতে কেন যে ভয়-ভয় লাগছে তা বুঝতে পারছি না।

: তাই নাকি ?—তার মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল। তাতে আমি একেবারেই ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে হল। বণ্টুর কাছে আমার অনুরাধা সম্পর্কীয় দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমি তার কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না।

ঠাট্টার সুরে বললাম : আর বলেন কেন মশাই, আপনি পাটনায় চলে যাবার পর অনুরাধার চোখের ঘুম পালিয়ে গেছে।

: কেন ?

: তার ধারণা, আপনি তার উপর বিরক্ত হয়েই কলকাতা ছেড়েছেন। মনে মনে ভয়ানক অনুতাপ। আমার কাছে এসে শুধু কাঁদতে বাকী রেখেছে। যান মশাই, এক্ষুণি তাদের বাড়িতে গিয়ে একবার দেখা করে আসুন। কি যে আপনাদের ছেলেমানুষী মান-অভিমান বুঝি না।

বণ্টুকে পাল্টা আক্রমণ করে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। কিন্তু তাতে সে খুব নরম হয়েছে বলে মনে হল না।

: আপনি একটু রঙ চড়িয়ে বলছেন। আসলে আমি কলকাতা ছেড়ে গেছি বলে তারা খুশিই হয়েছে। সামাজিক লোকেরা সমাজবিরোধী লোকেদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চায়। সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। জানে আপনি আমার বন্ধু। তাই আপনার কাছে অনুতাপ দেখিয়ে ভাল সাজতে চেয়েছে। ওসব হল লোক-দেখানো শোক।

: কার কথা বলছেন আপনি ?

: ওই যিনি আপনার বাসায় এসেছিলেন কাঁদুনি গাইতে।—ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিল বণ্টু।

: মিসেস সরকার—

: না, তাঁর কথা বলছি না। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

: অভিযোগ আপনার অনুরাধার বিরুদ্ধে।—প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করে সংক্ষেপ করতে চাইলাম আমি।

বল্টু অনেকক্ষণ মৌন থেকে খুব একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে বলল: আজ্ঞে না, কারও বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ নেই।

: কিন্তু অনুরাধার উপর আপনি সন্তুষ্ট নন।

: তাও নয়।—গম্ভীরভাবে বলল বল্টু: আমি তার উপর অসন্তুষ্ট হতে যাব কেন বলুন? আমি কে?

: এ আপনার রাগের কথা অমলবাবু। মিসেস সরকারকে আপনি মা ডেকেছেন সেটা ভুলবেন না। সম্পর্কটা পাতানো হলেও ফেলনা নয়। সেই হিসাবে অনুরাধা আপনার কে তা আপনি ভালই জানেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, অনুরাধার বাইরেটা দেখে তার ভিতরটা বিচার করবেন না। মনে মনে সে যে আপনার কতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী তা আমি জানতে পেরেছি। সে চায়, আপনি দশজনের একজন হোন, আপনার নাম ডাক হোক, আপনি বড় হয়ে উঠুন। সেই ইচ্ছা কিছুতেই পূর্ণ হতে চাইছে না দেখে সে মরীয়া হয়ে আঘাত দিয়ে দিয়ে আপনাকে সেই পথে টানবার চেষ্টা করেছে। এটাকে অন্যভাবে দেখা উচিত নয়। আমি তো কই আপনাকে কখনও আঘাত দিতে সাহস পাই না। তার এই সাহস এল কোত্থেকে? এসেছে সম্পর্কের অধিকার থেকে। আপনি যদি তাকে ভুল বোঝেন তাহলে সারা জীবনেও তার আফশোস ঘুচবে না। সে যা চেয়েছিল, আপনি আজ তাই হয়ে উঠতে যাচ্ছেন। এটা তার কতবড় আনন্দ। অথচ আপনার ভুল বোঝার ফলে সে আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে।

বল্টু অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল, কথাটা তার মনে দাগ রেখেছে। শেষে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে মুখে হাসি টেনে চাপা গলায় বলল: অনুরাধার উপর আপনার ভয়ানক দরদ দেখছি। খুব জপিয়েছে বোধহয়? মেয়ে বেশ চালু।

কথাটা কৌতুকের সুরে উচ্চারিত হলেও আমি কেমন ধরা পড়ার লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে গেলাম। কি জবাব দেব? ওর লক্ষ্যটা কি তা এখনও আন্দাজ করতে পারছি না।

: যাক ভাল হলেই ভাল। তাকে বলে দেবেন, আমি কারও নিন্দা-প্রশংসা মনে পুষে রাখি না।

: আবার আমায় কেন? আপনি নিজে গিয়েই বলে আসবেন। সে আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।

বল্টু আমাকে অনুরাধার 'দরদী' সাজিয়ে ল্যাঙ মেরেছিল। আমিও অনুরাধাকে বল্টুর 'প্রতীক্ষায়' দাঁড় করিয়ে পাল্টা ল্যাঙ মারলাম। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হল না। বল্টু বলল: ওই অনুরোধটি করবেন না অশোকবাবু।

: কেন?

: সে বাড়িতে আমি যেতে পারছি না।

: কারণ?

: আমার সময় নেই।

: সে কি মশাই? এই তো কাছেই তাদের বাড়ি। এক্ষুণি একবার হয়ে আসুন না।

বল্টু মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল: উহুঁ। এখন আমাকে যেতে হবে অ্যাটর্নীর বাড়িতে। তারপর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আছে।

: আহা, কি যে বলেন, কাজের ফাঁকে পাঁচ মিনিটের জন্য—

: অসম্ভব।

তার দৃঢ়তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

: অর্থাৎ সে বাড়িতে আপনি যেতে চান না। সময়ের অভাবটা আপনার অজুহাত।

: হ্যাঁ, তাই-ই।—গম্ভীরভাবে বলল বল্টু: যতদিন মান-অপমান জ্ঞান ছিল না ততদিন যা খুশি তাই করেছি। এখন আর তা হয় না। কলকাতা ছাড়বার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদু মজুমদারের প্রকৃত বংশধরের যোগ্যতা অর্জন করে যেদিন কলকাতায় ফিরব, সেইদিন আমি আবার সরকারদের কাছে মুখ দেখাব। তার আগে নয়। আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সিংহ পাঁকে পড়লেই চিরকালের জন্য শিয়াল হয়ে যায় না।

বললাম: ছোট জিনিসকে আপনি বেশি বড় করে দেখছেন।

: ছোট জিনিস নয় অশোকবাবু। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনি লেখাপড়া জানা লোক, বই লেখেন—

সাহিত্যিক। সরকাররা আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু আমাকে তারা মুখে ভালবাসা দেখালেও মনে মনে ঘেন্না করে। সুতরাং আমার জ্বালাটা কি তা আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

: না না, একি বলছেন—

বল্টু আমাকে থামিয়ে দিল: ঠিকই বলছি। সরকারদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। তাদের আমি আপনার চেয়ে ভাল করে চিনি। তাঁরা ভাল আছেন জেনে খুশি হলাম। ব্যাস, ঐটুকু যথেষ্ট। এবার বলুন, কলকাতার আর সব খবর কি? কোন নতুন বইটই লিখলেন?

: লিখছি, তবে ছাপতে দেরি হবে।

: ঘনশ্যাম জালানের খবর কি? গোলমাল করছে?

: বড় রকমের গোলমাল কিছু নেই। তবে চিমটি-চামটা কাটছে। ইতিমধ্যে আমাদের ইউনিয়নও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বল্টুবাবু, ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। মিসেস সরকার আপনাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। চিঠি লিখবেন বলে আপনার ঠিকানা খুঁজছিলেন। এ অবস্থায় আপনি কলকাতায় এসে সব জেনেশুনেও যদি তাঁর সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে তাঁরা ভাববেন আপনি চিরকালের মত তাঁদের ত্যাগ করেছেন। সেটা কি উচিত?

: আমি কলকাতায় এসেছি, সে কথাটা তাঁরা জানছেন কি করে?

: আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি তো আর না বলে পারব না।

: না, দয়া করে চেপে যাবেন। একটা প্রতিজ্ঞা আমায় রাখতে দিন অশোকবাবু। আগে মাথা খাড়া করে দাঁড়াই, তারপর আবার আত্মীয়স্বজন সমাজ-সামাজিকতা হবে। একবার যা মনে মনে স্থির করেছি, তা আর নড়চড় করব না। চলুন, বাইরে কোথাও গিয়ে চা খেয়ে আসি। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমি কেটে পড়ব।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে বাইরে বেরুলাম। মনটা আমার বেশ খারাপ হয়ে গেল। বল্টু যেন অকারণেই একগুঁয়েমি করছে। সরকারদের সম্বন্ধে ওর ধারণাটা যে একেবারেই ভুল, সেই সত্যটা মানতে না চাওয়ার পেছনে অন্ধ অহমিকা ছাড়া আর যেন কিছুই নেই। অনুরাধার উপর ওর অহেতুক এবং নির্মম ক্রোধ দেখে তার (অনুরাধার) জন্য আমার মন কেমন করতে

লাগল। বন্টুকে সে সত্যি সত্যি ভালবাসে বলেই কৃত্রিম অবজ্ঞা দেখিয়ে তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাতে চেয়েছে। সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা বন্টুর এখনও হয়নি। এটা অনুরাধার পক্ষে সত্যিই মর্মান্তিক ঘটনা।

অবশ্য বন্টুর দিকেও ভাববার কথা আছে। অনুরাধার প্রতি তার এই অন্ধ ক্রোধ প্রকৃতপক্ষে তার মঙ্গলই আনবে। তার ধারণা সে পশুরাজ সিংহের বংশধর। পাঁকে পড়ে শিয়ালে পরিণত হয়েছিল। তাই অনুরাধা তার সঙ্গে শিয়ালের মত ব্যবহার করেছে। এখন সে পাঁক থেকে বেরিয়ে সিংহত্ব প্রাপ্তির সাধনায় মগ্ন। সিদ্ধিলাভের পর কলকাতায় ফিরে অনুরাধার কাছ থেকে সিংহের মর্যাদা আদায় করে আগের "অপমানের" প্রতিশোধ নেবে। তেমন কিছু ঘটলে অনুরাধার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। অনুরাধা তো তাকে সিংহের সম্মান দিতে অনিচ্ছুক নয়। সে তো তাই চেয়ে এসেছে এতকাল। বন্টুর মধ্যে সিংহত্বের অবলুপ্তি ঘটছিল বলেই অনুরাধা তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আত্মসচেতন করতে চেয়েছিল। বন্টু যদি সভ্যসমাজে সত্যিই "মাথা খাড়া" করে দাঁড়াতে পারে তাহলে সেইটাই হবে অনুরাধার পরম জয় এবং সেদিন বন্টু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তার পরিবর্তনের পেছনে অনুরাধার অবদান কতখানি। সব দিক বিবেচনা করে আমি বন্টুর একগুয়েমিতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হতে পারলাম না। তার অনুভূতি এবং ভাবপ্রবণতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের মান-অপমান বোধটাই তার মনুষ্যত্ব। সেটা যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক, তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

কিন্তু ওর এই আচরণে অনুরাধা যে খুব বেদনাবোধ করবে, সেই উপলব্ধি আমাকে অত্যন্ত মানসিক পীড়া দিতে লাগল। হাজার হলেও সেও তো ছেলেমানুষ। তার অনুভূতিও সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এমনিই সে বন্টুর ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবপ্রবণ হয়ে আছে। এবার যদি শোনে বন্টু তার সম্বন্ধে এতখানি অসন্তোষ মনে পুষে রেখেছে, তাহলে আত্মগ্লানিতে আরও বিচলিত হয়ে পড়বে। অনুরাধা কোন গভীর বেদনায় অভিভূত হলে, সে বেদনার ঢেউ যেন আমাকেও স্পর্শ না করে পারে না। স্বভাবতই তার জন্য আমার প্রাণটা আনচান করতে লাগল।

: আপনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ?—চায়ের দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল বন্টু।

: না, গম্ভীর কোথায় ?—মুখে হাসি টানলাম আমি। তার পর চায়ের

পেয়ালা সামনে নিয়ে সিমেণ্ট তৈরির পদ্ধতি, ক্রেন চালাবার মেকানিজম, ইউনিয়নের নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে মিনিট পনেরো আলোচনা হল। শেষে বণ্টু বিদায় চাইল।

:'আবার কবে আসবেন?

: দেখি কবে আসা যায়। এলে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। নমস্কার।

: নমস্কার।

বাসায় ফিরে আমি আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসলাম। মনে হল বিকেলে অনুরাধাদের বাসায় গিয়ে বেশ একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে। সেখানে বণ্টুর কথা নিশ্চয়ই উঠবে। তখন আজকের সংবাদ চেপে রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। সারাক্ষণ আমাকে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, যেন তার কথাটা প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

সে যাই-হোক, বণ্টু কিন্তু একেবারে বদলে গেছে। তার সঙ্কল্পের সাধুতা সম্বন্ধে আমার কোন অনাস্থা ছিল না, কিন্তু আমি ভাবতাম, বণ্টু ধৈর্য ধরে নিজের সঙ্কল্পে অটুট থাকতে সক্ষম নাও হতে পারে। এই ধরনের লোক সাধারণত একটু অধৈর্য হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তার সংকট কেটে গেছে। বণ্টুর জামাইবাবু খুব বুদ্ধিমান লোক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বণ্টুর উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা আনতে হলে আগে তার একটা কঠোর রুটিন চাই আর সেই রুটিন বাধ্যতামূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই ভদ্রলোক ওকে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটা লোক যদি কারখানার নিয়মে চলতে বাধ্য হয়—তাহলে বাকী সময়টা সে নিজের নিয়মেও চলতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটাও অনায়াসে পাশ করে যাবে—অন্তত সেই আত্মবিশ্বাস মনের মধ্যে সংহত করেছে। নইলে এত বড়গলা করে বলতে পারত না যে "যদু মজুমদারের প্রকৃত বংশধরের মর্যাদা" নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত ও সরকারদের মুখোমুখি দাঁড়াবে না। কথাটার অর্থ এই যে, সে সেই মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছে এবং পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে কিছুটা সুনিশ্চিত হতে পেরেছে। চোখের সামনে খবরের কাগজ রেখে আমি বণ্টুর কথাই চিন্তা করতে লাগলাম।

দরজায় টোকা পড়ল, টক্ টক্ টক্। খুব শান্ত আহ্বান। কে এল আবার?

: টক্ টক্ টক্।

: খোলা আছে।

আস্তে আস্তে বাঁ-পাশের কপাট উন্মুক্ত হল। একজন মহিলা। আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। মহিলা তো পরিচিত নন। লম্বা সুডোল চেহারা। গায়ের রঙ বেশ কালো। ধোপভাঙা সাদা সাড়ি, হাল্কা নীল রঙের ব্লাউস্, সাদা স্কার্ফ আর স্যাণ্ডেল পরে আছেন। মাথার মধ্যিখানে কুঞ্চিত কেশদাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঘাড়ের উপর দিকে একটা শিথিল গ্রন্থিতে আটক পড়েছে। টানা টানা চোখ, কোমল নাসা, পুষ্ট অধরোষ্ঠ। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বয়স বছর পঁচিশেক হবে। শিক্ষিকা-অধ্যাপিকা-কেরানী জাতীয় বুদ্ধিজীবী মহিলা বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের চেয়ে স্বাস্থ্যটা অনেক ভাল। সাজপোশাকের সরলতা অথবা গায়ের রঙের কালিমায় তাঁর অঙ্গের লাবণ্য মোটেই ম্লান হয়নি। শরীরের গড়ন যে কোন সুস্থ চোখকে প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করবে। যাঁরা রূপ বলতে শুধু গায়ের রঙ বোঝেন, তাঁদের কাছে অবশ্য উনি কুরূপা। কিন্তু সৌন্দর্যের পরীক্ষায় শিল্পীর কাছে উনি ভাল নম্বর পাবেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা এখানে কেন? খুব সম্ভব পথ ভুলে। অন্য ফ্ল্যাটে যেতে যেতে এই ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছেন।

: কাকে চাই আপনার?—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

তিনি একবার আমার মুখের দিকে আর একবার ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করতে করতে বললেন: এক্সকিউজ মি, এখানে কি আপনিই থাকেন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

: না, মানে আমি আর এক জনের—

: ফ্ল্যাট নম্বর জানেন তো? কি নাম ভদ্রলোকের?

: মিস্টার ফাড়কে।

আমি হেসে বললাম: হ্যাঁ, মিঃ ফাড়কে এখানে ছিলেন। পাটনায় চলে গেছেন।

: কিন্তু আজ সকালে তাঁর আসবার কথা ছিল না?

: আজ? সকালে? কই তা তো জানি না। আমাকে তো তিনি কিছু লেখেন নি।

: আমাকে লিখেছেন, আজ ভোরের ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছে এখানে এসেই উঠবেন। আমি অবশ্য জানতাম না যে আপনি এখানে থাকেন।

: আমি এখানে আছি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে। বড়ই দুঃখিত যে আমি তাঁর কলকাতায় আসার সংবাদ আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রমহিলার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন।

: ভিতরে এসে বসুন না।

: না বসব না। আই এ্যাম রাদার পাজ্‌ল্‌ড্‌। এখন চলি। যদি তিনি আসেন, দয়া করে বেলা চারটে পর্যন্ত বাসায় থাকতে বলবেন। সেই সময় আমি আবার আসব।

: আর ইউ সিওর, তিনি আজই কলকাতায় আসবেন ?

: সেই রকমই তো চিঠি লিখেছেন।

: ঠিক আছে। তিনি এলে আমি থাকতে বলব। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা—আমার নাম অশোক মিত্র।

: আমার নাম অঞ্জলী ব্যানার্জি।

: ধন্যবাদ।

: নমস্কার।

: নমস্কার।

ভদ্রমহিলা উদ্বিগ্ন মুখে বিদায় নিয়ে তাঁর মত আমাকেও 'পাজ্‌ল্‌ড্‌' করে রেখে গেলেন। ফাড়কে আজ এখানে আসছে সে খবর আমি জানি না অথচ উনি জানেন। এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, নীচের লেটার বক্সটা অনেক দিন খোলা হয় না। হয়তো ফাড়কে আমার কাছেও চিঠি দিয়েছে। চাবি নিয়ে নিচে গিয়ে দেখি, ঠিক তাই। ফাড়কের পোস্টকার্ড এসেছে কাল বিকেলে। আজ সকালে সত্যিই তার আসার কথা। যাক, একটা ধাঁধাঁর উত্তর মিলল। দ্বিতীয় ধাঁধাঁ, ভদ্রমহিলা কে ? ফাড়কের আসা না আসায় তাঁর এত উদ্বেগ কেন ? পরস্পরের কাছে চিঠি লেখালেখির অভ্যাস যখন আছে, তখন সম্পর্ক যে বেশ ঘনিষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফাড়কে মেডিকাল রিপ্রেসেণ্টেটিভ। তার সঙ্গে মহিলা ডাক্তার এবং সেই সূত্রে নার্সদের সঙ্গে চেনাশোনা থাকতে পারে। হয়তো উনি ঐ জাতীয় কিছু একটা হবেন। কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে উনি আসেননি। ফাড়কের ব্যবসা এখন কলকাতায় নয়—পাটনায়। কাজেই সে ব্যাপারে এমন কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না যাতে সে

কলকাতায় আসতে না আসতেই ভদ্রমহিলা নিজে যেচে তার বাড়িতে খোঁজ করতে এসেছেন। মনে হয়, ফাড়কের সঙ্গে অঞ্জলী ব্যানার্জির একটা গভীরতর ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। প্রেম? হওয়া অসম্ভব নয়। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, বেলা চারটে পর্যন্ত আমাকে বাসায় আটক থাকতে হবে।

আর এক কাপ চা খেয়ে দাড়ি কামাবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে সবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ঘরে ঢুকল ফাড়কে। তার পেছনে কুলির মাথায় বেডিং আর সুটকেশ।

: গুড্ মর্নিং মিস্টার মিত্র। সাত দিনের জন্য আপনাকে জ্বালাতে এলাম।

: গুড মর্নিং। আই এ্যাম সরি মিঃ ফাড়কে, ইউ হ্যাভ মিসড্ এ মিস জাস্ট ফর এ ফিউ মিনিটস্। সি ওয়াজ টোটালি আপসেট নট টু ফাইণ্ড ইউ হিয়ার।

: আ-হা—এ মিস ইজ অ্যাজ গুড এ্যাস এ মাইল। ডু ইউ থিঙ্ক, আই হ্যাভ মিস্ড্ দি বাস টু?

কথার ধরন দেখে বুঝলাম, আমার আন্দাজটা ভুল নয়। অঞ্জলীর সঙ্গে ফাড়কের সম্পর্কটা প্রেমেরই বটে। বললাম: সেটা বাসের সঙ্গে যাত্রীর সম্পর্কের গভীরতার উপর নির্ভর করছে।

ফাড়কে চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল: অঞ্জলী এসেছিল নিশ্চয়ই।

: হাঁ, তিনিই। চারটের সময় আবার আসবেন বলে গেছেন।

: কেমন দেখলেন?—ফাড়কে ডান চোখটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুরে জিজ্ঞাসা করল।

আমিও হাল্কা সুরে জবাব দিলাম: অপরূপ। সি ইজ রিয়েলি এ হ্যাণ্ডসাম লেডি।

: বাট এ সিলি গার্ল—জুতো জোড়া ছুঁড়ে দিয়ে সিগারেট জ্বালল ফাড়কে: আমার নাকে দম লাগিয়ে দিয়েছে।

: কেন?

: আর বলবেন না মশাই। মেয়েদের এত সন্দেহ-বাতিক!

: কিছু মনে করবেন না মিঃ ফাড়কে, আপনি কি মিস ব্যানার্জির সঙ্গে—

: এনগেজ্ড্। বিয়ে করে এই সপ্তাহেই পাটনায় নিয়ে যাব।

: কনগ্রাচুলেসনস্।

: থ্যাঙ্কস্।

: সন্দেহ বাতিকের কথা কি বলছিলেন ?

: বলতে বাধ্য হচ্ছি। অনেকদিন ধরে বলছি, বিয়েটা করে ফেলা যাক। কিন্তু এক একটা করে অজুহাত তুলে ও সেটা ঠেকিয়ে রেখেছিল। স্কুলে চাকরি করে। গতমাসে এডুকেশানাল ট্যুরে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল। এরই মধ্যে আমি পাটনায় বদলী হয়ে যাই। ওর ঠিকানা জানতাম না বলে চিঠি লেখা হয়নি, কিন্তু আমাদের এক কমন ফ্রেণ্ডের কাছে সব বলে গিয়েছিলাম। মেয়ে কলকাতায় ফিরেই কেঁদে কেটে আমার কাছে এক চিঠি লিখেছে—আমি নাকি তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কি ধরনের অপবাদ দেখুন। রাগ করে আমি ওঁকে লিখেছি, রবিবার কলকাতায় পৌছচ্ছি। এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করে তাকে পাটনায় নিয়ে যাব। সে যেন তৈরি থাকে। ভয়টা একবার দেখুন, আমি কলকাতায় পৌছতে না পৌছতে এখানে এসে খোঁজ করে গেছে। একে সন্দেহ বাতিক বলবেন না ?

: 'ওঠ ছুড়ি তোর বিয়ে' বললে 'ছুঁড়ির' পক্ষে একটু উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। আপনার আলটিমেটাম পেয়ে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব বিব্রত বোধ করছেন। বিয়ের অনেক প্যারাফার্নেলিয়া মিঃ ফাড়কে। আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সমাজ-সামাজিকতা—

ফাড়কে হাসতে হাসতে বলল: না সে সব কিছু নেই। ভয়ানক ভীতু মেয়ে। বিয়ের আগে কাউকে জানাবে না বলেছে।

: কেন ?

: আত্মীয়স্বজন যদি আপত্তি করেন।

কথাটা ঠিকই বলেছে। এ তো আর পাল্টা ঘর দেখে জাতিকুল মিলিয়ে বিয়ে হবে না। পরিবারের লোকেরা রক্ষণশীল হলে আপত্তি করতে পারেন।

: মিস ব্যানার্জির মা-বাবা কোথায় থাকেন ?

: বর্ধমানে। ওর বাবা সেখানকার উকিল।

: এখানে মিস ব্যানার্জি কার সঙ্গে থাকেন ?

: হস্টেলে।

: আপনার সঙ্গে আলাপ হল কি করে ?

: ওর এক বান্ধবীর দাদা ডাক্তার। শ্যামবাজারে ডিসপেন্সারী। ওষুধ বেচতে বেচতে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়। আমি কলকাতায় আসার পর থেকেই বাঙলা ভাষাটা ভাল করে শেখবার চেষ্টা করছিলাম। বছর দুই আগে সেই ডাক্তারকে একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে বলি। তিনি অঞ্জলীকে এনে হাজির করেন।

তার পরেরটুকু আমি নিজেই মনে মনে অনুমান করে নিলাম।

: তাহলে মিস ব্যানার্জি আপনাকে গোপনে বিয়ে করবেন?

ফাড়কে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল : সেই রকমই তো বলেছে। আমি মশাই ওসব ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের পক্ষপাতী নেই। দাদাকে লিখে দিয়েছি, বাঙালী মেয়ে বিয়ে করছি। দাদা লিখেছে, সাবাস্। ব্যাস, মিটে গেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন।

: নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি তো আছিই, নিরঞ্জনবাবুকেও—

: নিরঞ্জন নর্থ বেঙ্গল ট্যুরে গেছে। সে থাকলে তো ভালই হত। এখন আপনিই বরকর্তা।—ফাড়কে বেশ জোরে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম।

: মিঃ ফাড়কে, আমি খুব দুঃখিত যে আপনার হবু বধূকে তাঁর উপযুক্ত সমাদর করতে পারিনি। পাটনায় যাবার আগেই তাঁর কথা আমায় বলে গেলে ভাল করতেন।

: ছাড়ুন মশাই। এসব ভদ্রতার বুলি আর কারও কাছে কপচাবেন। —হ্যাঁ, অঞ্জলী কটায় আসবে বলেছে?

: চারটেয়।

: দেখবেন তার আগেই এসে হাজির হবে।

: হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল অথচ বরের খোঁজ নেই। পরিস্থিতিটা কনের পক্ষে খুব অস্বস্তিকর। আপনি মশাই সাংঘাতিক লোক।

: কেন, কেন?

: সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসে দিব্বি বাঙালী নারী অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন।

: উল্টো করে দেখলেন।

: কি রকম?

: আমি মশাই শিবাজীর বংশধর। মোগল সম্রাট আওরংজেব শিবাজীকে

বন্দী করে ধরে রাখতে পারেনি। আর সামান্য একজন বাঙালী মেয়ে তার বংশধরের পায়ে অনায়াসে শিকল পরিয়ে দিল।

আমি জোরে হেসে উঠলাম। ফাড়কে ভারী মজার লোক। সব সময় হাসি-পরিহাসের মেজাজে থাকে। লোকটাকে আমি খুব পছন্দ করি। এমন স্মার্ট এবং হাসিখুশি লোকেরা নারী-পুরুষ সকলের কাছেই সমান প্রিয়। অঞ্জলী ব্যানার্জিও যে শিক্ষকতা করতে এসে ছাত্রের প্রেমে পড়ে যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? আজ অনুরাধাদের বাড়িতে গিয়ে ব্যানার্জির কাহিনীটা সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। মিসেস সরকার নিশ্চয়ই ঘটনাটা উপভোগ করবেন। সন্ধ্যায় সরকার বাড়িতে গল্প-গুজবের চমৎকার একটা উপাদান পাওয়া গেল।

বড় ঘরটা ফাড়কেকে ছেড়ে দিয়ে আমি এতকাল-অব্যবহৃত ছোট ঘরে চলে যাবার আয়োজন করছিলাম কিন্তু ফাড়কে রাজি হল না। বলল: আপনি কেন বিছানাপত্র নাড়াচাড়া করতে যাবেন। আমিই পাশের ঘরে থাকছি।

দুপুরে খেয়েদেয়ে সেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। গাড়িতে ভীড় ছিল। রাত্রে ঘুম হয়নি। অঞ্জলী ব্যানার্জি আসবার আগে সেই ঘুমটাকে পুরিয়ে নিতে চায়। আমি নিজের বিছানায় শুয়ে একখানা আধপড়া নভেলের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। তারই মধ্যে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল। দরজায় টক্ টক্ আওয়াজ শুনে সেটা ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট দেরি। টক্ টক্। নিশ্চয়ই অঞ্জলী ব্যানার্জি। সকালে তিনি দরজায় যেভাবে টোকা দিয়েছিলেন, আওয়াজটা ঠিক সেই রকম। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মিস ব্যানার্জিই বটে। পোশাক-পরিচ্ছদ সকালের মতই। মুখখানা গম্ভীর এবং আমাকে দেখে সেটা যেন আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। ঘরের দরজায় উনি যে আমায় দেখতে চাননি, তা আমি বুঝি। ওঁর কাছে আমি 'অপয়া'। আমাকে দেখে ওপর নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে যে, ফাড়কে এখনও আসেনি। মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলাম। শেষে মুখে হাসি ফুটিয়ে আহ্বান করলাম: আসুন মিস ব্যানার্জি।

: না, আসব না। মানে আমার আরও কাজ আছে—মানে—

: আসব না বললে কি চলে? আসুন, আসুন।

অঞ্জলী ব্যানার্জি ইতস্তত করে মুখে একটা আনুনাসিক আওয়াজ তুললেন : হুঁ, মানে—আসোন—

: ফাড়কে এসেছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। সকালে আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেই আপনি তাঁকে ধরতে পারতেন।

অঞ্জলী ব্যানার্জি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কঠিন মুখখানা ধাপে ধাপে নরম এবং কোমল হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই রাজ্যের লজ্জা এসে আশ্রয় করল তাঁর চোখেমুখে। মাথা হেঁট করে তিনি নিজের লজ্জা গোপনের প্রয়াস পেলেন।

: হুস্ দেয়ার, মিস্টার মিত্র।—পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল ফাড়কে। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে তারও ঘুম ভেঙে গেছে।

: মিস ব্যানার্জি এসেছেন। আসুন মিস ব্যানার্জি।

আমার সামনে দিয়ে মাথা নীচু করে তিনি ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা ভেজিয়ে আমি চেয়ার এগিয়ে দিলাম। ফাড়কে উঠে এল এই ঘরে। যথারীতি অঞ্জলী ব্যানার্জির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি দুই-একটা ভদ্রতার বুলি বলে নীচে চায়ের দোকানে চলে গেলাম। ওদের মধ্যে এখন যে সব আলোচনা হবে তাতে আমার থাকা উচিত নয়।

: আপনাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি মিঃ ফাড়কে।

: থ্যাঙ্কস। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

: নীচের চায়ের দোকানে আছি।

: এখানেই বসুন না।

: নীচেই রইলাম। দরকার পড়লে না হয় ডেকে পাঠাবেন।

: পালাবেন না তো?

: না। পালাব কেন?

আমি হোটেলে বসে চা সিগারেট ওড়াতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফাড়কেও এল সেখানে।

: কথাবার্তা শেষ হল?

: হ্যাঁ হয়েছে, আপনি আসুন।

: মিসেস—আই মিন—তিনি কোথায়?

: চলে গেছে।

দোতলায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম : তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল?

: হ্যাঁ, তাই হল। এখন একবার যেতে হবে সেই ডাক্তারের কাছে।

: কেন?

: ডাক্তারের সঙ্গে একজন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের আলাপ আছে। তিনি নোটিশ পিরিয়ডটা মাফ করে দিতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আপনি সঙ্গে থাকবেন।

: আমি? কেন?

: বাঃ, আপনি যে বরকর্তা। মনে নেই? হ্যাঁ, এইমাত্র অঞ্জলীকে খুব বোকা বানালাম।

: কি রকম?

বললাম: "সকালবেলায় অশোকবাবুর কাছে তুমি নাকি আমার নামে যা তা বলেছ?" শুনে তো ফিউরিয়াস। বলল, "অশোকবাবু ইজ এ লায়ার।"

: আবার আমায় কেন বাধিয়ে রাখলেন মিঃ ফাড়কে? অকারণে একজন ভদ্রমহিলার বিরাগভাজন হওয়া—

: না না, পরে সব ম্যানেজ করে দিয়েছি। আরে মশাই, মেয়েদের ম্যানেজ করতে কতক্ষণ লাগে? একটু তোষামোদ করলেই গলে যায়। আর তোষামোদে আমার জুড়ি পাবেন না। পেশাই যে ঐ। ডাক্তারদের মন ভুলিয়ে কোম্পানির ওষুধ বিক্রি করা।

: কি বলে তোষামোদ করেন?

: ভাষাটা একটু স্থূলই হয়।

: কেমন?

: বলি, 'তোমার মত লক্ষ্মীমেয়ে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই'। ব্যাস তাতেই কাজ হয়ে যায়।

: সাবাস।—আমি হেসে উঠলাম: আপনি এমন নারীচরিত্র-বিশেষজ্ঞ হলেন কি করে?

: নারীচরিত্র-বিশেষজ্ঞ নই, মানবচরিত্র-বিশেষজ্ঞ। ওষুধের দালালী করতে এসে এত রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে যে, তাদের সকলের কথা লিখে রাখতে পারলে আমিও আপনার মত সাহিত্যিক হয়ে উঠতাম। দেখেছি মেয়েরা যে কথা শুনলে খুশি হয়, পুরুষরাও সেই কথা শুনলে খুশি হয়।

: কি রকম?

: ধরুন, আপনাকে যদি বলি 'অশোকবাবু আপনার চেহারাটা রোগা বটে, তবে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত। দেখলেই বোঝা যায় আপনার ভিতরে কিছু আছে'। শুনে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। ঠিক ওই কথাটাই যদি একটু অদলবদল করে অঞ্জলীকে বলি, 'তোমার গায়ের রঙটা ময়লা হলেও চেহারায় একটা স্বর্গীয় সুষমা আছে'। শুনে অঞ্জলী খুশি না হয়ে পারবে না।—সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে কতকগুলো ব্যাপারে মনের দিক দিয়ে নারী-পুরুষে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ও ব্যাপারে সকলেই মানুষ হিসাবে রিঅ্যাক্ট করে।

: চমৎকার!—আমি হেসে উঠলাম: মিঃ ফাড়কে, আপনি উপন্যাস লিখতে শুরু করুন। আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয়। সুন্দর জেনারালাইজ করেছেন।

: লিখব লিখব, তখন একটু দেখিয়ে টেখিয়ে দেবেন। এখন কাপড়-চোপড় বদলে নিন। বেরুতে হবে।

: এক্ষুণি বেরুবেন?

: হ্যাঁ।

: কোথায় কোথায় যাবেন?

: প্রথমে ডাক্তারের কাছে। সেখান থেকে অঞ্জলীর হোস্টেলে। তাকে তুলে নিয়ে মার্কেটে। অনেক কেনাকাটা আছে।

তার মানে এখন থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ওর সঙ্গে আমাকে আটক থাকতে হবে। প্রোগ্রামটা আমার পছন্দ হল না। সন্ধ্যায় যে অনুরাধাদের বাসায় যাবার কথা আছে। সেই ব্যবস্থার সঙ্গে ফাড়কের প্রোগ্রাম এমনভাবে ধাক্কা খাবে, তা আগে বুঝতে পারিনি। আমি বেশ একটু মনমরা হয়ে গেলাম। অনুরাধার কাছে না গেলে সে ধরে নেবে, আমার 'রাগ' এখনও 'যায়নি'। তাছাড়া আমি নিজেও যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ অনুরাধাকে একটু বুঝিয়ে দেব যে আমি তার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেখানে যাবার কোন সময়ই আজ পাওয়া যাবে না।

ফাড়কে জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন?

: সন্ধ্যায় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আপনার ডাক্তার কোথায় থাকেন?

: শ্যামবাজার।

: বাসে যাবেন?

: ট্যাক্সি ধরব।

: তাহলে যাবার সময় রাস্তায় মিনিট দশেকের জন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

: ঠিক আছে।

এ ছাড়া উপায় নেই। যাবার পথে অনুরাধাদের বাসায় নেমে প্রমাণ করতে হবে যে আমি তার উপর রাগ করিনি। তারপর দেখা-সাক্ষাতের আর একটা তারিখ ঠিক করা যাবে।

প্রায় সওয়া পাঁচটার সময় আমাদের ট্যাক্সি অনুরাধাদের বাসার সামনে পৌছল। ফাড়কেকে অপেক্ষা করতে বলে আমি দোতলায় উঠে গেলাম।

দরজা খুলে হাসিমুখে আমার সামনে দাঁড়াল অনুরাধা। সান্ধ্য সাজ-প্রসাধনে তাজা স্নিগ্ধসুন্দর সুগন্ধ তার নরম নমনীয় অবয়ব। ফাড়কের রোমান্সের কাহিনী মনে যে রঙীন নেশার আলো ফেলেছিল, তারই আভায় অনুরাধা অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে আমার চোখের সামনে। তার চকিত নয়ন, মসৃণ গাল এবং সুপুষ্ট অধরোষ্ঠ আমাকে দুঃসাহসের প্রেরণা দিতে লাগল। জানি না, কতক্ষণ আমি তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে সংযত রাখা আমার পক্ষে যে কত কঠিন, তা আমি সেই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম: আজ তোমার ইনট্যুইশন কি বলছিল? আসব?

অনুরাধার মুখখানা আরও লাল হয়ে উঠল। গ্রীবা বাঁকিয়ে সে তার ঠোঁট দুটো সামান্য উন্মুক্ত করল। গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরুল না। শুধু সাদা দাঁতের ধারগুলো লাল ঠোঁটের পেছনে চকচক করে উঠল। তার ভঙ্গিতে বোঝা গেল, আমি যে আসব তা সে জানত।

: তাহলে তুমি জানতে, আমি রাগ করিনি?

অনুরাধা জবাব দিল না। আমার মুখের দিকে এমন একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যে তাতে আমি আরও কাতর হয়ে পড়লাম।

: তোমার মা কোথায়?

অনুরাধা তখনও মৌন। যেন সে স্বপ্নাবেশে মূক হয়ে আসছে। তার কাজল রেখায় ঘেরা চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও চেতনা অবশ হয়ে আসতে চাইল। হঠাৎ নীচে মোটরের হর্ন শুনে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম।

: অনুরাধা—

আচমকা নিজের নাম শুনে তার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে যেন একটা

শিহরণ বয়ে গেল। চোখ বুঁজে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল: আসুন। মা পাশের ফ্ল্যাটে গেছেন। এক্ষুণি ফিরে আসবেন। হাঁটার প্র্যাক্টিস করছেন। আপনি এসে বসুন না।

: না অনুরাধা, আজ আর বসব না। একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছি। নীচে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তোমার ভুল ভাঙাবার জন্য অতি কষ্টে পাঁচ মিনিটের জন্য এখানে এলাম। নইলে আজ এখানে আসার কোন উপায় ছিল না। শুধু তোমার জন্য। সত্যি।

: কি এমন জরুরী কাজ?

: আমার এক বন্ধুর বিয়ে—সে এক বিরাট ইণ্টারেষ্টিং কাহিনী। পরের দিন এসে সব বলব। আজ আমি যাই। নীচে হর্ন দিচ্ছে শুনতে পাচ্ছ—স্বয়ং বর বসে আছে।

: তাই নাকি—ভ্রু বাঁকাল অনুরাধা: কবে আসবেন তাহলে?

: সপ্তাহের মধ্যেই একদিন আসব। যাই, কেমন?

অনুরাধা মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

: রাগ করলে না তো?

অনুরাধা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে রাগ করেনি। আমি আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। অনুরাধার সঙ্গে আজকের সাক্ষাৎকারের স্থায়িত্ব মাত্র পাঁচ মিনিট হলেও তার ব্যঞ্জনা সুগভীর। অনুভব করলাম, একটা বাইরের শক্তি যেন রাতারাতি আমাদের সম্পর্কে অভাবনীয় রূপান্তর এনে দিয়েছে। আমাকে দেখার পর তার আকস্মিক আত্মমগ্নতা এবং মৌন অভিব্যক্তি এক অনির্বচনীয় রহস্যানুভূতিতে হৃদয়ে সঞ্চরণশীল। মনে হল, অনুরাধা এতদিনে আমার চিত্তের আহ্বানে অনুকূলভাবে সাড়া দেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমি অন্তরে তার পদসঞ্চারের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

: কোথায় গিয়েছিলেন অশোকবাবু? প্রশ্ন করল ফাড়কে।

: পরিচিত লোকের বাড়িতে।

: সেখান থেকে ফেরা অবধি ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। ব্যাপার কি? কোন গুরুতর কাজ ছিল নাকি?

: নাঃ।

: তাহলে? কোন বান্ধবীর সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট ছিল বোধ হয়?

: কি করে জানলেন ?

: যে রোগে এতদিন ভুগেছি, আপনার মধ্যে তারই দুই একটা লক্ষণ নজরে পড়ছে।

আমি বললাম : না, সে সব কিছু নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

ফাড়কে আর কোন কথা বলল না। আমি অনুরাধার চিন্তায় এমন আনমনা হয়ে গেলাম যে গাড়ি কখন থেমেছে খেয়ালই করিনি। ফাড়কে দরজা খুলে আমার হাত ধরে টানল : অশোকবাবু। ইউ আর ইন এ ট্রান্স। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। সম্ভবত আমি আপনার উপর একটু জুলুম করছি।

: না না, আপনার ধারণা ঠিক নয়।

গাড়ি থেকে নেমে ফাড়কের পেছন পেছন ডাঃ নরেন মল্লিকের চেম্বারে গিয়ে উঠলাম। গল্পগুজব ঠাট্টা-তামাসায় মিনিট কুড়ি কাটবার পর ডাঃ মল্লিক তাঁর পরিচিত ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এলাম হেদোর কাছে একটা মহিলা হোস্টেলে। অঞ্জলী ব্যানার্জি তৈরি হয়ে ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। সকাল এবং দুপুরে তাঁকে যে রকম সাদাসিধে পোশাকে মনমরা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, সন্ধ্যায় ঠিক তার বিপরীত। সাজ-প্রসাধনে একেবারে স্ট্রীম্‌লাইন্‌ড্‌। একটা চাপা আনন্দ এবং উত্তেজনায় মুখখানা হাসিখুশি এবং জ্বলজ্বলে। আমি তাঁকে জায়গা দেবার জন্য পেছনের সিট ছেড়ে সামনের সিটে বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি হাত তুলে নিষেধ করলেন এবং দরজা খুলে নিজেই ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন।

নিউ মার্কেটে পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর তাদের পেছন পেছন একের পর এক কত যে কাপড়ের দোকানে ঢোকা হল তার হিসাব নেই। সন্ধ্যায় অনুরাধার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে কেনাকাটার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সারাক্ষণ আমি একটা আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলাম। ফাড়কে-ব্যানার্জির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেও আমার মনটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। জানি না ফাড়কেরা আমার এই মানসিক

অবস্থা বুঝতে পেরেছিল কি-না। তারা প্রত্যেকটি কাপড় আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল, "এটা কেমন অশোকবাবু? ভালই ম্যাচ করবে, কি বলুন?" আমি কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করে সবগুলোকেই 'ভাল' বলে চালাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার মন কেড়ে নিচ্ছিল ফাড়কের হাতের নোটের তাড়াগুলো। বোধহয় হাজার তিন-চার টাকা নিয়ে সে বাজারে এসেছে। আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। অঞ্জলী ব্যানার্জিকে দারিদ্র্যের পীড়ন সইতে হবে না।

ফেরার পথে গাড়িতে গোটা আষ্টেক কার্ডবোর্ডের বাক্স উঠল। সেগুলো আপাতত কোথায় থাকবে তা নিয়ে ফাড়কে এবং মিস্ ব্যানার্জির মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ফাড়কে বলল, 'ওগুলো তুমি হস্টেলে নিয়ে যাও।' আর মিস্ ব্যানার্জি বললেন, 'ওগুলো তোমার ওখানেই থাক। হস্টেলে নিয়ে গেলে সবাই নানারকম প্রশ্ন করবে।' শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ওগুলো ফাড়কের কাছেই থাকবে।

পরের কটা দিন কারখানা আর ফাড়কের কাজে আমাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হল। অনুরাধার কাছে যাবার কোন সময়ই পেলাম না। শনিবার রাত্রের ট্রেনে ফাড়ককে সস্ত্রীক পাটনায় চালান না করা পর্যন্ত অনুরাধার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হল না। ফলে আমি একটা চাপা মানসিক অসন্তোষে ভুগতে লাগলাম।

বিয়ের দিন স্থির হয়েছে শুক্রবারে বিকেলে। লগ্নটা নাকি শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সুলক্ষণ যুক্ত। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অশাস্ত্রীয় বিয়েটাকে যতদূর সম্ভব শাস্ত্রীয় পরিধির মধ্যে টেনে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক রক্ষণশীলতা এবং অরক্ষণশীলতার চমৎকার সংমিশ্রণ।

ফাড়কের আগ্রহে বৃহস্পতিবার কারখানা থেকে শর্টলীভ এবং শুক্রবার পুরো ছুটি নিতে হল। ফাড়কে একটা ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থা না করে পারছেন না। বিয়ের কথা তাঁর কলকাতার অফিসে জানাজানি হয়ে গেছে। তাদের না খাওয়ালেই নয়। তাছাড়া অঞ্জলী ব্যানার্জিরও দু'একজন গেস্ট থাকবে। ডাক্তার আর তাঁর বোনকে তো বাদ দেওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এই বিয়েতে তারাই ছিলেন যোগসূত্র।

বৃহস্পতিবার বিকেলে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে ফাড়কে আর আমি আগামীকালের ব্যবস্থা সম্পর্কেই আলোচনা করছিলাম। খাওয়ার অর্ডারটা

দেওয়া হয়েছে নীচের হোটেলে। তারা নিজেদের লোকজন আসবাব-পত্র দিয়ে অতিথিদের পুরো আপ্যায়ন করে যাবে। আমরা শুধু দাঁড়িয়ে তদারক করব। জায়গার একটা অভাব হবে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু উপায় কি?

: জায়গার খুব অভাব হবে না অশোকবাবু। বড় ঘরের খাটখানা ছোট ঘরে নিয়ে এখানে খাবার টেবিল পেতে দিলেই হবে।—বলল ফাড়কে।

: এ ঘরে যদি খাবার টেবিল পড়ে তাহলে আপনার বউ এসে বসবেন কোথায় আর ফুলশয্যাই বা হবে কোথায়? অতিথি অভ্যাগতরা আসবেন 'বউ' দেখতে। কাল হবে বউয়ের একজিবিশন। কাজেই তাঁর জন্য একখানা আলাদা বড় ঘর চাই। সেই ঘরখানা আবার ফুলপাতা, ধুপধুনো, আলো রঙ গন্ধ দিয়ে সাজাতে হবে।

ফাড়কে হাসতে হাসতে বলল: সাজাবে কে? ও সব হল মেয়েদের ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশত কলকাতায় আমার কোন মহিলা বন্ধু নেই। স্থতরাং ওসব ড্রপ করে দিন।

: তা কি হয়? অনুষ্ঠানের শিল্পকলার দিকটা বাদ দিয়ে শুধু খাওয়া-দাওয়া করলে সেটা ভাল লাগবে না। মেয়ে নাইবা থাকল। ডেকরেটর ডেকে সাজিয়ে নেওয়া যাবে।

ফাড়কে আড়ম্বরপ্রিয়। অবস্থা স্বচ্ছল। কাজেই আইডিয়াটা তার মনে লাগল। ঘরের সাজসজ্জা কি রকম হলে ভাল দেখাবে তাই নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা গোটা আষ্টেক সিগারেট পুড়িয়ে ফেললাম।

হঠাৎ দরজায় একটা ছোট আওয়াজ হল। তাকিয়ে দেখলাম অনুরাধা। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে নিজের দরজায় দেখে আমি দ্রুত পায়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

: এস। কি ব্যাপার?

: না, আসব না। বাড়ি ফিরতে হবে। দেখতে এসেছিলুম, আপনি কলকাতায় আছেন কিনা।—গম্ভীর গলায় বলল অনুরাধা।

: না, মানে, আমি একটু আটকে গেছি। কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। আজ ভাবছিলাম তোমাদের বাসায় যাব। এসে বস না। সব বলছি। প্লিজ।

: না: —বসব না—

: সে কি কথা? বাড়ির দরজা থেকে অতিথি বিদায় নিলে গৃহস্থের

অকল্যাণ হয় যে।—বলল ফাড়কে। কখন যে সে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করিনি। আমি হতচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

: মিঃ ফাড়কে, ইনি অনুরাধা সরকার—আমার মানে-মানে হ্যাঁ আত্মীয়ই বলা চলে। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্য। আর ইনি হলেন মধু ফাড়কে। স্টিফেন জেরি কোম্পানীর পাটনার ডিপো ম্যানেজার এবং এই ফ্ল্যাটের প্রকৃত মালিক।

নমস্কার বিনিময়ের পর দুজনের পরস্পরের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ফাড়কে হাতজোড় করে বলল: দয়া করে আপনি ভিতরে এসে বসুন। আজ শুভদিনে গরীবের ঘরে আপনার মত সুচরিতার পদধূলি পড়ল—এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য।

তার কথা বলার নাটকীয় ভঙ্গি দেখে অনুরাধা মুখ টিপে হেসে ফেলল। এটা ফাড়কের বিশেষ গুণ। অপরিচিত লোককে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জমিয়ে ফেলে। অনুরাধা ধীর পায়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল। ফাড়কের সামনে আমি তাকে 'তুমি' ডাকতে সাহস পেলাম না।

: মিস সরকার, গোড়াতেই আপনাকে একটা সুখবর শুনিয়ে রাখি। আগামীকাল মিস্টার ফাড়কের বিয়ে।

ফাড়কে হাতজোড় করে বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল আমার উদ্বাহ। সেই আনন্দে আজ যদি একটু প্রগলভ হই সেটা ক্ষমা করবেন।

অনুরাধা আবার হেসে ফেলল। ফাড়কের এই কৃত্রিম নাটকীয়তাতায় তার রসবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে।

: আমার যতদূর মনে হয় মিস সরকার বৌবাজারের পেছনে থাকেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ, কি করে জানলেন?

: আপনার সঙ্গে একদিন ওঁদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছিলাম বলে মনে পড়ছে।

বললাম: হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন।

: তাহলে উনি শুধু আমাদের আত্মীয়া নন, পড়শীও বটে।

: তা বলতে পারেন।

: সেইজন্যই মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান আছেন।—ফাড়কে হাত কচলাতে কচলাতে এমন একটা স্বস্তির ভাব দেখাল যেন তার মস্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। অনুরাধা আমাদের পড়শী হবার ফলে

ভগবানের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণিত হয়, তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অনুরাধাও কিছু বুঝেছে বলে মনে হল না। একবার আমার এবং একবার ফাড়কের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতে লাগল।

: এত বড় একটা বিয়ে হচ্ছে অথচ বরের বাড়িতে না আছে শাশুড়ি, না আছে ননদ। অতিথিরা এসে দেখবে, একমাত্র নতুন বউ ছাড়া বাড়িতে আর দ্বিতীয় মহিলা নেই। ভেবে ভেবে মনটা মুষড়ে পড়েছিল। তাই ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। মিস সরকারকে পেয়ে গেলাম। কাল উনিই হবেন এ বাড়ির কর্ত্রী।

: না না, সে কি—আমি—

: না বললে শুনব না ভাই। আপনি যখন অশোকবাবুর আত্মীয়া তখন আমারও পর নন। দাদার এ অনুরোধটা রাখতেই হবে। বিয়েতে ফেমিনাইন টাচ না থাকলে সে বিয়ে বিয়েই নয়।

: এ সব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ মিঃ ফাড়:ক। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

: আমি যা ভাবছি, তা ঠিকই ভাবছি। আপনি উপস্থিত থাকলেই কালকের অনুষ্ঠান রঙে-রসে-গন্ধে অপরূপ হয়ে উঠবে।

অনুরাধা ফিক করে হেসে ফেলল: আপনি বেশ মজার লোক মিঃ ফাড়কে। আমার উপর কতকগুলো গুণ জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

ফাড়কে হাসতে হাসতে বলল: আজ্ঞে না, জোর করে আমি কিছু চাপাই নি। কোনদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে কথা বললেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এবার অনুরাধা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তার অপ্রস্তুতভাব দেখে আমি বললাম: বেশ তো, সময় পেলে সন্ধ্যায় একবার আসবেন। মিঃ ফাড়কে যখন এমনভাবে অনুরোধ করছেন। কোন মহিলা সঙ্গী পেলে ওঁর নতুন স্ত্রী খুব খুশি হবেন।

: শুধু সন্ধ্যায় একবার এসে দেখা দিয়ে গেলে চলবে না। অতিথিরা না চলে যাওয়া পর্যন্ত ওঁকে থাকতে হবে। উনি যে হোস্টেস। তারপর সব কাজ হয়ে গেলে আমরা সবাই মিলে ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব।

কথা শুনে অনুরাধা জিজ্ঞাসুনয়নে আমার মুখের দিকে তাকাল। এদেশে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের অসাধারণ কৌতূহল। আগেকার দিনে একমাত্র

বিবাহই ছিল মেয়েদের জীবনের একমাত্র স্মরণীয় উৎসব। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেই মানসিকতার জের মেটেনি। কাজেই অনুরাধা যে এই আকস্মিক নিমন্ত্রণে আগ্রহবোধ করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে খুব সম্ভবত ভব্যতা এবং শিষ্টাচারের প্রশ্নে সে দ্বিধাগ্রস্ত। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোকের বিবাহে কর্ত্রীত্ব করার প্রস্তাব তার কাছে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক লাগছে।

: দাঁড়ান, আমি মিস সরকারের জন্য চা বলে আসি।—ফাড়কে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমাকে একলা পেয়ে অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল : কি ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ উনি আমায়—

: ফাড়কে একটু হুজুগপ্রিয়, কিন্তু খুব ভাল লোক। সময় পেলে কাল এসো না।

: অনেক লোক আসবেন তো?

: না না, সামান্য কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ফাড়কের হবু স্ত্রী বাপ মাকে লুকিয়ে বিয়ে করছেন। তাই মোটামুটি গোপনেই কাজ সারা হচ্ছে।

: গোপনে বিয়ে—? অনুরাধা চোখ বড় বড় করে তাকাল।

আমি তাকে সংক্ষেপে বিয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ফাড়কেও ফিরে এল।

: তাহলে কথা ঠিক রইল মিস সরকার। আপনি আসছেন।

অনুরাধা সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় কাত করল। বিয়ের কাহিনী শুনে সে নিশ্চয়ই বেশি আগ্রহ বোধ করেছে।

গোটা দুই পেস্ট্রি আর এক কাপ কফি খেয়ে যখন সে বিদায় চাইল, তখন তার সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম এবং তাকে তার বাড়ির রাস্তায় তুলে দিয়ে নিজেদের কাজে চলে গেলাম। আলাদাভাবে তার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না।

পথে ফাড়কেকে বললাম : কি ব্যাপার মশাই, হঠাৎ ওকে নিয়ে অমন নাটুকেপনা করলেন কেন?

ফাড়কে হাসতে হাসতে বলল : ভয় নেই দাদা, নাটকে নায়কের পার্ট আপনার। আমি শুধু পার্শ্ব-চরিত্রে নামবার চেষ্টা করছি মাত্র।

: অর্থাৎ ?

: অর্থাৎ এই জীবন-নাট্যে আপনি নায়ক, মিস সরকার নায়িকা এবং আমি কমিক।

: আপনার কল্পনায় উর্বরতা আছে স্বীকার করতে হবে, তবে ওটা নিছক কল্পনাবিলাস।

ফাড়কে কোন জবাব না দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল এবং পরেও এ প্রসঙ্গ নিয়ে সে আর কোন কথা বলল না। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল অনুরাধাকে নিমন্ত্রণ করে ফাড়কে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। বিয়ের দিন সকাল থেকেই অঞ্জলী ব্যানার্জি গম্ভীর এবং মনমরা হয়ে আছেন। তাঁর মুখের হাসি কে যেন হঠাৎ কেড়ে নিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পেয়ে মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করছেন বটে তবে সে হাসি মুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আগের দিন রাত্রি পর্যন্ত যিনি বিয়ের খুশিতে টলমল করছিলেন, পরদিন সকালেই তাকে এমন বিমর্বভাব পেয়ে বসল কি করে, তা ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। পরে মনে হল, বাপ-মাকে লুকিয়ে বিয়ে করছেন বলে শেষ মুহূর্তে ভদ্রমহিলা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এতকালের সুপরিচিত সংস্কার তাঁকে পিছু টেনে দুর্বল করে দিয়েছে।

: বাড়ির জন্য মন কেমন করছে বোধ হয় ?—চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

অঞ্জলী ব্যানার্জি কেমন যেন চমকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে একটা হাসির রেখা টেনে আবার মাথা নীচু করলেন। বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু কি করলে যে তাঁর এই মানসিক অবসাদ কাটবে তা ভেবে পেলাম না। সাজসজ্জা উৎসব-আনন্দ কোন কিছুতেই যেন তাঁর উৎসাহ নেই। রেজিস্ট্রারের বাড়ি থেকে ফিরে ঘরের কোণায় চুপটি করে বসে মলিন মুখে আকাশপাতাল ভাবছেন। তাঁকে ট্রাজেডির অভিভূত নায়িকার মত করুণ দেখাচ্ছে। ডাক্তারের বোন এলে হয়তো তিনি অঞ্জলীকে উদ্দীপ্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের বিয়ের পাকাদেখায় আটক পড়ে বান্ধবীর বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। সন্ধ্যায় অনুরাধা এসে অঞ্জলীকে

অনেকটা চাঙ্গা করল বটে তবে তার স্পিরিট পুরোপুরি তুলতে পারল না। ফলে অতিথি-অভ্যাগতদের কাছে অনুরাধাকে সত্যিই গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা নিতে হল।

আমার ধারণা ছিল, সমাজ-সামাজিকতায় অনুরাধা তেমন রপ্ত নয় কিন্তু সে ধারণাটা ভুল। ফাড়কের বন্ধুরা অধিকাংশই অবাঙালী। অনুরাধা তাঁদের অভ্যর্থনা করে গল্পগুজবে এমন জমিয়ে রাখল যে, আমি তার কৃতিত্ব দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ও যে কোন লোকের সঙ্গে নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিতে পারে। নিজের কমনীয়তা, শিষ্টাচার এবং আলাপ ব্যবহারের মাধুর্য দিয়ে সারাক্ষণ সে অতিথিদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, সকলের মুখেই তার প্রশংসা। তার এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে আমি মনে মনে দারুণ গর্ববোধ করতে লাগলাম। আজ সে স্মার্ট সাজপোশাক এবং কয়েকটি নির্বাচিত অলঙ্কার পরে এসেছে। প্রসাধন ত্রুটিহীন। কিন্তু তার দৈহিক আকর্ষণের চেয়ে মধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনেক বেশি। সেইটাই আমাকে আনন্দ দিল বেশি।

খাবার টেবিলে সকলেই বর কনে এবং হোস্টেসের স্বাস্থ্য কামনা করে কফির কাপে চুমুক দিলেন। ঘরের যেখানে যত ফুলের মালা ছিল সব তাঁরা পরিয়ে দিলেন ফাড়কে অঞ্জলী আর অনুরাধার গলায়। সবাই বললেন "বর ভাল, কনে তার চেয়ে ভাল আর এনচ্যান্টিং হোস্টেস অতুলনীয়।"

ফাড়কে চেয়ার ছেড়ে দু'পা পেছু হ'টে বক্তৃতার সুরে বলল: বন্ধুগণ, আপনারা আজ অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার আমন্ত্রণ রাখতে এসেছেন—এ আমার পরম সৌভাগ্য। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে মিস সরকার—এনচ্যান্টিং হোস্টেস—না থাকলে আজকের এ অনুষ্ঠান কোনক্রমেই সফল হতে পারত না। তাঁর কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সকলের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে এই ক্ষুদ্র উপহারটি পরিয়ে দিতে চাই।

বক্তৃতা শেষ করেই পকেট থেকে একটা সোনার নেকলেস বার করল ফাড়কে। অতিথিরা সকলেই তার প্রস্তাব অনুমোদন করে এমন বিরাট স্বরে

উল্লাস প্রকাশ করলেন যে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। অনুরাধা দাঁড়িয়ে উঠে আপত্তির স্বরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সকলের উল্লসিত চিৎকারে তার কথা চাপা পড়ে গেল। ফাড়কেকে সে আর বাধা দিতে পারল না। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, অঞ্জলীকে দেবে বলে যে হারটা ফাড়কে দু'তিন দিন আগে কিনে এনেছিল, সেইটাই অনুরাধার কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে। টেবিলের ওপার থেকে বার বার সে বিব্রতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু আমি কোন সাড়া দিলাম না।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ বিস্ময়কর লেগেছিল। ফাড়কের আবেগ প্রবণতা এবং নাটকীয়তা যে এতদূর উঠতে পারে, তা আমি ভাবতে পারিনি। সত্যি, আজকের অনুষ্ঠানে অনুরাধাই প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাতে ফাড়কের খুবই খুশি হবার কথা। সেই খুশিটা যে সে এতখানি মূল্য দিয়ে প্রকাশ করবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল? সত্যিকারের হুজুগে লোক বলতে ফাড়কেকেই বোঝায়। অবশ্য এখানে একটা অন্য ঘটনাও আছে। অঞ্জলীকে অনুরাধা একটা দামী সাড়ি উপহার দিয়েছে। সামাজিক নিয়ম অনুসারে এ অবস্থায় দাদার কাছ থেকে ছোট বোনের একটা বেশি মূল্যবান উপহার পাবার কথা। হারটা অনুরাধার গলায় পরাবার আগে সে কথাও ফাড়কের মনে হয়ে থাকবে।

রাত ন'টায় অতিথিরা সবাই বিদায় নিলেন। এবার অনুরাধার পালা। বাড়ি ফেরার আগে হারটা ফিরিয়ে নেবার জন্য সে আর একবার ফাড়কে এবং অঞ্জলীকে অনুরোধ করল কিন্তু তারা সে অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না।

অনুরাধা বিরক্তভাবে বলল : এ রকম হবে জানলে আমি কিছুতেই এখানে আসতাম না। এখন বাড়ি গিয়ে মার কাছে বকুনি খেতে হবে।

: কেন?

: ব্যাপারটা তিনি পছন্দ না-ও করতে পারেন।

ফাড়কে হাসতে হাসতে বলল : মায়ের নামে দোষ দিচ্ছেন কেন। চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। ঐ সঙ্গে মাকেও প্রণাম করে আসব। এস অঞ্জলী।

: চমৎকার, তাই চলুন। বউদি আসুন। কাছেই আমাদের বাসা। মা খুব খুশি হবেন।

ওরা তিনজন বেরিয়ে গেল। আমার যাওয়া হল না। ঘরগুলো পরিষ্কার

করে হোটেলওয়ালার জিনিসপত্র সরিয়ে দিতে হবে। নইলে রাত্রে ঘুমোবো কোথায় ?

ফাড়কেরা ফিরে এল রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। মিসেস সরকার নাকি তাদের পেয়ে ভারী খুশি হয়েছিলেন এবং কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না। তারা মিসেস সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সরকাররা আমার কি রকম আত্মীয় হন, তাই জানতে চাইল ফাড়কে। আমি সংক্ষেপে তাঁদের ঘটনাটা বললাম। গল্প গুজবে রাত বারোটা বাজলে আমরা নিজের নিজের কামরায় শুতে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে আমি যখন কারখানায় বেরোই তখনও ফাড়কেরা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হল না।

দুপুরে বাসায় ফিরে দেখি পাটনায় যাবার আয়োজন চলছে। অঞ্জলী ব্যানার্জি হস্টেল থেকে তাঁর সমস্ত মালপত্র নিয়ে এসেছেন। স্বামীস্ত্রীতে মিলে তাই বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। গতকাল অঞ্জলীকে যেরকম বিমর্ষ এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল, আজ আর তেমন দেখাচ্ছে না। আজ তিনি বেশ হাসিখুশি এবং চটপটে। বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় তাঁর ভয় ভাবনা দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। আমাকে বললেন : আজ বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম। পাটনায় গিয়ে আবার চিঠি দেবো।

: ভালই করেছেন।—বললাম আমি : বিয়ের আগেও তাকে জানাতে পারতেন। তাতে কোন ক্ষতি হত না।

: হত না ?

: আমার তো তাই মনে হয়। এ সংবাদে তাঁর খুশি না হবার কোন কারণ নেই। মিঃ ফাড়কের মত জামাই পাওয়া কি সোজা কথা ? লেখাপড়া জানা করিৎকর্মা লোক। ভাল চাকরী করেন। মানুষ হিসাবেও আদর্শ স্থানীয়। আর কি চাই।

শুনে অঞ্জলী ব্যানার্জি হেসে ফেললেন। স্বামীর প্রশংসায় খুশি হয়েছেন। বললেন : কি জানি, আমার বড় ভয় ভয় লাগছিল। বাবা হয়ত অনুমতি দিতেন কিন্তু মা বড্ড গোঁড়া।

: গোঁড়ামি থাকবে না। সব শুনলে তাঁরা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। বাপ মা মেয়ের সুখসমৃদ্ধি চান। এক্ষেত্রে সেদিকটায় যখন পুরো গ্যারাণ্টি রয়েছে, তখন তাঁরা মিছিমিছি অসন্তোষ পুষে রাখবেন কেন !

: আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।—হাল্কা সুরে বললেন অঞ্জলী ব্যানার্জি।

: শুধু তুটো ফুল আর গোটাকতক চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কাজ সারলেন।—আমি ঠাট্টা করলাম : ফাড়কে সাহেব উদার হস্ত। কাল শ' তিনেক টাকা দামের একটা নেকলেস দিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছেন। আপনি কৃপণ। তাই শুধু ফুল আর চন্দন।

: আপনি যদি নেকলেস পরতে পারেন, তাহলে এক্ষুণি আমারটা আপনাকে পরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। আমি কৃপণ হলে আপনি হিংসুটে। সামান্য একটা কলেজে পড়া মেয়েকে হিংসে করছেন। কিন্তু তার কি দরকার? নেকলেস পরাবার লোক ঘরে আসুন, তখন না হয় উদারতা দেখানো যাবে। আগেই অত অধৈর্য হচ্ছেন কেন?

আমরা তুজনেই হেসে উঠলাম।

রাত্রের ট্রেনে তাদের পাটনায় পাঠিয়ে যখন বাসায় ফিরে এলাম তখন বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। গত এক সপ্তাহ ফাড়কে গাল-গল্প হাসি ঠাট্টায় একাই একশ' হয়ে ছিল।

ফাড়কে এবং অঞ্জলী তুজনকেই আমার বেশ ভাল লেগেছে। ওদের পারস্পরিক অনুরাগ যে খুব গভীর তা বেশ ভাল করেই অনুভব করেছি। আমার মনে হয়, দাম্পত্য জীবনে ওদের সুখের অভাব হবে না। কেন হবেনা সে কথা বিশ্লেষণ করতে বসলে আমি একটা বিচিত্র সত্যে গিয়ে পৌছোই। মানুষের মনে সচেতন প্রেমের উন্মেষ হয়েছে তার জন্মের বহু হাজার বছর বাদে। প্রেম মানবিক কৃষ্টিরই অঙ্গ। আদিম মানুষ আহার বাসস্থান সংগ্রহ এবং বিরূপ প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষায় এত ব্যস্ত থাকত যে তার সংস্কৃতি বিকাশের তেমন অবসর মিলত না। যখন সে অনেকটা সভ্য এবং সমাজবদ্ধ হয়ে আহার বাসস্থান সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে তখনই সে পেয়েছে তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের অবকাশ। কৃষ্টির অন্যান্য অংশের মত প্রণয়-চর্চার জন্যও চাই নিশ্চিন্ত অবসর। ভাল ছবি আঁকতে শিল্পীর দীর্ঘকালের একাগ্র সাধনা চাই। সেই সাধনা যদি আহার বাসস্থানের তুশ্চিন্তায় ব্যাহত হয়, তাহলে শিল্পীর শিল্প সাধনায় একাগ্রতা থাকতে পারে না। তখন তার হাত দিয়ে ভাল ছবি নাও বেরুতে পারে। নিশ্চিন্ত অবসরের গ্যারান্টি হল সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদ। ফাড়কের আর্থিক বনিয়াদ মোটামুটিভাবে দৃঢ়। কাজেই তাদের প্রণয় চর্চা অনেকটা নির্বিঘ্ন।

তাহলে কি যার আর্থিক স্বচ্ছলতা অথবা কাজে অবসর নেই, তার প্রেম নিছক মায়া? তাও নয়। মানুষের মনে প্রথম প্রেমোন্মেষের পর ওটা তার সহজাত গুণে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষের জীবনে প্রেম একটা অবিভাজ্য সত্তা। তাকে আর এড়াবার উপায় নেই। তাই দারিদ্র্যের পীড়নে নিষ্পেষিত শিল্পীর হাত দিয়েও মাস্টারপিস ছবি বেরিয়ে যায়। অতি অভাবগ্রস্ত নরনারীর জীবনেও প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। তবু মনে হয়, যেখানে অভাব অনটন, সেখানে প্রেম বাস্তব অবাস্তবের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। সকাল বিকেল যে পেটের চিন্তায় দিশেহারা সে যে কোন প্রেমে প্রণয়ীকে উদ্দীপ্ত করবে তা ভেবে বার করা একটু কঠিনই। তাই কল্পনা আর উচ্ছ্বাসের স্তর পেরোলেই সে প্রেম প্রকৃতির প্রাপ্য চুকিয়ে নিছক বাঁচার তাগিদে এসে দাঁড়ায়। সে যেন জীবনের কয়েকটা আধা আস্বাদিত মূল্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা।

তাই বা মন্দ কি? বাঁচাটাই যখন জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তখন সেই বাঁচাটাকে যতদূর সম্ভব মোহময় করে তোলাই বাঞ্ছনীয়। যে কথায় মায়া আছে, যে চিন্তায় মোহ আছে, যে অনুভূতিতে তৃপ্তি আছে তার প্রতি যোল আনা আসক্তি বজায় রাখতে হবে। মায়া এবং মোহের সারতা অসারতা অথবা প্রেমের অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করলে কি এমন এসে যায়? সুখী হওয়াই যখন জীবনের পরম লক্ষ্য, তখন যেখানে যতটুকু সুখের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান থেকে ততটুকু সুখ আহরণ করে সুখী হবার চেষ্টা করাই ভাল।

পরদিন ছিল রবিবার। বিকেলে অনুরাধাদের বাসায় গিয়ে দেখি অনুরাধার কাঁধে হাত দিয়ে মিসেস সরকার একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারছেন দেখে আমি খুশি হলাম। ভদ্রমহিলা সত্যিসত্যিই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দেখলে কে না আনন্দিত হয়?

: হ্যালো।

আমার আহ্বানে ওঁরা দুজনেই ফিরে তাকালেন এবং আমাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন।

: বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ?

: হ্যাঁ। আজ প্রথম রাস্তায় বেরিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। কোন কষ্ট হয়নি।—উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে জবাব দিলেন মিসেস সরকার।

: আপনি এখন আমাদের মতই সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ। খুব আনন্দের কথা।

: সত্যি, আজ রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে আমার মনোবল ফিরে এসেছে। খুব হাল্কা বোধ করছি।—হাসিমুখে বললেন মিসেস সরকার।

: চল, উপরে গিয়ে তোমার বন্ধুদের গল্প শুনি।

দোতালায় অনুরাধার পড়ার ঘরে গিয়ে মিসেস সরকারের মুখোমুখি বসলাম আমি। অনুরাধা তার টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফাড়কে অঞ্জলীর বিয়ের ব্যাপারটা যতটুকু জানি বললাম। তাদের সঙ্গে আমার সামান্য কয়েকদিনের পরিচয় জেনে মিসেস সরকার অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

: তাহলে তুমি ওদের বাড়ির খবর কিছু জান না ?

: আজ্ঞে না। ওরাও বিশেষ কিছু বলেনি, আমিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিনি। কিন্তু ওদের বিয়েটা যে সুখের হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। দুজনের মনই বেশ উদার এবং নমনীয়। দেশীয় বিবাহ শাস্ত্রে যাকে রাজযোটক বলে ওদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

এ বিষয়ে মিসেস সরকারও আমার সঙ্গে একমত। ওদের দুজনের চেহারাতেই নাকি বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। ফাড়কের অমায়িক এবং সরল সহজ ব্যবহারে মিসেস সরকার মুগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে তার মাতৃ সম্বোধন তাঁর কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে উঠেছে। তবু অনুরাধাকে উপহার দেওয়া তাদের নেকলেসটা তাঁর মনে একটা খটকা না রেখে পারেনি।

: একি ছেলেমানুষী বলত। দাদার বিয়েতে ছোটবোন দাঁড়িয়ে কাজকর্ম করবে, তার আবার কৃতজ্ঞতাই বা কেন আর অত দামী উপহার দেবারই বা কি আছে। বিয়েতে আমরা সামান্য একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলাম না আর সে কিনা—নেকলেসটা নিশ্চয়ই অঞ্জলীর জন্যই কিনেছিল।

আমি অনুরাধার দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টার সুরে বললাম : কার জন্য কিনেছিল সে-ই জানে। হুজুগে লোক। এ সব না করতে পারলে তার মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ওসব ভাইবোনের ব্যাপার। ওতে আপনার আমার মাথা না দেওয়াই ভাল।

: আপনি একজন একম্‌প্লিস—তাঁর অকাজের সহচর।—অনুরাধা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করল: আপনি বললে তিনি নিশ্চয়ই ওটা ফেরৎ নিতেন।

মিসেস সরকার মেয়ের কথা শুনে হেসে উঠলেন।

: এ ব্যাপারে আমি নিরপেক্ষ। কটু কথা বলে আমাকে ওস্কানো যাবে না। তাছাড়া ফাড়কে গুরুতর কোন অপরাধ করেছে বলেও তো মনে হয় না। তার উপর আপনি অকারণেই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

: অসন্তুষ্ট হইনি।—মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করল অনুরাধা: অপ্রস্তুত হয়ে গেছি।

: হলেই বা। সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে তার কি মানে আছে?

: না, কোন মানে নেই।—দাঁতে ঠোঁট চাপল অনুরাধা: ভবিষ্যতে দেখা হলে তাঁদের কি করে অপ্রস্তুত করতে হয় তাও আমার জানা আছে।

: সেই তো ভাল। Tit for tat.

মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বললেন: আচ্ছা ও ঝগড়া এখন থাক। আমি যা বলছিলাম শোন। শীতকাল থাকতে থাকতে এস একটু বেড়ানো যাক। বছরের পর বছর বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে থেকে আমি বাইরের পৃথিবীটাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছি। আজ রাস্তায় বেরিয়ে কি আনন্দই যে হয়েছিল।

: আপনি কি এখন বাইরে বেড়াতে যাবার উপযুক্ত হয়েছেন?—আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

: বাইরে মানে বেশিদূর নয়। ঘরের বাইরে অর্থাৎ কলকাতা এবং তার আশপাশে।

: বেশ তো, মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে অথবা পার্কে গিয়ে বসতে পারেন। আমি আপনার সঙ্গে থাকব।

: চমৎকার। তাহলে সামনের রবিবারে কোথাও যাওয়া যাবে। কেমন?

আমি সম্মতি জানালাম। কলকাতা এবং আশপাশে কোথায় বেড়াবার জায়গা আছে তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল, প্রথম দিন ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসা হবে।

এরপর চা খেয়ে যখন বাসায় ফিরছি তখন অনুরাধা আমার পেছন পেছন এক তলায় নেমে এল।

: অশোকবাবু।

: আমি সাগ্রহে পেছু ফিরলাম।

: একটা মজার কথা আছে।

: কি বলত।

অনুরাধা মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে বলল: আপনি খুব অদ্ভুত লোক কিন্তু।

: কেন?

: কখনও 'আপনি' বলেন, কখনও 'তুমি' বলেন। কি ব্যাপার?

: 'তুমিই' বলতে চাই কিন্তু অপরের সামনে 'তুমি' বলতে সঙ্কোচ লাগে।— কোনকিছু না ভেবেই জবাব দিয়ে দিলাম। কিন্তু ওভাবে জবাব দেওয়া যে উচিত হয়নি সেটা পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম।

: সঙ্কোচ লাগে কেন?

এই ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মনে মনে এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। তাতে আমি নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আমার ভাব দেখে 'কেনর' একটা জবাব অনুমান করে থাকবে। তৎক্ষণাৎ চোখ দুটো নামিয়ে নিল। সমস্ত ব্যাপারটায় আমি অপ্রতিভবোধ করতে লাগলাম। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তখনই সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

: হ্যাঁ, যা বলছিলাম, গত রবিবার বিকেলে প্রফেসরের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে অমলদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। কিন্তু লোকটার ব্যাপার দেখে আমার ভারী মজা লাগছে।

: কি রকম?

: রাস্তায় তিনিও আমায় দেখেছেন, আমিও তাঁকে দেখেছি। কিন্তু কথা বলব বলে যেই না তার সামনে এগিয়ে গেছি, অমনি তিনি মুখ ঘুরিয়ে হনহন করে অন্য পথে চলে গেলেন। প্রথমে রাগ হয়েছিল, পরে হাসি পেলো।

: তোমার মাকে বলেছ?

: না বলিনি। মা তো তাঁর ছেলে বলতে অজ্ঞান। লোকটা পাটনায় না গিয়ে কলকাতাতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে অথচ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে না শুনলে তিনি নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পড়বেন। তাই কথাটা আর বলা হয়নি।

: ভালই করেছ। বললাম আমি। বণ্টু তার কলকাতায় আমার খবরটা যার কাছে গোপন রাখতে বলেছিল, সে নিজেই যখন তাকে দেখেছে, তখন আমার আর প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্ন ওঠে না।

বললাম : অমলবাবু গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় থাকেন—একথাটা সত্য নয়। তিনি বিহারেই আছেন। গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। যে রবিবার তুমি তাঁকে দেখেছ সেই রবিবার সকালে তিনি আমার বাসায় গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার মুখখানা কালো হয়ে গেল : ভেরি স্ট্রেঞ্জ, আপনার কাছে গেলেন অথচ আমাদের বাসায় এলেন না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম : তাঁর হাতে সময় বেশি ছিল না।

: সেইজন্য রাস্তায় দেখা হওয়া সত্বেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আপনি কাকে কি বোঝাচ্ছেন অশোকবাবু! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা হয়েছে এ্যাণ্ড ইউ নো দ্যাট। আমাদের কাছে গোপন করছেন।

: না, গোপন করার কিছু নেই।

: তাহলে আপনি এতদিন আমাদের কাছে বলেন নি কেন যে অমলদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

: আমি বলিনি—কারণ—কারণ—তাহলে ব্যাপারটা সবই খুলে বলতে হয়। তাতে অনেক সময় লাগবে। এখন তো সেটা সম্ভব নয়। তুমি একটা সময় ঠিক কর। আমি এসে সব বলব। কিন্তু তোমার মায়ের সামনে কথাটা না হওয়াই বোধ হয় ভাল। তবে হ্যাঁ, কোন দুঃসংবাদ নয়। অমলবাবুর সম্বন্ধে যা শুনবে সবই অসাধারণ সুসংবাদ।—

: অর্থাৎ?

: অর্থাৎ অমলবাবু একেবারে বদলে গেছেন।

: খারাপের দিকে না ভালর দিকে?—কঠিন ব্যাঙ্গের সুরে জানতে চাইল অনুরাধা।

: ভালর দিকে। ভাল নয়, অতিভাল—যার চেয়ে ভালো আর আশা করা যায় না। কিন্তু আজ আর থাক। একটা দিন ঠিক কর।

: কাল ক'টায় কারখানা থেকে ফিরবেন?

: পাঁচটার আগে নয়।

: তাহলে সওয়া পাঁচটায় আপনার বাসায় যাব।

: মাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে না ?

: সে কাজটা পাঁচটার মধ্যেই শেষ করে নেব। আপনি অবশ্যই বাসায় থাকবেন।

: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থাকব। এখন চলি।

: আসুন।

আমি বাসার দিকে পা বাড়ালাম। আগামী কাল কথাটাকে কি ভাবে প্রকাশ করলে অনুরাধা সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করবে, তাই ভাবতে লাগলাম।

পরদিন কারখানায় যেতেই আমার সহকর্মী শশী মোহান্তি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একখানা টাইপ করা চিঠি দেখাল। পড়ে দেখি কোম্পানী থেকে সে পদত্যাগ করছে।

: কোথায় জোটালি নতুন চাকরী ? সিন্ধ্রি ? পেরাম্বুর ? টাটা ?

: এদেশের কোথাও নয়।

: তবে কি বিলেতে ?—আমি ঠাট্টা করলাম।

: আজ্ঞে হ্যাঁ সার, খাস বিলেতে। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।—প্যান্টের পকেট থেকে একখানা লম্বা খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরল শশী। তাতে ব্রিটিশ স্ট্যাম্প এবং ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের ছাপ। ভিতরের টাইপ-করা কাগজগুলো পড়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। শশী বিলেতের পাওয়ার প্ল্যাণ্ট কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে। তারা ওকে কলকাতা থেকে ভাড়া দিয়ে ইংল্যাণ্ড নিয়ে যাচ্ছে। মাইনে মাসে শ আষ্টেক টাকা দাঁড়াবে। তিন বছরের কনট্রাক্ট। ইচ্ছে করলে কনট্রাক্টের মেয়াদ বাড়ানো যাবে।

: কি করে হল ?

: দরখাস্ত করে।

: তা কি হয় রে ? নিশ্চয়ই তোর কোন ধরাকরার লোক আছে বিলেতে।

: কেউ নেই। চাকরীটা আমি যোগাড় করেছি নিজে—স্রেফ কপাল ঠুকে।

: কি রকম ?

: মাস দেড়েক আগে ধর্মতলা থেকে একখানা পুরানো ইঞ্জিনিয়ার্স জার্নাল কিনেছিলাম। তাতে দেখলাম সমস্ত ইউরোপেই এখন ড্রাফটসম্যানের অভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে। সেই জার্নালের বিজ্ঞাপন কলমে বহু বড় বড় কোম্পানী ড্রাফট্সম্যান চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। আমি 'জয় মা কালী' বলে এয়ার মেলে একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম। দিন পনেরো আগে তার একটা জবাব পাই। তার উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র। সত্যিসত্যিই বিলেত যেতে হবে দেখে প্রথমটায় একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে ছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, তিনটে বছর যদি পাওয়ার প্ল্যাণ্টে কাটিয়ে আসতে পারি তাহলে কলকাতায় বসেই হাজার টাকার চাকরী করতে পারব। ব্যাস, ডিসাইড করে ফেললাম। আমি বলি, তুইও একটা দরখাস্ত কর অশোক। চাকরী অবশ্যম্ভাবী। দুই বন্ধুতে বিলেতে গিয়ে বেশ মজায় থাকা যাবে।

অবিশ্বাস্য রকমের লোভনীয় প্রস্তাব। শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। এদেশে দুশো আড়াইশো টাকার একটা চাকরী জোটাতে আমাদের জিভ বেরিয়ে যায় আর বিলেতে আরও বেশি মাইনের সেই চাকরী এত অনায়াসলভ্য? কয়েক মিনিট আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না।

: কি রে, একেবারে অবাক হয়ে গেলি যে?

: অবাক হবারই কথা ভাই। বিশ্বাস না করেও উপায় নেই অথচ মনে হয় অবিশ্বাস্য। স্রেফ দরখাস্ত করেই চাকরীটা বাগালি?

: হ্যাঁরে হাঁ, তাতে চোখ ছানাবড়া করার কি আছে? এশিয়ার দেশে দেশে এখন পুনর্গঠনে কাজ চলছে—শিল্প-সম্প্রসারণ হচ্ছে। আর সেই সব কলকারখানা তৈরি হচ্ছে ইউরোপে। কাজেই ইউরোপে এখন প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার চাই, প্রচুর টেকনিশিয়ান চাই। তাই পৃথিবীর যেখান থেকে পাচ্ছে, সেখান থেকে তারা কাজের লোক যোগাড় করছে। দু দিন বাদে সেখানকার তৈরি কারখানা ভারতবর্ষে এসে বসবে। তখন এখানেও টেকনিশিয়ানদের চাহিদা বাড়বে। আমরা বিলেতের কারখানায় কাজ-করা লোক। কাজেই ভারতে আমাদের মোটা মাইনের কাজের অভাব হবে না।

: তুই সংঘাতিক রঙিন একটা ছবি আঁকছিস শঙ্কী। তবে তোর কথা যুক্তিহীন নয়

: এখানে তুই কিসের ভরসায় থাকবি? ঘনশ্যাম শালা ফাটকার হাঙর।

যেদিন ফাটকায় মার খাবে, সেদিন কোম্পানী লাটে তুলে টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়বে। ডালমিয়া কি করেছে দেখিস নি? বড় বড় নাম-করা কোম্পানী কিনে দু বছর এক বছর বাদে লিকুইডেট করে চলে গেছে। এ শালারা ব্যবসা বোঝে না, বোঝে পুকুর চুরি। আর মাইনে? দুশো আড়াইশোর বেশি কোন দিন উঠবে না। শালাদের ইচ্ছে সমস্ত মুনাফা নিজেদের পেটে পুরবে। তাছাড়া এ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। ওয়াগন তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা পিটছে। কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না। ব্যাটারা নাকি আরও বেশি লাভ চায়। রেলওয়ে বোর্ড তাতে রাজি হচ্ছে না। ঘুষঘাষ অয়েলিং গ্রিজিং চলছে। সেটা ফেল করলে রেলওয়ে বোর্ডকে জব্দ করবার জন্য ওরা নাকি ওয়াগন শপটা বন্ধ রেখে মোটা রকমের লোক ছাঁটাই করবে। তখন একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। সেই সুযোগে ওরা ওয়াগনের দাম বাড়িয়ে নেবার জন্য চাপ দেবে। এখন ক্রমাগত চলবে এই লেবার আনরেস্ট। আর তার ফলে কর্মচারীদের অবস্থা যা দাঁড়াবে তা ভগবানই জানেন। এখানে কি আর কাজ করা যাবে রে?

খবরটা কানাঘুষোয় আমরাও শুনেছি। আগামী সপ্তাহে এই ব্যাপারটা নিয়ে ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক বসবে। শশী যা বললে, তা মিথ্যে নয়। মালিক তার নানা রকম অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করছে। তার পরিণাম ভুগতে হবে শ্রমিকদেরই। মাস দুয়েক আগে কৃপাল সিং নামে রেলওয়ে বোর্ডের একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্যকে কোম্পানীর হেড অফিসে স্পেশাল অফিসারের পদে বসানো হয়েছে। মাইনে কয়েক হাজার। শোনা যাচ্ছে রেলওয়ে বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য নাকি তাঁর হাতের মুঠোয়। গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে এবং গভর্নমেণ্টকে ঠকিয়ে কিভাবে আরও বেশি পয়সা পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে তিনি নাকি ঘনশ্যামকে পরামর্শ দেবেন। তাঁর প্রথম প্রস্তাবটাই নাকি ওয়াগনের দাম বাড়ানো। ভারতবর্ষে এখন প্রচুর ওয়াগনের প্রয়োজন কিন্তু ওয়াগন তৈরির কারখানা মাত্র কয়েকটি। ওদিকে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অভাবে বিদেশ থেকে আমদানীও বন্ধ। কাজেই এই সুযোগে সরকারের উপর চাপ দিলে ওয়াগনের উপর মুনাফা যে অনায়াসেই পাঁচ-দশ পার্সেণ্ট বাড়িয়ে নেওয়া যায়, সেটা তিনি নাকি ঘনশ্যামকে বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়ে রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। তবে তার ফলাফল এখনও জানা যায় নি।

: অত ভাবাভাবির কিছু নেই। শালা, আজই দরখাস্ত লিখে দাও। বিলেত থেকে সাহেব আসে এদেশে চাকরী করতে। স্বাধীন ভারতে তার উল্টোটাও হয়ে যাক। আমাদের উপার্জনে ভারতের কিছু স্টার্লিং জমুক। শুধু ওয়ানওয়ে ট্রাফিক থাকবে কেন?

: তা যা বলেছিস। একটু ভেবে দেখি। তারপর দেব একখানা দরখাস্ত লিখে। বাইরে যেতে আমার কোন পেছুটান নেই।

মুখে পেছুটান নেই বললেও মনে মনে অনুভব করলাম, আমার অনেক পেছুটান।

বিলেতে গিয়ে মোটা মাইনের চাকরী করার লোভটা সামলানো মুস্কিল কারণ আমি নিম্নমধ্যবিত্ত পারিবারের ছেলে। জীবনযাত্রার মান নিছক বেঁচে থাকার পর্যায়ের। এদেশে থাকলে চাকরীতে বিশেষ উন্নতিরও আশা নেই। কারণ এদেশের কলকারখানার মালিক এবং সরকারী কর্মকর্তারা চাকরী বাকরি দেবার বেলায় এবং প্রোমোশানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোককেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। দেশীয় অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার কোন কার্যকরী মূল্যই নেই। সেই হিসাবে বিলেতে চাকরী করে কলকাতায় ফিরে এলে আমি এখানে দু-তিন গুণ মাইনের চাকরী পেয়ে যাব। জীবন-যাত্রার মান উন্নততর হবে এবং নিজেকে মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল মানুষ বলে অনুভব করতে পারব। অর্থাৎ বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে চিন্তা করলে আমার পক্ষে শশী মোহান্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয়।

আমি সংসারী মানুষ। বৈষয়িক উন্নতির প্রতি আমার ষোলো আনা লোভ। কিন্তু মানুষের লোভ একমুখী নয়। আমার লোভও বহুমুখী। সাহিত্য-যশের প্রতিও আমার পুরো আসক্তি রয়েছে।

এখন লেখা ছেড়ে বিলেতে চাকরী করতে গেলে হয়তো চিরকালের মত লেখা ছাড়তে হবে। তাতে আমার মন পুরো সায় দেয় না। হয়তো কোন দিনই আমি যশস্বী লেখক হাত পারব না কিন্তু যশের লোভ বিসর্জন দেওয়াও মুস্কিল। সাহিত্যের যশ বিকিনির সুইমিংকস্ট্যুম পরা সুন্দরীর মত। অঙ্গের যেটুকু অনাবৃত সেটুকু ভয়ানক লোভনীয় কিন্তু যেটুকু আবৃত সেই টুকুই আসল। অনাবৃত অংশটুকু দেখে প্রলুব্ধ হয়েছি। খুব সহজে এ লোভের নিবৃত্তি হবে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে সাহিত্যচর্চার চেয়ে বড় হচ্ছে অনুরাধা। তার সঙ্গে

আমার প্রণয়ের বর্ণপরিচয় শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় তাকে ছেড়ে দূর দেশে যাব কোন সাহসে? অসম্ভব। যতদিন না তাকে নিজের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারছি ততদিন তাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা যায় না। সাহিত্য-যশের মত অনুরাধাও আমার কাছে শেষ পর্যন্ত নিছক মরীচিকা হয়ে উঠবে কি না—জানি না। কিন্তু সেই মরীচিকায় মুখ থুবড়ে না পড়া পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হতে পারব না।

সুতরাং বিলেতে চাকরি করতে যাওয়ার ইচ্ছে আপাতত মুলতুবী না রেখে উপায় নেই। মনে মনে তাই স্থির করলাম বটে তবে ঐ চিন্তায় সমস্ত দিন মনটা চঞ্চল হয়ে রইল। অনুরাধা যে বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অন্যমনস্কভাবে বাসায় ফিরে সিঁড়ির নীচে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই এনগেজমেণ্টের কথাটা মনে পড়ল।

: খুব লোক যা হোক। পাঁচটায় আসবার কথা আর এলেন সাড়ে পাঁচটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ধরে গেল।—অনুযোগের সুরে বলল অনুরাধা।

: আই অ্যাম সরি—আই মিন—সত্যিই খুব লজ্জা পাচ্ছি। চল উপরে গিয়ে বসবে।

অনুরাধা আমার পেছন পেছন উপরে উঠে এল। দরজা খুলে আলো জ্বেলে তাকে ভিতরে আহ্বান করলাম। সে ঘরে এসে বসতে আমি নীচের হোটেলে চা দিতে বলে এলাম।

: তুমি মিনিট পাঁচেক বস। আমি হাতমুখ ধুয়ে পোশাকটা বদলে নিই। কেমন?

অনুরাধা সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় কাত করল

ফিরে এসে দেখি হোটেল থেকে চা আর কেক দিয়ে গেছে। আমি অনুরাধার সামনের চেয়ারে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললাম: চা খাও। হ্যাঁ, অমলবাবুর কথা জানতে চাইছিলে? সত্যিই খুব আনন্দের সংবাদ। অমলবাবু এখন চাকরি করছেন ডিহরীতে এবং ভাল চাকরি। আপাতত মাইনেটা বেশি নয় কিন্তু যে কাজ শিখছেন, তাতে দুতিন বছর বাদে ভাল মাইনে পাবেন।

: চাকরি করছেন!—ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করল অনুরাধা: ডিহরী কোথায়?

: ডিহরী বিহারে। শোন নদীর তীরে।

: তাহলে আমাদের কাছ থেকে অমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম: এটা আসলে অমলবাবুর অজ্ঞাতবাস। দূর দেশে পালিয়ে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন। এখন আচার-ব্যবহার কথাবার্তায় একেবারে অন্য মানুষ। কারখানায় চাকরী করছেন, ইউনিয়নের কাজ করছেন এবং—এবং—এবং—শেষ কথাটা বলতে গিয়ে আটকে গেলাম। অনুরাধা চেপে ধরল।

: এবং কি?

: সেটা আরও সাংঘাতিক সুসংবাদ। শুনলে তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না।

: আগে যা বললেন তা যদি বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে যে কোন অসম্ভব ঘটনাই বিশ্বাসযোগ্য।

: অমলবাবু—মানে—খুব সম্ভব ভদ্রলোক কথাটা তোমার কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।

: কেন?—অনুরাধার মুখখানা আরও কালো হয়ে উঠল: শুনিই না খবরটা কি। আমি তো তাঁর শত্রু নই।

: না, না, সে কথা হচ্ছে না। শত্রুমিত্রের কোন প্রশ্ন নেই। সংবাদটা হচ্ছে এই যে অমলবাবু এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং পাশ করে যাবেন বলে আশা করেন।

কথাটা শুনে অনুরাধা বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মুখ দিয়ে ভাল মন্দ কোন মন্তব্য বেরুল না!

আমি বললাম: ভদ্রলোকের গোঁ আছে। যেদিন থেকে ভাল হবার সংকল্প নিলেন সেদিন থেকে একেবারে অন্য মানুষ। তাঁর সিদ্ধান্ত কোথাও এতটুকু চিড় খেলো না।

: ভাল হলেই ভাল। কিন্তু যারা তাঁর ভাল চায়, তাদের কাছে কথাটা প্রকাশ না করার মধ্যে কি গূঢ় তত্ত্ব আছে তা ভেবে পাই না।

: নিছক ছেলেমানুষী। একটু লুকোচুরি খেলা আর কি।

: বয়সটা কি এ ধরনের লুকোচুরি খেলার উপযুক্ত?—গম্ভীরভাবে জানতে চাইল অনুরাধা।

: তা ঠিক নয়। তবে মানুষের খেয়াল বয়সের সঙ্গে সব সময় তাল রেখে চলে না।

: আপনি আসল কথাটা চেপে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।—অনুরাধা মুখে একটা হাসি টানবার চেষ্টা করল: সত্যি বলুন তো, আমাদের সংস্পর্শ তাঁর কাছে হঠাৎ এত তেতো লাগল কেন?

আমি আমতা আমতা করে বললাম: ঠিক তেতো লাগেনি। তবে কলকাতার কারও কারও বিরুদ্ধে মনে মনে তিনি বেশ একটি অসন্তোষ পোষণ করেন। সেটা নিছক ভুল বোঝাবুঝির ফল। বড় করে দেখবার মত কিছু নয়।

: অসন্তোষ আর কারও বিরুদ্ধে নয়, শুধু আমার বিরুদ্ধে।—অনুরাধা হেসে ফেলল: সে আমি অনেকদিন আগেই আপনাকে বলেছি কিন্তু রাগটা যে সম্পর্কচ্ছেদের পর্যায়ে উঠে গেছে তা আগে বুঝিনি। আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন আপনার কাছে?

: তেমন কিছু বলেননি আর আমিও ব্যাপারটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনি।

: তবু শুনি না কি বলেছেন।

আমি তার মনের ভার লাঘবের জন্য হাল্কা তরল সুরে বললাম: বলেছেন তিনি পশুরাজ সিংহ—পাঁকে পড়েছিলেন। তাঁর দুরবস্থা দেখে বনের শিয়ালরাও তামাসা করেছে—

: অর্থাৎ আমি শিয়াল।—অনুরাধা একটু জোরেই হেসে উঠল: লোকটার কল্পনাশক্তি আছে। তারপর?

: পাঁক থেকে বেরিয়ে আবার সিংহত্ব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবেন।

: ফিরে এসে প্রথম কাজ হবে শৃগাল-বধ—এই তো?—অনুরাধা আবার হেসে উঠল। তার মনটা হাল্কা হয়ে গেছে দেখে আমিও খুশি হলাম।

: সত্যি অশোকবাবু, সিংহ ফিরে এলে শিয়ালের কি দশা হবে বলুন দেখি। প্রাণটা কি হাতে-পায়ে ধরলেও বাঁচবে না?—অনুরাধা কৃত্রিম ভয় প্রকাশ করে হাসতে লাগল।

বললাম: যে শিয়ালের ভয়ে সিংহকে বন ছেড়ে পালাতে হয় সে শিয়াল সিংহকে ভয় করতে যাবে কেন?

: অর্থাৎ আমার ভয়ে তিনি কলকাতা ছেড়েছেন? কি রকম?

: তুমি ঘা দিয়ে দিয়ে তাঁর মধ্যে যে আত্মসম্মান-বোধ জাগিয়েছ, তারই

তাড়নায় তাঁকে বাধ্য হয়ে জীবনের গতি বদলাতে হয়েছে। সুতরাং মন ঠাণ্ডা হলেই এ রাগ আর থাকবে না।

ঃ থাকলেই বা কি করা যাবে অশোকবাবু? নিজের বিবেকের কাছে সাচ্চা থাকলেই হল। আমরা তাঁর কাছে যথেষ্ট উপকৃত। মা তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখেন। আমিও তাঁকে কখনও পর ভাবিনি। এক্ষেত্রে প্রিয় অপ্রিয় অনেক কথাই হতে পারে। কোন্ কথা কি উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে সেদিকে খেয়াল না করে প্রত্যেক কথাকে যদি তার আক্ষরিক মূল্যে গ্রহণ করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে কেউ নিজের স্ত্রীপুত্রের সঙ্গেও ঘর করতে পারবে না। মা-বাবা অনেক সময় মেয়েকে লক্ষ্মীছাড়া বলে গাল দেন কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই চান না যে মেয়ে লক্ষ্মী ছাড়া হোক।

উদাহরণ শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বললামঃ তা তো বটেই, মা-বাপ যেমনভাবে সন্তান শাসন করে তুমিও তেমনি—

ঃ স্‌স্‌স্‌।—ভ্রূ কুঁচকে কোপ প্রকাশ করল অনুরাধাঃ ঠাট্টা করার সুযোগ পেলে কিছুতেই লোভ সামলাতে পারেন না। খালি প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ান।

ঃ তুমি কি আমার প্রতিপক্ষ?—জানতে চাইলাম আমিঃ তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ কিসে?

ঃ না, মানে প্রতিপক্ষ নন—

ঃ তবে?

ঃ তবে আবার কি? সব কথার মানে আছে নাকি? অনেক কথা শুধু কথা বলবার জন্যই বলা হয়। সেটা তো সাহিত্যিকদের আরও ভাল করে জানা উচিত। যাক, ব্যাপারটা আমি সবই বুঝেছি। কলকাতার বল্টু মজুমদার অমল মজুমদার হয়ে ওঠবার জন্য কলকাতা ছেড়ে বিহারে গিয়ে চাকরিতে ঢুকেছেন, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং ইউনিয়নের কাজ করছেন। আমার উপর ভীষণ রাগ। তাই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নন।

ঃ শেষের কথাটা ছাড়া বাকীটুকু ঠিক হয়েছে।

ঃ শেষের কথাটা আমি ঘটনার গতি থেকে অনুমান করে নিচ্ছি। কিন্তু তাতেও আমি দুঃখিত হব না, যদি বুঝি যে তিনি সত্যি সত্যিই একজন সম্মানীয় ভদ্রলোক হয়ে উঠছেন। আমাদের কাছে তিনি আসুন বা না

আসুন তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু দূর থেকে তাঁকে দেখে যেন আমাদের মনে কোন অশ্রদ্ধার ভাব না জাগে। এইটুকু হলেই যথেষ্ট।

ঃ সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার অনুরাধা। তোমার মায়ের মত বড় গলা করে বলতে না পারলেও, একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে অমলবাবুর মধ্যে যথেষ্ট মহানুভবতা আছে। ভদ্রলোকের মনে অল্প বয়সেই পাবলিক স্পিরিটের উন্মেষ হয়। কিন্তু কুসঙ্গী এবং রাজনৈতিক ধান্ধাবাজদের পাল্লায় পড়ে উনি অধঃপতনের পথে নামতে বাধ্য হন। গত এক বছর আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখেছি তাঁর মধ্যে পরোপকার এবং আত্মত্যাগের ঝোঁকটা বেশ প্রবল। জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোনদিন যদি তিনি Hero হয়ে ওঠেন, তাতে আমি মোটেই বিস্মিত হব না। তাঁর মধ্যে সেই গুণের বীজ আছে। তাই বলছিলাম তার এখনকার কোন আচরণে বিচলিত না হয়ে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। তোমার মায়ের কাছেও এসব কথা বলবার দরকার নেই।

অনুরাধা অনেকক্ষণ মৌন হয়ে বসে রইল। আমি পোড়া সিগারেটের শেষ অংশ দিয়ে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বল্টু প্রকৃতপক্ষে নিজেকে নিয়ে একটা অভাবনীয় 'বিপ্লব' ঘটাতে যাচ্ছে এবং অনুরাধা তাকে যেমনটি চায়, তেমনটিই হবে সে। কাজেই অনুরাধার হতাশ অথবা মনমরা হয়ে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে আর কোন যুবক তার প্রণয়িনীর মনে অপর যুবক সম্বন্ধে এতখানি মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে কিনা, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি করলাম। কারণ আমি জানি, বল্টুর সম্বন্ধে সরকাররা অত্যন্ত দুর্বল এবং স্নেহপ্রবণ। তাঁদের সেই অনুভূতির উপর আমার পুরো সহানুভূতি আছে। বল্টুর সম্বন্ধে আমার দুর্বলতাও কিছু কম নয়। আমাকে সে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। নইলে পৃথিবীতে এত লোক থাকতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসবে কেন? সরকাররা তার যতখানি মঙ্গল চান, আমিও তার ততখানি মঙ্গল কামনা করি। সুতরাং তার সদ্‌গুণের দিকে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই।

তাছাড়া অনুরাধার হৃদয়-জয়ের প্রতিযোগিতায় বল্টু তো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বল্টুর সম্বন্ধে অনুরাধার যে উদ্বেগ এবং আগ্রহ সেটা পারিবারিক স্নেহ-মমতার অঙ্গ। সে হল অতি ভ্রাতৃবৎসল বোন। সেটা তার বিশেষ গুণ।

তাতে আমার খুশি ছাড়া অখুশি বোধ করার কিছু নেই। হৃদয়হীন স্বার্থপর অনুদার এবং কৃপণ মানুষের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। যে মেয়েকে আমি জয় করতে চাই সে কৃপণ এবং অনুদার হলে আমি কিছুতেই তার দিকে প্রলুব্ধ হতে পারতাম না। বল্টুর সম্বন্ধে অনুরাধার গভীর আবেগময় অনুভূতি তার সুকুমার মনেরই পরিচয় দেয়। সেই সুন্দর এবং সুশোভিত মনটির উপরই আমার লোভ। সেখানেই আমি স্থায়ী আসন পেতে বসতে চাই। আমি চাই অনুরাধার এই মন সহস্র বিচিত্র সুরে বিকশিত হয়ে উঠুক। শুধু বল্টু কেন, আরও অনেক মানুষের সম্বন্ধেই থাকুক তার দুর্বলতা। তাতে আমি আনন্দ ছাড়া নিরানন্দ বোধ করব না। ভালবাসা বহু রূপে, বহু বর্ণে, বহু গন্ধে সমৃদ্ধ করুক তার ব্যক্তি-সত্তাকে। প্রেমের ক্ষেত্রে অগতানুগতিক এবং অপ্রচলিত পথে চলতে তাই আমার কোন দ্বিধা নেই। আমি ভাল করেই জানি, অনুরাধার হৃদয়ের যে জায়গায় আমি পৌঁছতে চাই, বল্টু ঠিক সেখানকার যাত্রী নয়।

প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্তার পর অনুরাধা যখন বাসায় ফিরে গেল তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হল নিজের পথেও আমি বিশেষ এগোতে পারছি না। অনুরাধার সঙ্গে আমার সান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। পরস্পরের কাছে আমরা অনেক সহজও হয়ে উঠেছি। কথায়-বার্তায় মাঝে মাঝে ছোটখাট দুর্বলতাও হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমস্ত জিনিসটা এখনও অনুমান এবং কল্পনার স্তরেই আছে। সেটা কোন বাস্তব রূপ ধারণ করতে পারছে না। এই স্থিতাবস্থা বেশি দিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। পারিবারিক সম্পর্কের রূপ এবং চরিত্র সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বোঝাপড়া না হলে পরবর্তীকালে হয়তো অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অনুরাধাকে এখনও আমি আমার মনোবাসনার কথা স্পষ্ট করে জানাই নি। অনুমানে সে কিছু বুঝেছে কিনা জানি না। ধরে নিতে হবে কিছুই বোঝেনি। এ অবস্থায় হঠাৎ যদি মিসেস সরকার মেয়ের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করেন, তখন দাঁড়াব কোথায়? আমি সরকারদের বিবেক-রক্ষকও নই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও পড়ি না। তাঁদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে আমার অজ্ঞাতে সুসম্পন্ন হলেও তাতে আমার কিছু বলবার থাকতে পারে না। সুতরাং ঝুঁকি এড়াবার জন্য অবিলম্বেই আমাদের মন জানাজানি হয়ে যাওয়া দরকার। তাহলে অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক

সেখানে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।

অনুরাধার কাছে কি করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেম নিবেদন করব তাই ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় এক প্যাকেট সিগারেটে পুড়িয়ে ফেললাম। উপন্যাসের নায়করা নায়িকাদের কাছে ঘচাঘচ প্রেম নিবেদন করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে আমি বুঝতে পারছি, কাজটা খুব কঠিন। প্রেম-নিবেদনের যত রকম দৃশ্য কল্পনা করছি, সবই আমার কাছে মেলোড্রামেটিক লাগছে। শুনে অনুরাধা হেসে ফেলতে পারে, চটে উঠতে পারে, বিরক্তও হতে পারে। অবশ্য প্রসন্ন হতেও বাধা নেই। তবুও অতি নাটকীয় কিছু করতে আমি সাহস পাই না। অত্যন্ত সহজভাবে এবং স্পোর্টসম্যানের মন নিয়ে তার কাছে আমার আবেদন পেশ করতে হবে—যাতে তার প্রতিক্রিয়াটা কোন রকমেই উগ্র না হয়। প্রণয়-নিবেদনে প্যাসন থাকবে কিন্তু তার ঝাঁঝ থাকবে না। কথাগুলো হবে যথাযথ, সংক্ষিপ্ত, জীবন্ত এবং সুস্পষ্ট। কোন হেঁয়ালী, ধাঁধা অথবা অলঙ্কার বাহুল্যে বক্তব্য যেন ধোঁয়াটে না হয়ে যায়। জবাবটাও চাই সেই রকম স্পষ্ট এবং যথাযথ।

দরজায় কড়া নড়ল। হোটেল থেকে আমার রাত্রের খাবার এসেছে। দশটা বাজল। ওঃ আমি কি নির্বোধ! এতক্ষণ কত আজেবাজে চিন্তাই না করলাম। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে অনুরাধার পরীক্ষা, সে কথাটা একবারও মনে পড়েনি। পরীক্ষার আগে তার মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাতে পড়াশোনায় তার একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে এবং তার পরিণাম বিপত্তিকর হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। সেটা খুব খারাপ দেখাবে। সুতরাং তার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মাত্র দুটি মাস। তাতে সত্যিই কোন ঝুঁকি নেই। তর্কের খাতিরে সরকারদের 'কেউ নই' বললেও তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। আমার অজ্ঞাতে সে-বাড়িতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে পারে না। তাছাড়া মিসেস সরকার অসুস্থ। তাঁর পক্ষে কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। সে কাজটা করতে পারে একমাত্র কন্যা স্বয়ং। এতদিন যদি কন্যা সে ব্যাপারে উদ্যোগী না হয়ে থাকে, তাহলে এই দুমাসে সে অপ্রত্যাশিত কিছু করবে না, কারণ এখন সে পড়াশোনা নিয়ে মোটামুটি বাড়িতেই আটক হয়ে আছে। ও-সবের অবকাশ কোথায়?

তাছাড়া আমিই বা সমস্ত ব্যাপারটাকে একতরফা নিজের মনের ওঠা-নামা দিয়ে বিচার করছি কেন? অনুরাধাও হয়ত মনে মনে আমাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ডাক দিলে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দেবে। এতদিনের আলাপ-ব্যবহারে তার দিক থেকে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যাতে মনে হতে পারে, সে আমার প্রতি প্রসন্ন নয়। বরং ছোটখাট অনেক ঘটনায় আমার সম্বন্ধে তার প্রশ্রয়ের মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং আরও দু-তিন মাস অনায়াসেই ধৈর্য ধরে বসে থাকা যায়।

এরপর আমি নিয়মিতভাবে অনুরাধাদের বাসায় যেতে শুরু করলাম। কোন অপ্রাকৃত শক্তি যেন জোর করে আমায় সেই পথে ঠেলে নিয়ে যেত। অনুরাধাকে একদিন চোখে না দেখলে আমার মন কেমন করত। তার সান্নিধ্য, তার হাসি এবং তার কণ্ঠস্বর আমার কাছে এক অনৈসর্গিক আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছিল। তাকে না দেখে আমি থাকতে পারতাম না। অনুরাধার পরীক্ষা ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। সারাক্ষণ সে বই নিয়েই পড়ে থাকত। আমি গেলে আমার সঙ্গে দু-দশ মিনিটের বেশি কথা বলতে পারত না। কিন্তু সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি পাশের ঘরে মিসেস সরকারের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে করতে সারাক্ষণ অনুরাধার কথাই ভাবতাম। সারাদিনের মধ্যে সেই সময়টুকুই ছিল আমার পক্ষে সবচেয়ে লোভনীয়, সবচেয়ে বিমোহক। বিদায় নেবার সময় যখন সে হাসিমুখে তার ক্লান্ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাত তখন মমতা এবং কারুণ্যের আবেগে আমার সমস্ত হৃদয় ভরে উঠত। ইচ্ছে হত, ওর কপালের চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে দিই, শুভ্র সোনালী মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরি, ওর ভারি চোখের পাতায় চুমু দিয়ে ক্লান্তি হরণ করে নিই। যৌবন-কামনার সেই চরম মুহূর্তে হঠাৎ আমি যেন কেমন হয়ে পড়তাম। একটা সুগভীর বিচ্ছেদানুভূতি এবং একটা সুনিবিড় বেদনাবোধ হঠাৎ আমার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করে ফেলত। মনে হত, অনুরাধা আমার থেকে অনেক অনেক দূরে চাঁদ-তারার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই কিন্তু স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতে পারি না। এই আকস্মিক স্বত নৈরাশ্য বহুক্ষণ আমার মনটাকে অবশ করে রাখত।

মিসেস সরকারকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমি বাইরে বেরুই। অনেকদিন বাদে নতুন করে হাঁটতে শিখে তিনি খালি হাঁটবার সুযোগ খোঁজেন এবং

আমি যেদিনই যাই, সেদিনই তিনি বলেন, 'অশোক চল আজ তোমার সঙ্গে একটু রাস্তায় ঘুরে আসি'। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাই এবং রাস্তায় বেরিয়ে নানারকম গল্প-গুজব করতে করতে হেঁটে বেড়াই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ডাক্তারের অনুমতি পেলেই চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে পারেন। বয়স হয়েছে, স্কুলের চাকরি ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু বি-টি না পাশ করলে স্কুলেও বিশেষ সুবিধা নেই। বলেন, "বুড়ো বয়সে আমাকেও মেয়ের সঙ্গে কলেজে যেতে হবে অশোক। তা মন্দ কি? যদি বি-টিতেই ঢুকতে হয়, তাহলে এম-এটাই বা কি দোষ করল? এবছর অনু পোস্ট গ্রাজুয়েটে ভর্তি হলে আমিও ওর সঙ্গে এম-এর জন্য তৈরি হব ভাবছি। তুমি কি বল?" আমি বলি, "চমৎকার হবে। মা মেয়ে দুজনেই একসঙ্গে এম-এ পাশ করবেন। দুই পুরুষের মধ্যে একটা তুমুল প্রতিযোগিতা হবে। তাতে দুজনেরই পরীক্ষার ফল অসাধারণ ভাল হয়ে যাবে।" শুনে মিসেস সরকার হাসেন। ভদ্রমহিলা নিষ্প্রাণ নির্জীব নন বলে চিরকালই আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ওঁর নতুন উদ্যমের কথা শুনে সেই শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। যদি উনি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া না শিখতেন, যদি ওর মনটা এমন সজাগ এবং সক্রিয় না থাকত, যদি উনি ওঁর যুগের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলার মত একান্তভাবে পুরুষনির্ভর হতেন, তাহলে পৃথিবীতে আজ ওঁর অস্তিত্ব মুছে যেত।

আমাদের কারখানা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রেলওয়ে বোর্ডের যে গোলমালের কথা শোনা যাচ্ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেল হেড অফিস থেকে। রেলওয়ে বোর্ডকে আমরা ওয়াগন সরবরাহ করছি ব্রিটিশ আমল থেকে। কারখানায় গড়ে দৈনিক তিনখানা করে ওয়াগন তৈরি হয়। এই কারণে আমাদের টেকনিসিয়ানরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। যে টাকায় রেলওয়ে বোর্ডের কাছে এক-একখানা ওয়াগন বিক্রি করা হয় তাতে শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরী দিয়ে মালিকদের বেশ মোটা মুনাফা থাকে। অতি মুনাফালোভী ঘনশ্যাম তাতেও সন্তুষ্ট নন। মুনাফার পরিমাণ বাড়াবার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু এতদিন বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। সম্প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগটা পেয়ে গেছেন।

এতকাল আমরা ওয়াগন তৈরি করতাম ওয়েল্ডিং প্রথায়। অর্থাৎ ওয়াগনের দেওয়াল এবং মেঝের লোহার পাতগুলো গলানো ধাতু দিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'ত। এবার রেলওয়ে বোর্ড চাইছেন, ওয়াগনের পাতগুলো রিভেট করে জোড়া হোক। কারণ তাতে মেরামতির খরচ কম আর ওয়াগনের আয়ুও বৃদ্ধি পায়। ঘনশ্যাম এই পরিবর্তনের সুযোগে ওয়াগনের দাম নিজের ইচ্ছেমত বাড়িয়ে নেবার প্যাঁচ কষছেন। রেলওয়ে বোর্ডকে বলা হয়েছে যে নতুন প্রথায় ওয়াগন বানাতে কারখানায় সাজ-সরঞ্জাম প্রচুর বাড়াতে হবে। তাতে মূলধন-খাতে অনেক ব্যয় বাড়বে। তাছাড়া নতুন ওয়াগন তৈরির খরচও বেশি। ওয়েল্ড করা ওয়াগন রেলওয়ে বোর্ড কিনছে তিরিশ হাজার টাকায়। রিভেট করা ওয়াগনের দাম সাঁইত্রিশ হাজার টাকা না হলে পড়তায় পোষাবে না। রেলওয়ে বোর্ড হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ঘনশ্যামের রেটটা অকারণেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঘনশ্যাম তাতে দমবার পাত্র নন। তাঁর নতুন পরামর্শদাতা কৃপাল সিং তাঁকে বলেলেন যে তিনি যেন কোনক্রমেই দর নামাতে রাজি না হন। রেলওয়ে বোর্ড তাঁর দর মানতে বাধ্য হবেন। নইলে ওয়াগন আর বানাবে কে? যদি এতে কাজ না হয় তাহলে 'শেষ অস্ত্র' ছাড়া হবে। এই শেষ অস্ত্রটি হচ্ছে কারখানার ওয়াগন-শপটি বন্ধ করে শ্রমিকদের হয় পে অফ, না হয় ছাঁটাই করে দেওয়া। নানারকম পুনর্গঠনের কাজে ওয়াগনের এখন জরুরী প্রয়োজন। এ অবস্থায় একটা পুরানো ওয়াগন তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যাবে। সেই সুযোগে রেলওয়ে বোর্ডকে ঘায়েল করা হবে। কৃপাল সিং বহুকাল রেলওয়ের বড় বড় চাকরি করে বদমাইসী প্যাঁচগুলো বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন। ঘনশ্যামের মারফত সেগুলো প্রয়োগ করবেন। তাছাড়া রেলওয়ে বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের যে সব সদস্য তাঁর পকেটে আছেন, তাঁরা তো তলে তলে তাঁকে সাহায্য করবেনই।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারখানা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদেরই দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করবেন। ওয়াগনের দাম বাড়লে শ্রমিকদের মজুরী বাড়বে না, কিন্তু দাম না বাড়লে তারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। রেলওয়ে বোর্ড যদি এই কারখানায় কোন অর্ডার না দেয়, তাহলে তো সর্বনাশ। এই দুর্মূল্যের বাজারে ঘনশ্যাম এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে

ছিনিমিনি খেলতে এতটুকু পেছপা হচ্ছেন না। একে বলে অমানুষিকতা। এটা কল-কারখানার মালিক এবং পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের সহজাত গুণ। নিজেদের মুনাফার সঙ্কীর্ণ স্বার্থে তাঁরা দেশ এবং জাতির মঙ্গলামঙ্গল বিসর্জন দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল কেমিকালস্ হিটলারের কাছে প্রচুর গুলিবারুদ বিক্রি করেছিল। হিটলার সেই গুলিবারুদ দিয়েই যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে খুন করেন। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা হাজারে হাজারে কবরের তলায় গিয়ে ইম্পিরিয়াল কেমিকাল্স্-এর মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত করেছে। এই হচ্ছে মালিক সম্প্রদায়ের নীতিবোধ এবং দেশাত্মবোধ। ঘনশ্যাম যা করতে চাইছেন, তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। তিনি জানেন, কারখানা দু-পাঁচ বছর বন্ধ থাকলেও তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। এদিকে-সেদিকে তার লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে আছে। তাতে দু-পাঁচটা পরস্ত্রীকে রক্ষিতা হিসাবে রানীর হালে রেখেও তিনি সোনায় গড়াগড়ি দিয়ে শ্মশানঘাটে পৌঁছতে পারবেন। সুতরাং এ ধরনের মারাত্মক হঠকারিতা করতে তাঁর বাধা কোথায়?

আসল বিপদ আমাদের। এই কারখানা থেকে চাকরি গেলে আর একটা কারখানায় চাকরি জুটিয়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সকলে চাকরি পাবে কি না সন্দেহ। এত লোককে বাঁচার মত মজুরী দিয়ে কাজে নিয়োগ করার মত কারখানাই বা কোথায়? এ অবস্থায় ঘনশ্যামের কুট ষড়যন্ত্রে বাধা দেবার জন্য আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে। কারখানার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কাছে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা সব খুলে বললে হয়তো ঘনশ্যামের এই সর্বনাশা চক্রান্ত বানচাল হতে পারে। সে কাজে মস্ত ঝুঁকি। ঘনশ্যামের কাছে কথাটা গোপন থাকবে না। তিনি নিদারুণ আক্রোশে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন। ওদিকে গভর্নমেণ্টও যে আমাদের কথায় কর্ণপাত করবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। যারা গভর্নমেণ্ট চালান তাঁরাও তো ধনী ও বণিক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা অনেক সময় শ্রমিক-কৃষকের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দেন বটে—তবে সেটা আসলে কুম্ভীরাশ্রু। জলের চেয়ে রক্ত অনেক ঘন। সবার আগে তাঁরা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ না দেখে পারেন না। একদিন যাঁরা ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাতে চেয়েছিলেন, ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের অঙ্গুলি হেলনে আজ তাঁরা

কাদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাতে চাইছেন তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে হয়তো। কিন্তু বিধিলিপি যখন মানি না তখন শেষ পর্যন্ত একটা সংগ্রাম করে যেতে হবে বইকি! সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য করব। এ তো শুধু আমাদের নিজেদের স্বার্থ নয়, সমস্ত দেশবাসীরই স্বার্থ। রেলওয়ে বোর্ডের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হয় দেশবাসীর টাকায়। সেখানে অপচয় বন্ধ করা গেলে দেশবাসীই উপকৃত হবেন। অর্থাৎ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে দেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইউনিয়ন থেকে ঠিক হল, আমরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অথবা রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে খুলে বলব। সেই জন্য বিভিন্ন বিভাগের অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে লাগলাম।

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে শশী মোহান্তি বিদায় নিল কারখানা থেকে। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানরা সবাই মিলে তাকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে দিলাম। আর দিন সাতেকের মধ্যেই সে বোম্বাই থেকে ইংল্যাণ্ডে রওনা হয়ে যাবে। জাহাজে প্যাসেজ বুক করা হয়েছে। সেদিন সারা সন্ধ্যা আমি তার সঙ্গেই কাটালাম। শশী উড়িষ্যার ছেলে। যুদ্ধের সময় গানশেল ফ্যাক্টরীতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিল। যুদ্ধের শেষে সে চাকরি হারিয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে যোগ দেয়। সেই থেকে আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। এতদিন সুখে-দুঃখে একত্রে কাটিয়েছি। তাই বিদায় বেলায় সত্যিই তার জন্য মন কেমন করতে লাগল। শশী আমাকে বরাবরই ভালবাসে। যখনই কোন বিপদ-আপদ অসুবিধায় পড়েছি, তখনই সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঃ তাহলে তুই কি ঠিক করলি রে? যাবি বিলেতে?

ঃ তুই গিয়ে আগে পৌঁছো। তোর চিঠি পেলে যা হয় ঠিক করব।

ঃ ঠিক যা করবি তা জগাই জানে। বাঙালীরা সাহিত্যের জাত মারতে পারলে আর কিছু করতে চায় না! কি যে শালা লিখিস, কিছু বুঝতে পারি না। অমুক অমুকের প্রেমে পড়িল, অমুক প্রেমে ব্যর্থ হইল আর অমুক অমুখের মুখে চুমু খাইল। এসব তো স্রেফ বানানো কথা। পড়লে মনে হয়, চারিদিকে প্রেমের বান ডাকছে। অথচ আমি শালা এতদিন কলকাতায় রইলাম, না

পড়লাম কারও প্রেমে, না হলুম কারও প্রেমে ব্যর্থ আর না পেলুম কাউকে চুমু খেতে।

বললাম: আফশোষ রাখিস না শশী। ইংল্যাণ্ডে গেলে প্রেমে পড়ার, প্রেমে ব্যর্থ হবার এবং চুমু খাবার মত বহু শ্বেতাঙ্গিনীর সাক্ষাৎ মিলবে। তখন তুই সাধ মিটিয়ে নিস।

শশী উৎসাহ বোধ করল না। হতাশভাবে বলল: প্রেম করার লোক আলাদা ভাই। আমাদের ওসব পোষায় না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, গিয়ে যদি ভাল বুঝি তাহলে চিঠি লিখব। তুই কিন্তু নিশ্চয়ই আসবি। ওখানেও নরক গুলজার করা যাবে।

: সে তো বটেই। হালচাল যা বুঝছি তাতে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আয়ু আর বেশী দিন নয়। শনি লেগেছে। সুতরাং চাকরিটা যাবেই। তখন যেখানে চাকরি পাব সেখানেই চলে যাব।

: হ্যাঁ, রইল এই কথা।

রাত্রের ট্রেনে শশী কটকে চলে গেল। সেখান থেকে সোজা বোম্বাই যাবে।

দিন তিনেক বাদে এক সন্ধ্যায় অনুরাধাদের বাসায় গিয়ে দেখি সে বিছানায় শুয়ে আছে। জ্বর, গায়ে ব্যাথা, মাথার যন্ত্রণা, সর্দিকাশি। রুক্ষ চুলের গোছা বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সাদা বালিসের উপর। মুখখানা শুকনো মলিন বিমর্ষ। ডাক্তার বলেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা। দিন সাতেক না ভুগিয়ে ছাড়বে না।

মিসেস সরকার বেশ একটু বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। মেয়ে অসুখে পড়ার আগের দিন তাঁর রাঁধুনি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। ফলে রান্নাবান্না এবং ঘরসংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর মাথার উপর। যদিও তিনি এখন আর অসুস্থ নন, তবু হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলো ঝামেলার সম্মুখীন হয়ে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। আমি অনুরাধার খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসতেই তিনি বললেন: যাক তোমায় দেখে তবু একটু ভরসা পেলাম। রুগ্ন মেয়ে নিয়ে দুটো দিন ভারী অশান্তিতে কেটেছে।

: সামান্য অসুখ। দুদিনেই সেরে যাবে। তাতে আবার অশান্তি কিসের? —আমি গুমোট কাটাবার চেষ্টা করলাম। মিসেস সরকার সে কথায় কর্ণপাত

না করে বললেন : তুমি আজ বড় সময় মত এসেছ অশোক, এখন তোমার কোন কাজ নেই তো ?

: আজ্ঞে না। কেন বলুন তো ?

: আমি একটু ডাক্তারের কাছে যাব। আর ঐ পথে কিছু সংসারের কেনাকাটাও আছে। তাই বলছিলাম, যদি তোমার কোন কাজ না থাকে তাহলে একটু বসে যেতে।

: তার চেয়ে আমিই কেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি না।

: না, তুমি অনুর কাছে বস। আজ দুদিন ও বাইরের লোকের মুখ দেখে না। অসুখের সময় আত্মীয়-বন্ধুকে দেখলে মনটা ভাল থাকে। তাছাড়া এই সুযোগে আমারও হাঁটার প্র্যাকটিশটা ঠিক থাকবে।

আমি মিসেস সরকারের প্রস্তাবে সম্মত হলাম। তিনি একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চেয়ারটা অনুরাধার মাথার কাছে টেনে নিয়ে বসলাম আমি।

: একটু দূরে সরে থাকুন। এ আবার ছোঁয়াচে রোগ।—অনুরাধা ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় সতর্ক করে দিল।

আমি তার মুখের উপর ঝুঁকে বললাম : ছোঁয়াচে রোগ আমাকে ছোঁয় না।

অনুরাধা মুখে হাসি টেনে বলল : আমিও তাই ভাবতাম। আমার কখনও অসুখবিসুখ হয় না। কিন্তু হল তো। উঃ, মাথায় কি অসম্ভব যন্ত্রণা অশোকবাবু। আজ দুদিন একদম ঘুমুতে পারিনি।

তার বেদনাহত ক্লান্ত পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। তাপ পরীক্ষার ছলে ডান হাতখানা তার উষ্ণ কপালের উপর চেপে ধরলাম।

: না, জ্বর বেশি নেই। শুধু যন্ত্রণা, যন্ত্রণা।—বলল অনুরাধা।

: হ্যাঁ, তাই দেখছি। জ্বর নেই।—কপালের উপর থেকে বিশৃঙ্খল চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললাম : ভীষণ যন্ত্রণা বুঝি ?

: বাব্বা, যেন ছিঁড়ে পড়বে।

আমি আঙুল দিয়ে তার রগের রক্তবাহী শিরাদুটো টিপে ধরলাম। তার পর চুলের গোছা ধরে আলগোছে টেনে টেনে শেষে বোজা চোখের পাতা দুটো বুড়ো আঙুল দিয়ে বেশ জোরে চেপে দিলাম। অনুরাধা একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে হঠাৎ সে চেপে ধরল আমার হাতটা।

: থাক।

: কেন, খারাপ লাগছে?

: না, না। সত্যি কথা বলতে কি, খুবই ভাল লাগছে।

: তবে?

: বারে, আপনি বেড়াতে এসে রোগীর সেবা করবেন নাকি?—অনুরাধা সলজ্জকণ্ঠে ছেলেমানুষের মত বলল।

: তাতে আর কি হয়েছে। অসুখে পড়লে আত্মীয়-বন্ধুরা তো সাহায্য করেই।

: উহুঁ।—আমার হাতটা ধরে রইল অনুরাধা।

: তোমার মায়ের কোন প্রেজুডিস নেই কিন্তু তোমার তো দেখছি অনেক প্রেজুডিস।—হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি আবার তার কপালের উপর রাখলাম। অনুরাধা আর আপত্তি করল না।

: আচ্ছা অশোকবাবু—আপনার নতুন বইটা তো কই বেরুল না এখনও?

হঠাৎ আমার লেখার প্রশ্ন ওর মাথায় এল কি করে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অসুখবিসুখের সময় মানুষের স্মৃতি হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। মনের তলাকার জিনিস মনের উপরে চলে আসে। এও হয়তো সেই রকমের কিছু হবে।

বললাম: শেষটুকু লিখতে বাকী আছে। শিগগিরই বেরুবে। কেন বল তো?

: এমনই। আজকাল আপনি লেখার কথাটথা কখনও বলেন না। তাই জানতে চাইলাম।

: লেখায় ঢিলে পড়েছে।

: কেন?—অনুরাধা চোখ বড় বড় করে তাকাল আমার দিকে।

: মনটা নানা কাজে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিনা।

: বাজে কাজে কেন মাথা দেন? লেখায় আপনার অবহেলা করা উচিত নয়।

অনুরাধার কথার ভঙ্গি অনেকটা প্রবীণা অভিভাবিকার মত। আমার লেখা সম্পর্কে তার এই উদ্বেগ স্বভাবতই আমার খুব ভাল লাগল। সত্যি,

এবার লেখার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। লেখাটা যখন ছাড়তে পারছি না, তখন সেটা অবহেলা করে লাভ কি।

বললাম: হ্যাঁ, এবার লেখায় মন দিতে হবে।

: আমার তো সর্বনাশ অশোকবাবু।—হঠাৎ বিলাপের সুরে বলে উঠল অনুরাধা।

আমি তার কণ্ঠস্বরে প্রায় চমকে উঠেছিলাম: সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

: অনার্স তো পাবই না, পাশ করতে পারব কিনা সন্দেহ।—অনুরাধা সর্বনাশের কারণ ব্যাখ্যা করল।

: কেন? কেন? হঠাৎ কি হল?

: এই অসুখ সারতে সাত দিন। জ্বের মিটতে আরও সাতদিন। তারপরই তো পরীক্ষা। কি করে পাশ করি বলুন? আমার তো ভয় হচ্ছে, পরীক্ষাই দেওয়া হবে না।

: আরে দূর। তোমার অসুখ কাল-পরশুর মধ্যেই সেরে যাবে।

: সারবে না অশোকবাবু।—অনুরাধা ঠোঁট ফোলাল: জানেন তো, ভগবান আমাদের উপর বহুকাল ধরেই বিরূপ। তিনি আমাদের চলার পথে কঠিন বাধা সৃষ্টি করে আনন্দ পান। এ হচ্ছে আমার বিধিলিপি। আমাকে তিনি সহজ পথে কেরিয়ার বানাতে দেবেন না। আর কিছু না পারুন, দুটো বছর নষ্ট তো করতে পারেন।—হতাশভাবে বলল অনুরাধা। ভগবানের উপর তার আক্রোশ আমার কানে নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনাল।

: তুমি অকারণেই ভয় খাচ্ছ অনুরাধা। পরীক্ষা দিতে অথবা পরীক্ষায় পাশ করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা তো জীবনের কোন চরম পরীক্ষা নয় যে, তার সাফল্য অসাফল্যের প্রশ্ন নিয়ে অসুখের মধ্যেও মাথা খারাপ করতে হবে।

: কি করি অশোকবাবু, পরীক্ষা দিতে পারব না অথবা অনার্স পাব না ভাবলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। আমার কাছে এটা খুবই বড় প্রশ্ন।

: বড় প্রশ্ন! কেন? এক বছর পরীক্ষা না দিলেই বা তোমার এমন কি আসে যায়? কতই বা বয়স—

: বয়স যাই হোক—Delay means death—Delay means death—চোখ বুঁজে শান্ত গলায় দুবার উচ্চারণ করল কথাটা।

: পুঁজি ফুরিয়ে আসছে অশোকবাবু। মায়ের শরীর ভাল নয়। টাকা-কড়ি সব যদি আমার পেছনেই খরচ হয়ে যায়, তাহলে মায়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার গ্যারেন্টি থাকবে কোথায়? আমার লোভ অনেক, ধৈর্য কম। ভাল বাড়ি, ভাল সাড়ি, ভাল গাড়ি—সব চাই। কারও কাছে হাত পাতলে এসব জিনিস পাওয়া যাবে না, আর হাত পাতার শিক্ষাও আমার নেই। আমি নিজেই আমার বৈষয়িক সুখ অর্জন করে নিতে চাই—ভাল কেরিয়ার বানাতে চাই—নিজের পায়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাই। Delay means death—Delay means death। একটা বছর নষ্ট হলে আমার টাইমটেবল বানচাল হয়ে যাবে।

কঠিন অসুখে মানুষ প্রলাপ বকে। অনুরাধার কঠিন অসুখ নয় আর প্রলাপও সে বকছে না। কিন্তু অতি-সচেতন এবং অতি-সতর্কভাবেও কথাগুলো বলছে না। পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে তার মন যথেষ্ট উত্তেজিত। তাই সে কিছুটা ধ্যানপরায়ণা হয়ে উঠেছে। এসব উক্তি তারই ফল।

: আমি তো আর সকলের মত নই। জীবনের শুরুতেই একটা মস্ত হ্যাণ্ডিক্যাপ চেপে গেছে। পেছনে 'ব্যাক' করার কেউ নেই। সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে একটা ভাল এডুকেশানাল কেরিয়ার চাই।

: সেটা আমি স্বীকার করি। তবে—তবে—

: তবে আবার কি?—অনুরাধা হেসে ফেলল: আমাদের ক্লাসের অনেক মেয়ে মনে করে, বিয়েই হচ্ছে মেয়েদের সব চেয়ে ভাল কেরিয়ার। হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারে অনেক মেয়ের জীবনে উইণ্ডফল হয়। কিন্তু সেটা কেরিয়ার নয় এ্যাকসিডেণ্ট। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে there are commitments—expressed or understood—which you can not disown। সেখানে এগিয়ে যাবার একমাত্র পাসপোর্ট হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিগুলো।

: যাক, ও নিয়ে আর আলোচনা করে কাজ নেই। কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। শুধু এইটুকু জেনে রেখো, তুমি পরীক্ষাও দিতে পারবে এবং অনার্সও পেয়ে যাবে।

: জ্যোতিষশাস্ত্র?—অনুরাধা কৌতুকের হাসি টানল।

: না, ওটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

: থ্যাঙ্ক্‌স্।—চোখ বুঁজে নীরব হয়ে রইল অনুরাধা।

আমি তার আগের কথাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করলাম। অনুরাধা ব্যক্ত অথবা উহ্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ! বিয়ের ব্যাপারে সে আর খোলা-মন নয়। ও প্রশ্নের মীমাংসা তাকে করে ফেলতে হয়েছে। কার কাছে বাগদত্তা অনুরাধা? সে কি আমি নই? মনের মধ্যে একটা নিবিড় চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। না, মুখে সে আমার কাছে কোন অঙ্গীকার করেনি, কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে এখনও কোন প্রস্তাব করার অবকাশ পাওয়া যায় নি। কিন্তু মনে মনে অনুরাধা নিশ্চয়ই স্থির করে ফেলেছে নিজের সিদ্ধান্ত। সেই জন্যই শুধু অঙ্গীকার না বলে ব্যক্ত অথবা উহ্য বিশেষণ লাগিয়েছে। তাতে ইঙ্গিতটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠলেও অস্পষ্ট হয়নি। আমি ছাড়া মনে মনে বাক্‌দানের মত আর তো কেউ অনুরাধার জীবনে নেই। এতদিনে আমার প্রেমের একটা বাস্তব ভিত্তি পাওয়া গেছে। সেখান থেকে আশার সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো যায়। আমি তার কপালের উপর হাতটা আরও নিবিড়ভাবে চেপে ধরে আমার সমস্ত স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিতে চাইলাম। সে আমার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বুঁজল। মনে হল সে তার লজ্জা গোপনের প্রয়াস পাচ্ছে। সেটা আমার মনগড়া কল্পনাও হতে পারে, কিন্তু সেই চিন্তা আমাকে একটা স্নিগ্ধ আনন্দে অভিভূত করে ফেলল। অসুখে ওর মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই কথাটা অমনভাবে প্রকাশ করে ফেলেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় অমন একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়তো ওর পক্ষে সম্ভব হত না। যাইহোক, তাতে ওর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ সহজতর হয়ে গেল।

একটু পরেই মিসেস সরকার ফিরে এলেন। আমি আরও কিছুক্ষণ বসে রাত সাড়ে আটটায় বিদায় চাইলাম।

Expressed or understood commitment কথাটা সারাক্ষণ আমার কানের মধ্যে গুঞ্জন করতে লাগল। অনুরাধা উইণ্ডফলের কথা বলছিল। মনে হল, আজ আমার জীবনেই চমৎকার উইণ্ডফল হয়েছে। অনুরাধাকে আমি দীর্ঘকাল ধরে কামনা করেছি, কিন্তু কোন দিনই তাকে পাবার নিশ্চয়তা বোধ করতে পারিনি। একদিকে যেমন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেমের পথে এগোবার চেষ্টা করেছি, অন্যদিকে একটা তীব্র সংশয় আমাকে অবিরত সন্দেহের দোলায় দুলিয়েছে। মনে হয়েছে, যতই এগোই

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে গিয়ে বোধহয় পৌঁছতে পারব না। আজ সেই সংশয়ের অবসান হল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকতে গিয়ে আমি কিন্তু বেশ একটু দমে গেলাম। অনুরাধা আজ তার উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতির কথাই শুধু বলেনি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে। বলেছে, সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে। ভাল বাড়ি, ভাল সাড়ি, ভাল গাড়ি—অর্থাৎ বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার লোভ ষোলআনা এবং সেইটাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আনন্দের প্রথম উত্তেজনায় এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাটা আমি উপেক্ষা করেছি। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা বিশ্লেষণ করে অসামাল এবং হতাশা বোধ না করে পারলাম না।

নিজের উচ্চাশা পূরণের জন্য অনুরাধা খেটেখুটে একটা কেরিয়ার তৈরি করতে চায়। কারণ বাঞ্ছিত বস্তু লাভের জন্য সে কারও উপর নির্ভর করতে পারে না। যা চাওয়া যায়, তা হাত পাতলেই পাওয়া যাবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হাত পাতার শিক্ষাও সে পায়নি। নিজের সুখ সে নিজেই অর্জন করে নেবে। অনেক মেয়ের জীবনে বিয়ের ব্যাপারে উইণ্ডফল হয় কিন্তু সেটা অ্যাক্সিডেন্ট। যারা ব্যক্ত অথবা উহ্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাকসিডেন্টের প্রশ্ন ওঠে না। অনুরাধার এই কথাগুলো পরপর জুড়লে যেখানে গিয়ে পৌঁছতে হয়, সে জায়গাটা তার হবু স্বামীর পক্ষে খুব সম্মান-জনক নয়।

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিধি অনুসারে স্ত্রীর ভরণপোষণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব স্বামীর। এ যুগে মধ্যবিত্ত এবং গরীব শ্রেণীর মহিলারা অনেকে চাকরিবাকরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাতে সামাজিক বিধির কোন আমূল পরিবর্ত্তন হয়নি। স্ত্রী চাকরী করবেন, কি করবেন না, সেটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। করেন ভাল, না করলেও কেউ তার নিন্দা করবে না। চাকরি করুন আর নাই করুন, তাঁর ভরণপোষণের সামাজিক দায়িত্ব স্বামীর। যে স্বামী এই দায়িত্ব পালন করবেন না, তাঁকে পাড়াপড়শী গাল-মন্দ দেবে। সমাজে তার সম্মান থাকবে না। তাই স্বাবলম্বী মেয়েরাও বিয়ের সময় হবু স্বামীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদটা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখেন। সেইটাই স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যরকমও হয়। কোন বেকার অথবা আধা-বেকারের সঙ্গে ভাল চাকরি-করা মেয়ের হৃদয় বিনিময়

এবং বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই মেয়ে সব সময় চাইবে যে তার স্বামী কিছু একটা করে তার চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করুক। নইলে বন্ধুবান্ধবের কাছে তার সম্মান থাকবে কি করে? কুদর্শন পত্নীকে লোকের কাছে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে অনেক পুরুষের যে সংকোচ আছে, বেকার এবং আধা-বেকার পতিকে লোকের কাছে নিজের স্বামী বলে পরিচয় দিতে ভাল চাকরি করা অধিকাংশ নারীর সেই রকম সংকোচ থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। তাছাড়া বেশির ভাগ মেয়েরা সাধারণত নিজেদের গৌরবের চেয়ে প্রতিফলিত গৌরবটাকে বেশি পছন্দ করেন। নিজের গরবে গরবিনী হওয়ার চেয়ে স্বামীর গরবে গরবিনী হতেই বেশি ভালবাসেন। এই মানসিকতার ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করা আমার কাজ নয়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, সাধারণ মেয়েদের মনের স্বাভাবিক গতি এই রকমই হয়।

অনুরাধার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হবু স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে তার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। সে খুব ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে যে, হবু স্বামীর কাছে হাত পাতলে গাড়ি বাড়ি সাড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না। সেই হতাশা এড়াবার জন্য যৌবনের প্রারম্ভেই সে অশেষ পরিশ্রম করে একটা কেরিয়ার বানিয়ে নিতে চায়—যাতে নিজের সুখ সে নিজেই অর্জন করে নিতে পারে। অর্থাৎ হবু স্বামীর কাছ থেকে সে কোন বৈষয়িক সুখ প্রত্যাশা করে না। মনে মনে অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। করুণা? অনুকম্পা? বিয়ের আগেই হবু স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এতখানি মোহমুক্ত হওয়ার মানে কি তার কর্ম-দক্ষতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা নয়? আত্মগ্লানিতে আমার মনটা শির শির করে উঠল। অনুরাধা যেন পরোক্ষে আমার পৌরুষকেই বিদ্রুপ করেছে। যে মেয়ে বিয়ের আগেই নিশ্চিত হয়েছে যে, তার হবু স্বামী সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারবে না, তাকে সে ভালবাসবে কি করে? অনুরাধা বড় দাম্ভিক। নিজের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে প্রচুর আস্থা আছে কিন্তু অপরের সম্বন্ধে ধারণাটা খুব ছোট। এই মেয়ে আবার আমায় একদিন আত্মম্ভরী প্রমাণ করতে এসেছিল। ফুঃ! কেরিয়ার বানিয়ে গাড়ি বাড়ি করবে? বি-এ ক্লাসে পড়বার সময় এমন আকাশ-কুসুম অনেকেই কল্পনা করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাইরে পায়ের তলায় পৃথিবীর রুক্ষ মাটি পড়লে তখন বুঝবে কত

ধানে কত চাল! হয় স্কুল কলেজে শিক্ষকতা, না হয় সরকারী অফিসে কেরানীগিরি। তার বাইরে আর যাবে কোথায়? তাতে বড়জোর মাঝারি রকমের সাড়ির ব্যবস্থা হতে পারে। গাড়ি বাড়ি হবে না। হ্যাঁ, আজকাল কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য মেধার সঙ্গে সঙ্গে চাই প্রভাবশালী মহলের ব্যাকিং। সে অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার ব্যাপার। আমি তো ভেবেই পাই না, গাড়ি বাড়ি ভোগের মত বৈষয়িক সুখ অর্জন করে নেবার আত্মবিশ্বাস কোথায় পেল অনুরাধা।

বিনিদ্র রাত্রে অনুরাধার অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে একের পর এক যুক্তি খাড়া করে করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, আসলে অনুরাধার মনটা খুব স্থূল। জীবনের আত্মিক দিক সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ নেই। তার সঙ্গ আপাত-মধুর হলেও শেষ পর্যন্ত সেটা নীরস হয়ে উঠতে পারে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে হতাশ হলে নিজের মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলে। তাকে সঙ্গিনী করে সারা জীবন একত্রে কাটানো কঠিন।

তাহলে কি আমি পেছু হটব? ওকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেব যে, আমার সঙ্গে সত্যিই সে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ নয়। বিয়ের ব্যাপারে আমি তার পথে দাঁড়াতে ইচ্ছুক নই। সে কথা বলতে গেলে অবশ্য কারণ জানতে চাইবে। তখন আমি সবিনয়ে বলব: আমাকে তুমি ঠিক সহজ মনে গ্রহণ করতে পারবে না, কারণ আমি কৃতী পুরুষ নই। তাছাড়া তোমার উচ্চাশার সঙ্গে আমি ঠিক খাপ খাই না। আমি স্বল্পবিত্ত সামান্য লোক। একদিন আমাকে তোমার জীবনের Drag বলে মনে হবে। পৃথিবীর আলোয় সেই অশুভ দিনটা উদ্ভাসিত না হওয়াই ভাল। সুতরাং আজ হাসিমুখেই তোমার কাছ থেকে বিদায় চাইছি।

চমৎকার একটা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। অনুরাধা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমি আস্তে আস্তে পেছু ফিরে তার বিস্ময়-দৃষ্টির সামনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসব। সে হবে ওদের বাড়ি থেকে আমার শেষ বিদায়। অনুরাধা বলে কোন মেয়ে আমার জীবনে এসেছিল, সেই কথাটা আমি ক্রমে ক্রমে ভুলে যাবার চেষ্টা করব! ব্যাস। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যর্থতায় করুণ এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হবে।

কিন্তু অনুরাধার সঙ্গে চিরকালের মত বিচ্ছেদ হবে ভাবলেই বুকের ভিতরটা

মুচড়ে ওঠে। দিনের পর দিন যাকে তিল তিল করে মনের মধ্যে বিরাট প্রতিমার মত গড়ে তুলেছি, তাকে মন থেকে উপড়ে বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে সত্যিই বড় কঠিন। বিদায় দৃশ্যের নাটকীয় পরিস্থিতি যতই মনোমুগ্ধকর বলে মনে হোক, অনুরাধা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মোহময়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ধীরে ধীরে উল্টো সুরে গাইতে শুরু করল। অনুরাধার সম্বন্ধে ক্রমেই কাতর হয়ে পড়তে লাগলাম। শেষে দেখলাম, সমস্ত জিনিসটাকে আমি অত্যন্ত একপেশে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছি। অনুরাধার দিকটা একবারও ভেবে দেখিনি। তার বক্তব্যের মূলেও অনেক যুক্তি আছে। আমার সম্বন্ধে যদি তার কোন শ্রদ্ধাই না থাকে, তাহলে সে স্বেচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করতে চাইছে কেন? যে অঙ্গীকার উহ্য তাকে নীতিশাস্ত্রে অঙ্গীকার বলে কি না জানিনা। রাজদরবারে বলে না। অনুরাধা আমাকে ভাল না বাসলে নিজে সাধ করে এই তথাকথিত অঙ্গীকারের বেড়ি পায়ে পরতে চায় কেন? যা উহ্য ছিল তাকে ব্যক্ত করার মধ্যে তার কোন অশুভ ইচ্ছা তো প্রকাশ পাচ্ছে না। বরং তাতে তার সাধুতা এবং সরলতাই প্রকাশ পেয়েছে। আসলে আমাকে সে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী চতুর মেয়ে। সুখসমৃদ্ধি স্বচ্ছলতার দিকে প্রচুর লোভ অথচ বেশ বুঝতে পারছে, আমি তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারব না। আমার সেই অক্ষমতার ফলে পাছে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই জন্য গোড়া থেকেই আমাকে ও সম্বন্ধে দায়িত্বমুক্ত করে নিজেই নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ করে নিতে চায়। সে আমাকে করুণা অথবা অনুকম্পার চোখে দেখতে চায় নি। বরং স্ত্রীর সাধ না মেটাতে পারার মনকষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দেবার কথাই চিন্তা করেছে।

জীবনের আত্মিক দিক সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ নেই—এও আমার ভ্রান্ত ধারণা। তার ধ্যানধারণা আমার চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন। স্বচ্ছলতার মধ্যেই যে জীবনের প্রকৃত সুখ নিহিত, সে কথা কে অস্বীকার করবে? দারিদ্র্য পাপ, স্বচ্ছলতা পুণ্য। দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষ কোনদিন সুখী হতে পারেনি এবং পারবেও না। অনুরাধা আমাদের জীবন থেকে সেই দারিদ্র্য মোচনের আয়োজন মেতে উঠেছে। সেটাকে অনুচিত বলে মনে করা অন্তত আমার পক্ষে শোভা পায় না।

অনুরাধা ভাল মনেই আমায় গ্রহণ করুক আর খারাপ মনেই গ্রহণ করুক একটা ব্যাপার কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকছে। সে হচ্ছে আমার অক্ষমতা। আমি কোন মেয়েকেই সুখী এবং স্বচ্ছল জীবনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, কারণ আমি যে কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি, তাতে এদেশে নিছক বেঁচে থাকার মত মজুরী পাওয়া যায়। তার বেশি কিছু নয়। আমাকে যে বিয়ে করবে, সে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যকেই বরণ করে নেবে। যদি তাই-ই হয়, তাহলে আমিই বা অনুরাধাকে লাভ করবার জন্য এমন ক্ষেপে উঠেছি কেন? দারিদ্র্যকে চিরকাল ঘৃণা করি। কারণ দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে, মানুষের আত্মাকে ছোট করে দেয়। এ অবস্থায় যে মেয়েকে আমি সুন্দর এবং মহৎ বলে ভালবাসি তাকে চিরকালের জন্য সেই দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে এনে লাভ কি? হয়তো সে ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারবে না। হয়তো চিরকাল তাকে স্কুলে মাস্টারী করে কাটাতে হবে। তাতে বৈষয়িক সুখ আসবে—এমন কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। সুতরাং অনুরাধার মঙ্গলের জন্যই অনুরাধাকে আমার ত্যাগ করা উচিত। স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। আমাকে উদার এবং মহৎ হতে হবে। একদিন তাকে বলব, "অনুরাধা তোমার কাছ থেকে আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছি। তোমাকে লাভ করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তোমায় সুখী করতে পারব না। সারা জীবন শুধু দুঃখ দেব। সুতরাং এখানেই ইতি হোক আমাদের প্রণয়ানুরাগ।"

বিয়োগান্ত দৃশ্য হিসাবে এটাও নাটকীয় হবে সন্দেহ নেই। হয়তো সে আমার সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানতে চাইবে না। কিংবা হয়তো আরও মেলোড্রামাটিক কিছু একটা ঘটতে পারে। সেই ভাল।

কিন্তু—কিন্তু—অনুরাধার সঙ্গে চিরকালের মত বিচ্ছেদ! দুজনে পরস্পরকে গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ? আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এটা ট্রাজেডিই এবং সম্ভবত সামাজিকভাবেও। আমার ভাগ্য যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সারা জীবন শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে মৃত্যুর পথ তৈরি করে নেওয়া! সেই আমার পরিণাম।

শেষ রাত্রে আমি যখন অবসন্ন হয়ে পড়েছি চিন্তায়, তখন হঠাৎ আমার শশী মোহান্তির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তড়িতাঘাতে আশার আলোক দেখতে পেলাম। আমার নৌকো সব পুড়ে যায়নি। এখনও নদী পেরুবার মত একখানি তরী ঘাটে বাঁধা আছে। একটা সুযোগ

আমি এখনও নিতে পারি। সে হল বিলেতে চাকরি করতে যাবার প্রস্তাব—অবশ্য সেখানে যদি চাকরি পাওয়া যায়। শশী আমায় বিলেতে টেনে নিয়ে গেলে আমার একটা ভাল কেরিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো অনুরাধাকে কিছুটা সুখের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। মনে মনে শশীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গড়ে তুলতে লাগলাম এবং আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে অনুরাধাকে বিয়ে করতে হলে শশীর প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

আগে ইংল্যাণ্ডে চাকরি করতে যাবার ব্যাপারে যে সব মানসিক বাধা ছিল সেগুলো একে একে আমি ভেঙে চুরমার করে দিতে লাগলাম। লেখা? লেখা আমি ছেড়ে দেব। লিখে স্বচ্ছলভাবে জীবিকানির্বাহ করতে হলে লেখাটাকেই সারাক্ষণের কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। আমার দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। প্রতি দিনের আহার সংগ্রহের জন্য কারখানায় চাকরি আমাকে করতেই হবে, আর চাকরি করলে লেখাটা সব সময় মার খাবে। ফলে কোনদিনই আমি লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারব না। লেখক অর্থবান না হলে লেখক হিসাবেও সমাজে তার কোন সম্মান নেই। এ যুগে কার লেখা কত ভাল, তা দিয়ে লেখকের যোগ্যতা বিচার হয় না। কোন লেখক কত টাকা জমিয়েছে, সেইটাই হচ্ছে তার লেখার ভালমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। অর্থ অথবা সম্মান কোনটাই যদি না পাই, তাহলে লেখার দিকে মোহই বা রাখতে যাব কেন? শশী মোহান্তি ঠিকই বলেছিল, "বাঙালীরা সাহিত্যের জাত মারতে পেলে আর কিছু করতে চায় না।" তার ঐ কথার মধ্যে কিছুটা যে সত্যি আছে তা নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি। সাহিত্যও পেশা, ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানশিপও পেশা। দুটোতেই আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। যে পেশায় উন্নতি করা আমার পক্ষে সহজতর, সেই পেশাই এখন আমার গ্রহণ করা উচিত এবং তাতেই আমার লেগে থাকা কর্তব্য। ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান হিসাবে আমি যদি কোনদিন হাজার টাকা রোজগার করি, তাহলে কম রোজগেরে সাহিত্যিকের চেয়ে সমাজে আমার সম্মান অনেক বেশি হবে। তথাকথিত খ্যাতির পেছনে ছুটে কোন লাভ নেই। অনুরাধাকে নিয়ে শান্ত সুখী স্বচ্ছল জীবন যাপন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়।

অবশেষে যখন আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম তখন ভোরের কুয়াশায় জানলার কাঁচ ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

পরদিন কারখানা থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে আমি সোজা অনুরাধার কাছে চলে গেলাম। আজ সে অনেক সুস্থ। জ্বর নেই, মাথার যন্ত্রণাও কমে গেছে। মুখটা অনেক প্রফুল্ল।

: কি ব্যাপার? আজ কাজে যান নি?—হাসিমুখে প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: গিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে চলে এলাম।

: কেন?

: তোমাকে, আই মিন, আপনার অবস্থাটা দেখতে।

মিসেস সরকার খাটের পাশে বসে কি একটা রিপুর কাজ করছিলেন। আমার সম্বোধনের রকমফের শুনে অনুরাধা মুখ লাল করে আড়চোখে একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে নিল। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন বলে আমার কথাটাকে ভাল করে খেয়াল করেন নি। তা সত্ত্বেও আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। সহজ হবার জন্য হাল্কা সুরে বললাম: বাব্বা, কাল আপনি যে রকম নার্ভাস হয়েছিলেন। আমি তো দস্তুর মত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—না জানি কি সাংঘাতিক অসুখ করেছে।

মিসেস সরকার মুখ তুলে বললেন: যা বলেছ অশোক। মেয়ে এই দুদিন কেঁদে কেঁটে কি কাণ্ডই করেছে। পরীক্ষাটা নাকি আর কিছুতেই দেওয়া হবে না।

: আজ কি মনে হচ্ছে? পরীক্ষা দেওয়া হবে?

: হ্যাঁ, আজ একটু আশা হয়েছে। দুপুরে তো বই নিয়ে বসতে যাচ্ছিল। আমি মানা করলাম।

অনুরাধা কোন কথা বলল না। তার ঠোঁটে একটা লজ্জার হাসি লাগল।

: আজকালকার মেয়েরা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হুঁশিয়ার। বয়স বিশ বছর পেরুতে না পেরুতে কেরিয়ারের জন্য ক্ষেপে ওঠে। ওদের বয়সে আমরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তাই করতাম না।

: তাই দেখছি। কি কেরিয়ার করতে চান উনি?—আমি জানতে চাইলাম। এ কৌতূহল কাল থেকে আমায় তাড়না করছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে কোন্ কেরিয়ার সামনে রেখে গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন দেখছে?

মিসেস সরকার বললেন: তা কেরিয়ারটা পছন্দ করেছে মন্দ নয়।

: মা—প্লীজ—প্লীজ—কিছু বোলো না।—অনুরাধা তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানাল।

মিসেস সরকার হাসিমুখে বললেন : কেন রে, অশোক তো আমাদের পর নয়। ওর কাছে বলতে আপত্তি কিসের ?

: হ্যাঁ, আমার কাছে বলতে বাধা কি ? আমি ওটা গোপন রাখব।

: বেশ, তাহলে বলতে পার।—আপত্তি তুলে নিল অনুরাধা : তবে হাসতে পারবেন না।

: সেটা যখন হাসির কথা নয়, তখন হাসবার প্রশ্ন উঠছে কিসে ?

: অনুর বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। মেয়ের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। তাই ও দাদুর মত আইনজ্ঞ হবে বলে ঠিক করেছে! বি-এ পাশ করে এম-এ আর ল একসঙ্গে পড়বে। তারপর টাকা জমিয়ে বিলেতে যাবে ব্যারিস্টারী পড়তে।

মনে মনে আর একবার বোকা বনতে হল। মেয়েরা যত রকমের পেশায় কাজ করে সবই আমি কল্পনা করেছি, কিন্তু আইন ব্যবসার কথাটা একবারও আমার মাথায় খেলেনি। পেশা নির্বাচনে অভিনবত্ব আছে মানতেই হবে।

: মনে মনে হাসছেন তো ?—আমাকে নির্বাক দেখে প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: না।

: তবে চুপ হয়ে গেলেন যে ?

: এমনিই।

অনুরাধা কালো গাউন এবং সাদা কলার পরে বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে উত্তরাধিকার আইনের জটিল বিধান বিশ্লেষণ করছে ভাবতে সত্যিই আমার অবাক লাগে। আদালতে কেরিয়ার তৈরি করাও সহজ নয়। ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে প্রভাবশীল এটর্নী-ব্যারিস্টারদের পৃষ্ঠপোষকতা চাই। বড় লোকের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সেখানে কেরিয়ার করা যত সহজ, গরীবের পক্ষে তত সহজ নয়। তবে অনুরাধা স্মার্ট মেয়ে। চেষ্টা করলে কোন প্রবীণ ব্যারিস্টারের জুনিয়ার হওয়া ওর পক্ষে কঠিন হবে না। আদালতে মেয়ে উকিল-ব্যারিস্টারের সংখ্যা খুব কম। যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বড়লোকের মেয়ে অথবা বউ। পেশাটা আসলে তাঁদের অনেকেরই সময় কাটাবার অজুহাত। দুপুর বেলায় বাড়িতে না ঘুমিয়ে তাঁরা আদালতে আড্ডা মারতে যান। এ অবস্থায় অনুরাধা কেরিয়ার বানাবার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে গোড়া থেকেই পেশায় লেগে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের বউ প্র্যাকটিশিং ব্যারিস্টার! ব্যাপারটা ঠাট্টার মত লাগে। মেয়ে ব্যারিস্টারদের আদর্শ স্বামী কারা তা ঠিক জানি না। তবে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান যে নয়, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের বিয়েটা নানা দিক দিয়েই একটু বে-মানান হবে। অনুরাধা এম-এ, বি-এল পাশ করতে যাচ্ছে কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় আমি নিতান্তই ম্যাট্রিকুলেট। টেকনিকাল স্কুলে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা নিয়েছি। তিন টাকা রোজে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে মজুর হয়ে ঢুকেছিলাম। আঁকায় আমার বিশেষ দক্ষতা আছে দেখে জেনারেল ম্যানেজার আমাকে ড্রইং বিভাগে সিনিয়র গ্রেডে তুলে নেন। সেই থেকে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানশিপটাই হয়ে গেছে আমার পেশা। যে স্কুল থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা পেয়েছিলাম, সেই স্কুলের ডিপ্লোমা বাজারে অচল। এখন কাজের অভিজ্ঞতাই চাকরির বাজারে আমার একমাত্র পুঁজি। অনুরাধাকে চাওয়া আমার পক্ষে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো হয়ে যাচ্ছে না কি?

না, তা হচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরা যায় না। কিন্তু অনুরাধা স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে।

: তাইতো অশোক, তুমি অফিস থেকে সোজা এখানে এলে। চা-টা খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। যাই বানিয়ে আনি।—বললেন মিসেস সরকার। তারপর সেলাইয়ের কাজটা তুলে রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

জানি না কেন, অনুরাধার মুখের দিকে তাকাতে এবং তার সঙ্গে কথা বলতে আমার লজ্জা লাগছিল। মিসেস সরকার চলে যেতে বহুক্ষণ আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনুরাধাও কোন কথা বলল না। সম্ভবত সে-ও বেশ একটু লজ্জায় রয়েছে। গতকাল অসতর্ক মুহূর্তে নিজের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় আজ সে বোধ হয় একটু সঙ্কোচ বোধ করছে।

: অমলদার খবর কি?—হঠাৎ হাল্কা সুরে প্রশ্ন করল সে।

: নতুন আর কি। তারপর আর দেখা হল কবে?

: কি বলেছে আপনার কাছে? সিংহ পাঁকে পড়লে শিয়ালও তাকে লাথি মারে? সবই একটু দেরিতে বোঝে। বেশ ইণ্টারেস্টিং লোক, কি বলুন।—অনুরাধা হাসি মুখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

: ভেরি ইণ্টারেস্টিং। দোষেগুণে একেবারে জীবন্ত মানুষ। তাঁকে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।

অনুরাধা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। মনে হল, বল্টুর সম্বন্ধে সে প্রশংসাসূচক আরও অনেক কথা শুনতে চায়। কিন্তু যেহেতু স্টকে নতুন কিছু ছিল না, তাই আমি থেমে গেলাম।

: আমার বরাবর ধারণা, তার ভাল হবার মূলে আছেন আপনি। কি শুভক্ষণে যে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। অমলদাকে ভাল করে আপনি শুধু তাকেই বাঁচান নি, আরও বহু লোকের মুখেই হাসি ফুটিয়েছেন।

বল্টুর ভাল হবার পেছনে আমার কোন দান নেই সে কথা আগেই একদিন অনুরাধাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও ওর সেই ভুল ধারণা মন থেকে মুছতে চাইছে না। আমার সম্বন্ধে ওর মনে একটা উঁচু ধারণা থাকা আমার পক্ষে ভালই। তাই আজ আমি তার প্রশংসা মোটামুটি মেনে নিয়ে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' করে বললাম: না না, আমি কিছু নই। তাঁর ভিতরে ভাল জিনিস ছিল বলেই তিনি ভাল হয়েছেন। সমস্ত ক্রেডিট তাঁর। এর মধ্যে আমাকে টানা অন্যায়।

মিসেস সরকার ঘরে এলেন। বল্টুর কথা চাপা পড়ল।

আজও রাত আটটা পর্যন্ত আমি সরকারদের বাড়িতে কাটিয়ে এলাম। ফেরার পথে হঠাৎ আমার মাথায় মধ্যে অদ্ভুত একটা যোগাযোগের খেয়াল হল। আমি চাকরি করতে বিলেতে যাব বলে স্থির করেছি। অনুরাধাও ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেতে যাবে। আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য ইংল্যাণ্ড। এ যোগাযোগটাকে আমি নিজের সুবিধায় নিয়ে আসতে পারি না কি? অনুরাধা যদি ব্যারিস্টারী পড়তে চায়, তাহলে তার এদেশে এম-এ এবং ল পড়ার প্রয়োজন কি? বি-এ পাশের পরেই সে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে যেতে পারে। আমরা দুজনে একই জাহাজে বিলেতে গিয়ে একই বাসায় সংসার পেতে বসতে পারি। শশী বিলাতী কোম্পানী থেকে যে নিয়োগপত্র পেয়েছিল, তাতেই বিলেতে তার সম্ভাব্য মাসিক ব্যয়ের একটা হিসাব দেওয়া ছিল। সাত-আট শো টাকায় সেখানে বউ নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবেই বাস করা যায়। তাহলে বিলেতে যাবার আগেই অনুরাধাকে বিয়ে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই না কেন? এ প্রস্তাব অনুরাধার পক্ষেও নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে তার বাবার সঞ্চিত অর্থে আর টান পড়বে না এবং মিসেস সরকারও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তা বোধ করতে

পারবেন। অবশ্য তাঁর শরীর একটা মস্ত প্রশ্ন। দীর্ঘ-মেয়াদী কঠিন অসুখ থেকে তিনি সদ্য সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁকে এখানে একেবারে নিঃসঙ্গ করে রেখে যাওয়ার অসুবিধা আছে। তবে অনুরাধার বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুতে আরও তিন চার মাস বাকী। আমারও বিলেতে চাকরি পেতে দু-চার মাস লাগতে পারে। ততদিনে মিসেস সরকার নিশ্চয়ই নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবেন। চমৎকার হবে। আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল। অনুরাধার কেরিয়ার. গড়ায় আমি যে কিছুটা সাহায্য করতে পারব, সেই উপলব্ধি আমার মর্যাদাবোধ এবং আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করল। অনুরাধাকে লাভ করার মূল্য হিসাবে তাকে কিছুই দিতে না পারার চিন্তায় কাল থেকে মনটা বড় অবদমিত হয়েছিল। অনুরাধা যেন তার কৃপা দিয়েই আমার অযোগ্যতার শূন্য পেয়ালা ভরে দিতে এগিয়ে এসেছে। সে কৃপা অমৃতের মত সুস্বাদ হলেও আমার পৌরুষকে খর্ব না করে পারে না।

আমি কোথাও তাকে একটু সাহায্য করে নিজের আত্মগ্লানি এবং হীনমন্যতা লাঘব করতে চাই। তাহলে আর আমার মনে কোন দ্বিধা থাকে না।

সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন শশীর উপর নির্ভরশীল। যখন সে কলকাতা ছাড়ে তখন একবারও আমি ভাবতে পারিনি যে, তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমাকে এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হবে। আজ তার চিঠির প্রত্যাশায় আমি বোধ হয় কিছুটা অধৈর্যই হয়ে উঠেছি।

সপ্তাহের শেষদিকে অনুরাধা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার পড়াশোনায় মেতে উঠল।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি স্থির করলাম, আপাতত অনুরাধাকে কিছুই বলা হবে না। শশীর চিঠি পাই, চাকরির দরখাস্ত করি, নিয়োগপত্র আসুক, তারপর একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে বিয়ে এবং একসঙ্গে বিলেত যাবার প্রস্তাব করব। তার আগে আর কিছু নয়। বিলেতে চাকরি না পেলে অনুরাধাকে আমি বিয়ে করব না।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়, কেনাকাটা, মুনাফা, কস্ট, ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত তথ্য ইউনিয়নের হস্তগত হল। সেগুলির ভিত্তিতে আমরা একটা স্মারকলিপি তৈরি করলাম।

কোম্পানীটা সাহেবদের সময় কিভাবে চলত এবং ঘনশ্যামের আমলে কিভাবে চলছে, তার একটা তুলনামূলক সমালোচনা করে আলাদা একটা রিপোর্ট তৈরি করা হল। অযোগ্য বণিকের হাতে পড়ে দেশের শিল্পায়ণ এবং অগ্রগতি কিভাবে ব্যহত হচ্ছে, তা আমাদের সেই রিপোর্টে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ইংরেজরা কলকারখানার মাধ্যমে এদেশের লোককে শোষণ করুক তা কেউ চায় না। আমরা চাই যে ইংরেজরা দেশের অর্থনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও চাই চাই যে, তারা এদেশে যে সব শিল্প গড়ে তুলেছে সেগুলো দেশের মঙ্গলের জন্য যোগ্য লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হোক। চোরাকারবারী এবং ফাটকা-বাজারী প্রকৃত শিল্পবাণিজ্যের কিছুই জানে না। অথচ প্রচুর কাঁচা টাকার মালিক বলে বেশি বেশি দাম দিয়ে তারা ইংরেজদের সঙ্গে থেকে তাদের কলকারখানা কিনে নিচ্ছে। কিন্তু সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারছে না। ফলে ক্ষতি হচ্ছে দেশের লোকের। সুতরাং আমাদের দাবি হচ্ছে, গভর্নমেণ্ট হস্তান্তরিত শিল্পের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করুন এবং এ সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট নীতি ঠিক করে নিন।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কারখানা থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়ে ইউনিয়নের তরফ থেকে তিনজনের একটা প্রতিনিধি দল দিল্লী রওনা হল। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। দিল্লীতে তখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলছিল। বাঙলা দেশের একজন এম-পি-কে ধরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাদের স্মারকলিপির উপর চোখ বুলিয়ে সেক্রেটারীকে দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোন লাভ হবে না। আমরা যেন শিল্পসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পরদিন আমরা গেলাম শিল্পসচিবের বাড়ি। তিনি পাঁচ মিনিটের জন্য আমাদের দর্শন দিলেন এবং যখন শুনলেন যে, আমরা শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে এসেছি তখন আমাদের কথা আর শোনবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঃ আপনারা বরং শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।—উপদেশের ভঙ্গিতে বললেন তিনি ঃ আপনাদের এই মামলা deal করার পক্ষে তিনিই হলেন আসল লোক। শিল্পসচিবের কাজ হচ্ছে শুধু সরকারের শিল্পনীতি নির্ধারণ করা। শিল্প-শ্রমিকদের ব্যাপারে তাঁর কিছু করবার নেই।

ঃ কিন্তু আমাদের মামলাটা শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই।—আমরা

তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম, কিন্তু তিনি অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদের দর্শন দেবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব যে আমাদের কথায় কর্ণপাত করার সময় পেলেন না। হাসিমুখে সবিনয়ে বললেন : আপনারা মিছিমিছি আমার সময় নষ্ট করবেন না ভাই। বোম্বাই থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার টেক্সটাইল পলিসি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। He will solve your problems।

বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা বেশ একটু হতাশ মনেই সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হলাম। মন্ত্রীরা যদি আমাদের কথা সব না শুনেই দায়িত্বটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা তাঁদের বিষয়টা বোঝাই কি করে? ভয় হল, আমাদের দিল্লী-মিশন বোধ হয় ব্যর্থ হবে। বিষয়টা জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীরা কেউ এতে মাথা দিতে চাইবেন না, কারণ আমরা তো কেউ বিশিষ্ট ব্যক্তি নই। নিতান্তই শ্রমিকদের প্রতিনিধি। মন্ত্রীদের কান হচ্ছে বড়লোকদের জন্য, মালিকদের জন্য। তাঁদের বক্তব্য শোনবার জন্য ওঁরা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। ইচ্ছে করলে বড়লোকরা সেই কান টেনে ওঁদের মাথাগুলোও বগলদাবা করতে পারেন। আমাদের কাছে ওঁরা বধির।

আমরাও অবশ্য ছাড়বার পাত্র নই। দেশে গণতন্ত্রের মহিমা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আমাদের ভোটে নির্বাচিত লোকেরাই এখন রাষ্ট্রের মন্ত্রী। আমাদের কথা তাঁদের কানে না ঢুকিয়ে ছাড়ছি না। পরদিন আর এক এম-পিকে ধরে আমরা শ্রমমন্ত্রীর বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম। মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের উমেদার এম-পির পুরানো বন্ধুত্ব। তাই তিনি আমাদের বক্তব্য শোনবার জন্য পনেরো মিনিট ব্যয় করতে রাজি হলেন।

শ্রমমন্ত্রীর যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁকে ডিসপেপটিক রোগীর মত দেখায়। কিন্তু সামনাসামনি দেখে সেই ভুলটা ভেঙে গেল। দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারাটা বেশ ভালই। লম্বা বেশি বলে একটু রোগাটে দেখায়। আলাপ-ব্যবহারে অতি ভদ্র। আগে শ্রমিক নেতা ছিলেন। তাই শ্রমিক দেখে নাক সেঁটকাবার অভ্যাস নেই।

: হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন তো?—জানতে চাইলেন তিনি।

আমরা স্মারকলিপির একটা কপি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম : এতেই সব লেখা আছে।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন : এটা পড়তে তো অনেক সময় লাগবে। আসল ঘটনাটা কি ছোট করে বলুন না।

আমরাও তাই চাই। স্মারকলিপিতে সব কথা লেখা থাকলেও মুখে বললে আসল ব্যাপারটা সহজেই পরিষ্কার হবে।

বললাম : আমরা সব বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কর্মচারী। কোম্পানির মালিক আগে ছিলেন ইংরেজরা।

: এখন সেটা ঘনশ্যাম জালানের।—মন্ত্রীমশাই যোগ করলেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো সব জানেন দেখছি। ঘনশ্যামবাবু কোম্পানীটা ঠিক দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারছেন না।

: তাতে আপনাদের কি ?—ধমকের স্বরে বললেন মন্ত্রী মশাই।

আমি সতর্ক হয়ে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম : না, তাতে আমাদের কিছু নয়। এই কারখানায় রেলওয়ে ওয়াগন তৈরি হয় জানেন বোধ হয় ?

: জানি।

: সেই ওয়াগনের ক্রেতা একমাত্র রেলওয়ে বোর্ড। এতকাল আমাদের কারখানায় ওয়েল্ড-করা ওয়াগন তৈরি হচ্ছিল। সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড রিভেট করা ওয়াগনের অর্ডার দিতে চাইছেন আর জালান সাহেব এই পরিবর্তনের সুযোগে মুনাফা বহুগুণ বাড়িয়ে নেবার চক্রান্ত করেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের একজন ভূতপূর্ব সদস্যকে কোম্পানীর পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি মতলব দিয়েছেন যে, দেশে ওয়াগন তৈরির কারখানা যখন বেশি নেই, তখন রেলওয়ে বোর্ডকে চাপ দিয়ে ওয়াগনের দাম বাড়িয়ে নেওয়া মোটেই কষ্টকর হবে না। অথচ স্যার, আমরা সব হিসাবনিকাশ করে দেখেছি, যে দরে রেলওয়ে বোর্ড এখন ওয়াগন কিনছে, তার চেয়ে ওয়াগনের ন্যায্য মূল্য অনেক কম হওয়া উচিত। সেখানে কিনা দাম না কমিয়ে দাম বাড়াবার চেষ্টা—

শ্রমমন্ত্রী বাধা দিলেন : কি যে আপনারা বলতে এসেছেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না। মালিক তার কারখানার জিনিস কার কাছে কি দরে বেচবে সেটা তার নিজের মর্জির উপর নির্ভর করছে। তাতে শ্রমিকের তো কিছু বলবার থাকে না। আপনারা কেউ অর্থনীতির বই পড়েননি নিশ্চয়ই। জিনিসপত্রের দাম বাজারের চাহিদার উপর কমে বাড়ে। যদি দেশে

ওয়াগনের চাহিদা বাড়ে এবং সরবরাহ কমে, তাহলে ওয়াগনের দাম বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর সেই বাড়াত মুনাফা মালিকের পকেটেই যাবে। তাতে শ্রমিকদের আপত্তি করা উচিত নয়।

: কিন্তু স্যার রেলওয়ে বোর্ড তো আর কোন প্রাইভেট পার্টি নয়। সেটা আমাদের একটা জাতীয় সংস্থা। তার লাভ-লোকসানের ভাগীদার দেশের সাধারণ মানুষ—

: রেলওয়ে বোর্ড জাতীয় সংস্থা হলেও ক্রেতা হিসাবে একটা পার্টি। বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই তাকে কেনা-বেচা করতে হবে। তাছাড়া, ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। দেশের লোকের লাভ হচ্ছে কি লোকসান হচ্ছে, তা দেখা আমার কাজ নয়। আমি শুধু শ্রমিকদের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে deal করি। সে ব্যাপারে যদি আপনাদের কোন বক্তব্য না থাকে, তাহলে এবার বিদায় নিতে পারেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলবার আছে। সেই কথাটা বলবার জন্যই আগের কথাগুলো বলতে হল।

: বেশ বলুন। পাঁচ মিনিটের বেশি নেবেন না। আমার আরও কাজ আছে।—শেষের কথাটা তিনি হাসিমুখেই বললেন।

: ঘনশ্যামবাবু ঠিক করেছেন, রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে দর কষাকষিতে প্রথম পর্যায়ে তিনি যদি হেরে যান, তাহলে ওয়াগন শপ বন্ধ করে আমাদের হয় লে-অফ না হয় ছাঁটাই করবেন। তাতে বেকার হয়ে আমরা সোরগোল তুলব আর সেই চাপে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের কাছ থেকে নিজের দর আদায় করে নেবেন। রেলওয়ে বোর্ড তাতেও না নামলে ওয়াগন শপ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। তার পরিণাম বুঝতেই পারছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে এতগুলো স্কিল্‌ড্‌ লেবারকে সপরিবারে অনশনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আসলে আপনার কাছে আমরা এসেছি সেই সমস্যা নিয়ে।

মন্ত্রীমশাই মুখ গম্ভীর করে বললেন: রাম না জন্মাতেই যে আপনারা রামায়ণ তৈরি করছেন মশাই। কবে কি হবে অথবা হতে পারে, তা নিয়ে আগে থেকে অত ভাবনার কি আছে। কিছু একটা ঘটুক, কারখানা বন্ধ হোক, তারপর আসবেন। তখন দেখা যাবে কি করতে পারি না পারি।

: কিন্তু স্যার, কিছু একটা অন্যায় ঘটে যাবার আগেই সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি ?

: অন্যায় ঘটছে, কি ঘটছে না, সেটা বিচার করবে কে ?

: আজ্ঞে আমাদের স্মারকলিপিতে সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে। পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

: এক পক্ষের কথা শুনে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাছাড়া আপনারা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে রাজনীতি ঢোকাতে চাইছেন। দ্যাট্স্ ব্যাড।

: রাজনীতি !—আমরা বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

: হ্যাঁ, কথা শুনে সেই রকমই মান হচ্ছে। নইলে মালিকের বিজনেস পলিসির মধ্যে নাক গলাতে চাইছেন কেন ? আপনাদের ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট কতজন ?

: কম্যুনিস্ট ! মানে—

: আপনার রাজনৈতিক মতবাদ কি ?—মন্ত্রীমশাই হাসিমুখে আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমি বিব্রতভাবে বললাম: আমার কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই স্যার। আমি কখনও রাজনীতি চর্চা করিনি।

মন্ত্রীমশাই একটু জোরে হেসে উঠলেন। আমার কথা যে উনি বিশ্বাস করেন নি, তা ঐ হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ আমাকে উনি কম্যুনিস্টই ধরে নিয়েছেন। আমি সত্যিই খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

: আচ্ছা ঠিক আছে, স্মারকলিপিটা ভাল করে পড়ে দেখব। যদি কিছু করবার থাকে, করা হবে। নমস্কার।

প্রকৃতপক্ষে দিল্লীতে আমাদের কোন কাজই হল না। অবশ্য খুব একটা বড় আশা নিয়ে আমরা দিল্লী যাইনি। দেশে অনেক অন্যায়েরই প্রতিকার হচ্ছে না। আমাদেরটা হবে তাই বা আমরা আশা করব কেন ? তবে মনে মনে এই ধারণা ছিল যে, ঘনশ্যাম গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছেন জানতে পারলে হয়তো মন্ত্রীদের গা একটু গরম হবে। কিন্তু বোঝা গেল, ও ফাঁকিটাকে তারা ফাঁকি বলে মনে করেন না। ওটাকে তাঁরা বলেন বিজনেস পলিসি। ব্যবসায়ী ক্রেতাকে ঠকাবে সে নাকি অর্থনীতির নিয়ম। অর্থনীতি ভাল করে পড়া নেই। কাজেই ও সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে

যে অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে প্রবঞ্চনা তার প্রতি জনসেবক মন্ত্রীদের এত শ্রদ্ধা দেখেই অবাক লাগে। যাক, ও নিয়ে আর চিন্তা করব না। কারণ তাহলে সেটা 'রাজনীতি' হয়ে উঠবে। এইটুকু শুধু বোঝা যাচ্ছে যে, ঘনশ্যাম জালান আমাদের নিয়ে যে খেলা খেলতে চাইছেন, সে খেলা বন্ধ করার কোন উপায় আমাদের নেই। মানুষ খুন হয়ে গেলে পুলিস আসামীর সন্ধান করতে পারে, কিন্তু যে খুনের পায়তাড়া কষছে তাকে তো আর আসামী বলে গ্রেপ্তার করা যায় না। তাহলে যে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে। ঘনশ্যাম যতক্ষণ না আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছেন, ততক্ষণ শ্রমসচিবের কিছু করবার নেই। এটাই হল গণতান্ত্রিক যুক্তি।

কলকাতায় ফিরে বাসায় পৌছেই শশীর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, তাদের কারখানায় এখনও বহু ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান নেওয়া হবে। আমি যেন অবিলম্বে এয়ার মেলে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিই। তাহলে পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যেই নিয়োগপত্র পেয়ে যাব। শশীর কাজে কারখানা কর্তৃপক্ষ নাকি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সম্বন্ধে তাদের আস্থা বেড়ে গেছে।

দিল্লীর ব্যর্থতায় মনটা মুষড়ে পড়েছিল। শশীর চিঠি আবার আমায় চাঙ্গা করে তুলল। এ তো শুধু বেশি মাইনের চাকরি নয়, এ আমার বাঞ্ছিত ভবিষ্যতের সূচনা। চাকরি এবং অনুরাধা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে যে একটা থেকে অপরটাকে পৃথক করা যায় না।

শশীর নির্দেশমত সেই দিনই আমি সার্টিফিকেট এবং প্রশংসাপত্রের কপি সহ দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম এয়ার মেলে।

কারখানায় সকলেই আমাদের দিল্লী অভিযানের কাহিনী শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। ছুটির পর ইউনিয়নের একটা বিশেষ সভায় আমরা দিল্লীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। শুনে সকলেই দুঃখিত হলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। মালিক এবং গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে শ্রমিকরা এর বেশি কিই বা আশা করতে পারে? শ্রমিকের শক্তি হচ্ছে তার ঐক্য এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। ইউনিয়ন এখন আরও দৃঢ়ভাবে সেই পথে এগোবে। ওয়াগন শপ বন্ধ হলে সেই সঙ্গে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনই বন্ধ হবে। মরতে হলে সবাই এক সঙ্গে লড়াই করে মরবে আর বাঁচতে হলেও সবাই এক সঙ্গে লড়াই করে বাঁচবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

দিল্লী থেকে ফিরে শশীর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার সঙ্গে দেখা

করবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু পরপর তিনদিন ইউনিয়নের সভাসমিতিতে এমন আটকে গেলাম যে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। তাদের বাসায় যাওয়া হয়নি।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় সময় করে সে বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, অনুরাধাদের সদর দরজায় তালা মারা রয়েছে। কি ব্যাপার? কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছে নাকি? ফিরে যাব, না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব?

পাশের ফ্ল্যাটের একটা ছোট ছেলে আমাকে অনুরাধাদের দরজায় অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল: অনু মাসীরা বাড়ি নেই।

: কোথায় গেছেন?

: পুরীতে বেড়াতে গেছেন।

: কবে?

: পরশু দিন।

: তাই নাকি!—আমি একটু বিস্মিত হলাম। আমার দিল্লী যাবার সময় ওঁদের পুরী যাবার কোন প্রোগ্রামের কথা শুনিনি। হঠাৎ মায়ে ঝিয়ে বাইরে বেড়াতে বেরুবার শখ হল কেন?

: হ্যাঁ। পরশু বিকেলবেলায় সবাই মিলে চলে গেলেন।

: কে কে গেলেন?

: অনু মাসী, দিদিমা, তিনতলার দেশাইবাবু আর তাঁদের বাড়ির সবাই।

: কবে ফিরে আসবেন?

ছেলেটি একটু ভেবে বলল: তা তো জানি না। বাক্সবিছানা সব নিয়ে গেছেন।

উত্তরটা সঠিক না পেলেও আমি বুঝতে পারলাম, সরকাররা দেশাইদের সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গেছেন। মিসেস সরকার হাঁটতে শেখা অবধি বাইরে বেরুবার জন্য উসখুস করছিলেন। এ একরকম ভালই হয়েছে। অসুখ এবং পরীক্ষার চাপে অনুরাধা বেশ একটু কাবু হয়ে পড়েছিল। স্থান পরিবর্তনের ফলে তার শরীরটা তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। কিন্তু কবে তারা ফিরবে, সেটা না বুঝতে পেরে মনটা বেশ একটু চঞ্চলও হয়ে উঠল। অনুরাধাকে অনেকদিন দেখিনি। তার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ একদিন আমার ডাক পড়ল ঘনশ্যাম

জালানের ঘরে। কারখানায় যে কাজ আমি করি তাতে খোদ মালিকের নজরে পড়ার কথা নয়। তিনি আমার নামে স্লিপ দিয়ে ডেকে পাঠালেন— ব্যাপারটা কি ?

ঘরে ঢুকে দেখি ঘনশ্যামের পাশে সর্দার কৃপাল সিংও বসে আছেন। দুজনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন।

: আপনিই কি মিস্টার মিত্র।—জিজ্ঞাসা করলেন কৃপাল সিং।

: ইয়েস স্যার।

: আপনি ড্রইংয়ে কাজ করেন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: কতদিন কাজ করছেন এখানে ?

: যুদ্ধের সময় থেকে।

: মাইনে কত ?

: সওয়া দুশো।

: দেশ কোথায় ?

: পূর্ববঙ্গে ছিল।

এক মিনিট চুপ করে রইলেন কৃপাল সিং। শেষে চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন : মিস্টার মিত্র, এই মাসের গোড়ায় আপনি দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলেন ?

: ইয়েস স্যার।

: ছুটিতে কোথায় গিয়েছিলেন জানতে পারি ? অবশ্য বলতে যদি আপত্তি না থাকে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম : দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সে কথা তো সকলেই জানে স্যার। আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

: দেখা করে যা বলেছেন সবই কোম্পানীর সুনাম হানি করে, তা জানেন ?

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। অভিযোগটা মিথ্যে নয়। কিন্তু যে দুর্নামের কাজ করছে, সে সুনামের আশাই বা করে কেন ?

: আপনি তো লেখাপড়া জানেন এবং বইটই লেখেন বলে খবর পেয়েছি। আপনিই বলুন, মন্ত্রীমশাইকে যা বলে এসেছেন তাতে আমাদের কোম্পানীর সুনাম বেড়েছে কি ?

আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে বললাম : দেখুন স্যার, তাঁর সঙ্গে আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে কোম্পানীর সম্বন্ধেও কিছু কথা উঠবে—এ তো অস্বাভাবিক নয়।

: অস্বাভাবিক নয়?—কৃপাল সিং চটে উঠলেন : কোম্পানীর ভিতরের খবর আপনি বাইরে প্রকাশ করবেন—এ অধিকার কোথায় পেলেন? আপনার কাজ হচ্ছে কারখানায় ডিউটি করে সময় মত মাইনে নেওয়া। বড়জোর আপনি আপনার অভাব অভিযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। কোম্পানীর কেনাবেচা লাভলোকসান নিয়ে মাথা ঘামাবে তার মালিক। আপনি নন। যে মালিক আপনার ভাত কাপড় যোগাচ্ছে, তার ট্রেড্ সিক্রেট বাইরে প্রকাশ কবার সাহস এল কোত্থেকে?

রাগারাগি করে লাভ হবে না। তাই একটু নরম স্বরে বললাম : কোম্পানীর ক্ষতি হতে পারে—এমন কোন কথা আমরা বলিনি।

কৃপাল সিং তাঁর এটাচি কেস থেকে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ বার করে উষ্মার সঙ্গে বললেন : আপনারা দিল্লীতে কার কাছে কি বলেছেন সব আমি জানতে পেরেছি। এই তার রিপোর্ট। মিথ্যে কথা বলে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করবেন না।

আমি স্তব্ধ বিস্ময় হতবাক হয়ে রইলাম। কৃপাল সিং কয়েকজন মন্ত্রীকে পকেটে পুরে রেখেছেন বলে যে গুজব রটেছিল, সেটা তো গুজব নয়, সত্যি ঘটনা। নইলে মন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের কি কথা হয়েছে না হয়েছে, সে রিপোর্ট ওঁর হস্তগত হল কি করে?

: মিথ্যা কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।—আমি রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম।

: তাহলে একথা সত্যি যে, আপনারা মিস্টার জালান এবং আমার নামে বিভিন্ন মহলে গিয়ে অনেক কুৎসা করে এসেছেন?

: কুৎসা কিছু করিনি। যা সত্যি কথা তাই বলেছি।

: সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে মিস্টার জালান চোর আর আমি শয়তান—এই তো?—রাগে কৃপাল সিংয়ের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল।

: আজ্ঞে না—আমরা বলেছি, আমাদের কোম্পানী একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতির স্বার্থের দিকে নজর রেখে সেটা চালানো উচিত।

: জাতির স্বার্থ কি আপনার বাপের সম্পত্তি যে, আপনি ছাড়া আর কেউ তার ভালমন্দ বুঝতে পারবে না ?—কঠিন বিদ্রূপের সুরে বললেন কৃপাল সিং।

: আজ্ঞে না, ওটা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।—আমিও উষ্মা প্রকাশ না করে পারলাম না।

: তাহলে আপনি জাতির স্বার্থ দেখবার জন্য হঠাৎ এত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কেন ?

: ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুই করিনি। ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়নের প্রতিনিধি হয়ে আমরা দিল্লী গিয়েছিলাম।

: আই সি।—আবার ব্যঙ্গ করলেন কৃপাল সিং : এখন আপনাকে যদি আনুগত্যহীনতার অপরাধে বরখাস্ত করা হয় ?

: করতে পারেন।—নিস্পৃহভাবে বললাম আমি : তবে তার ফলটা খুব ভাল হবে না।

: কি বললেন, কি বললেন।—কৃপাল সিং উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন : অবষ্টিনেট, ইল ম্যানার্ড—হাউ ডেয়ার ইউ থ্রেটেন মি ? তোমার মত বহু লেবার এজিটেটারকে আমি তুড়ি দিয়ে শায়েস্তা করেছি। আমার নাম কৃপাল সিং—গেট আউট—বি অফ আই সে। আই ডোণ্ট লাইক টু সি. ইওর ফেস—গেট আউট—।

কৃপাল সিং কাঁপতে কাঁপতে হাত তুলে আমায় দরজা দেখিয়ে দিলেন।

আমি বললাম : মিস্টার কৃপাল সিং, আমার সঙ্গে আপনি যে ব্যবহারটা করলেন সেটা ভদ্রতাসম্মত নয়। আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। এখানে কোন লোকের উপর যদি কোন অবিচার হয়, তার পরিণাম আপনাদের ভুগতে হবে। আপনাকে আমি পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি, আমাকে বরখাস্ত করুন। আমার মত অনেক লেবার এজিটেটারকে আপনি যদি তুড়ি দিয়ে শায়েস্তা করে থাকেন, তাহলে আমাকেও তুড়ি দিয়ে দেখুন কে শায়েস্তা হয়।

কৃপাল সিং কোন কথা না বলে উত্তেজিতভাবে ঘণ্টি টিপতে লাগলেন। খুব সম্ভব আমাকে উনি দারোয়ান দিয়ে ঘরের বাইরে পাঠাতে চান। তার প্রয়োজন হল না। আমি নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাগে আমার শরীর কাঁপছে। ইচ্ছে করছিল, চেয়ার তুলে কৃপাল সিংএর মাথায় বসিয়ে দিই। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। জীবনের পদে পদে অনেক লাঞ্ছনা

সহ্য করতে হয়েছে। সে সহনশীলতা আমার আছে। কিন্তু কৃপাল সিং মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। অনেক কথা ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতে হল।

বাইরে বেরিয়ে দেখি কারখানার সমস্ত লোক এসে সেখানে ভীড় করেছেন। ঘনশ্যামের ঘরে আমার ডাক পড়ায় সকলেই আশঙ্কা করছিলেন, ইউনিয়নের কোন ব্যাপার নিয়েই ঘনশ্যাম কথা বলবেন। তাই তারা আমাদের সাক্ষাৎকারের ফলাফল জানবার জন্য উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। কৃপাল সিংএর সঙ্গে আমার উত্তেজিত কথা কাটাকাটি শুনে সকলেরই মুখ শুকিয়ে যায়। বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমায় ঘিরে ধরলেন। আমি মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বললাম: আপনারা যে যার কাজে চলে যান। বিশেষ কিছু হয়নি। কারখানার ছুটির পর ইউনিয়নের অফিসে এলে সব শুনতে পাবেন।

: শালা অত চেঁচাচ্ছিল কেন বলতে পারেন?—চাপা গলায় প্রশ্ন করল একজন।

: গলায় জোর আছে তাই চেঁচায়। আপনারা আর এখানে দাঁড়াবেন না। যে যার কাজে চলে যান। যা শোনবার বিকেলে শুনবেন।

তাদের এড়িয়ে আমি ইউনিয়নের সেক্রেটারী আর প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম। একটু বাদে শুনলাম, আমার সঙ্গে আর যে দুজন দিল্লী গিয়েছিল, তাদেরও ডাক পড়েছে জালানের ঘরে কিন্তু আজ তারা দুজনই কারখানায় অনুপস্থিত বলে সে ডাকে সাড়া দিতে পারেনি।

সমস্ত ব্যাপারটা যে বেশ একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। আজ যা ঘটেছে তা ঝড়ের পূর্বাভাষ। অদুর ভবিষ্যতে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। জালানের সামনে কৃপাল সিংএর সঙ্গে যে কথা কাটাকাটি এবং চ্যালেঞ্জ ছোড়াছুড়ি হয়েছে তাতে ওঁরা নিশ্চয়ই খুব অপমানবোধ করেছেন। সে অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। মান-অপমান বোধটা মালিকদের একচেটে। তাঁরা শ্রমিকদের যথেচ্ছ অপমান করতে পারেন। কিন্তু তার উপযুক্ত জবাব শুনলে মনে করেন, জবাব দিয়ে তাঁদের অপমান করা হয়েছে।

ছুটির পর কারখানার বহু লোক এসে জমল ইউনিয়ন অফিসের সামনে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী সিরাজুদ্দীন সাহেব তাদের কাছে সমস্ত ঘটনা

বর্ণনা করে আসন্ন আঘাতের বিরুদ্ধে সকলকে তৈরি থাকবার আহ্বান জানালেন।

পরে ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক জরুরী বৈঠকে ঠিক হল যে কৃপাল সিংএর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইউনিয়নের তরফ থেকে ঘনশ্যাম জালানের কাছে একটা চিঠি দেওয়া হবে।

পরদিন কারখানায় দারুণ উত্তেজনা। ওয়ার্কশপ আর ওয়ার্কশপের বাইরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই গতকালের ঘটনাবলী আলোচনা করছে। সকলেরই লক্ষ্য আমার দিকে। সকলেই আমার সঙ্গে কথা বলতে এবং আমার কাছ থেকে আসল ঘটনা জানতে চায়। কেউ সিগারেট এগিয়ে দেয়, কেউ চা-বিস্কুট। গতকাল আমি যেন একটা ভয়ানক বীরত্বের কাজ করে ফেলেছি। সকলের বাহবা পেয়ে আমি নিজেও বেশ গর্ব এবং উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। কৃপাল সিংকে আমি যে মুখের মত জবাব দিতে পেরেছি, সে তো আমার নিজের জবাব নয়, কারখানার সমস্ত শ্রমিকের জবাব। কারখানার সবাই যে সে কথা উপলব্ধি করেছে, সেইটাই আমার বড় আনন্দ।

বিলেতে চাকরির দরখাস্ত করার পর থেকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের চাকরির উপর আমার মোহ কমে আসছিল। কৃপাল সিংএর সঙ্গে ওভাবে কথা কাটাকাটি না হলে আমি হয়তো কারখানার সমস্ত আন্দোলন থেকে আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াতাম। কিন্তু একদিকে কৃপাল সিং তাঁর অশোভন আচরণে মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে শ্রমিকদের কাছে আমি ইউনিয়নের শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছি। এখন এ সব গিঁট ছাড়িয়ে বেরুনো খুব মুস্কিল হবে।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জালানের কাছে একটা প্রতিবাদ পত্র পাঠাবার কথা হয়েছিল কিন্তু সেটা পাঠাবার আগেই টিফিনের মুখে আমরা তিনজন চার্জ শিট পেয়ে গেলাম। ঢনঢনিয়ার সই-করা সেই অভিযোগপত্রের মোটামুটি বক্তব্য একই। দিল্লীতে গিয়ে আমরা কোম্পানীর গোপন কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করেছি। মালিকের বিরুদ্ধে কুৎসা করেছি ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের কেন অবিলম্বে কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হবে না, তার কারণ দর্শানো হোক। আমার অভিযোগপত্রে একটি বাড়তি অভিযোগ আছে। সেটা হচ্ছে, খোদ মালিকের সামনে আমি কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করেছি।

সাতদিনের মধ্যে চার্জ শিটের জবাব দেবার কথা। ইউনিয়নের বিশেষ মিটিংএ সবাই মিলে জবাবের খসড়া তৈরি করা হল। আমরা যে কোম্পানীর গোপন খবর বাইরে প্রকাশ করেছি—এ অভিযোগটা সরাসরি অস্বীকার করে বলা হল যে, আমরা আমাদের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই সূত্রে কোম্পানীর আভ্যন্তরীন ঘটনাবলীও কিছু বলতে হয়েছে। তাতে কোম্পানীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। বিশেষ করে গভর্নমেণ্ট যখন কোম্পানীর শত্রু নন, তখন এ প্রশ্ন আসছে কি করে? আমরা মনে করি, শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার ট্রেড ইউনিয়নের আছে এবং সে অধিকার ত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত নই।

কৃপাল সিংএর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটির বিষয় নিয়ে লেখা হল যে, সমস্ত ঘটনাটা স্বয়ং ঘনশ্যাম জালানের সামনেই ঘটেছে। কাজেই তিনি নিশ্চয়ই জানেন, কৃপাল সিং আগে আমাকে অনেক অপমানজনক কথা বলায় আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে প্রবৃত্ত হই। এ ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব না করে অপর পক্ষের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেই শোভন হত।

সাতদিনের মাথায় জবাবগুলো যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর কি হবে তা আমাদের জানা আছে। জালান সাহেব আমাদের উত্তর সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করবেন না। তখন আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। শাস্তিটা চরম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ আমরা তিনজন ছাঁটাই নোটিশ পাব। আমাদের ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর থেকে মালিকের সঙ্গে ইউনিয়নের ছোটখাট সংঘর্ষ প্রায়ই হয়ে থাকে। তাতে কখনও মালিক জেতে কখনও শ্রমিক। কিন্তু আমাদের তিনজনকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ পাকিয়ে উঠেছে, তার পরিণাম যে চরম বোঝাপড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউনিয়নের প্রতিনিধি হয়ে ইউনিয়নের কাজ করতে গিয়ে আমরা যদি ছাঁটাই হই, তাহলে সে ইউনিয়নের উপর শ্রমিকদের আর কোন আস্থা থাকবে না। মালিক তখন বেপরোয়া আঘাত করতে করতে প্রথমে ইউনিয়ন পরে শ্রমিকদের শেষ করে দেবে। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই ঘনশ্যামের এই চ্যালেঞ্জ ইউনিয়নকে গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের শাস্তি হওয়া মানেই ইউনিয়নের শাস্তি হওয়া। তার বিরুদ্ধে ইউনিয়নের লড়াই না করে উপায় নেই। আমরা সভাসমিতি বৈঠক ইত্যাদি করে প্রস্তুত হতে লাগলাম। কারখানায় শ্রমিকদের যে সমস্ত স্থায়ী অভাবঅভিযোগ ছিল সেগুলো আরও ভালভাবে প্রচার হতে লাগল। লড়াই যদি বড় রকমের হয়, তাহলে বিরোধটাকেও সর্বব্যাপী করে নেওয়া দরকার। চাকরির শর্ত, মাইনের হার, বোনাস, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারটাইম ইত্যাদি যে কটি বিষয় নিয়ে বহুকাল ধরে জালানের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলছিল, সেগুলো আবার সামনে তুলে ধরলাম। কারখানায় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

এই সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীতে আমি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে মনে আর অন্য কোন চিন্তার স্থান ছিল না। একমাত্র রাত্রে শুয়ে ঘুমোবার আগে ছাড়া অনুরাধা অথবা বিলেতে চাকরি করতে যাওয়ার মত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আমার মনে পড়ত না। কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, অনুরাধারা লম্বা ছুটিতে পুরী গেছে, কলকাতায় ফেরার কোন তাড়া তাদের নেই এবং তাদের ফিরতে অনেক দেরি। কিন্তু তারা যে কতদিন পুরীতে গেছে সেটা কখনও হিসাব করে দেখিনি। চার্জশীটের জবাব দেবার দিন চারেক বাদে একদিন আফিস থেকে ফেরার পথে রাত প্রায় নটার সময় হঠাৎ চৌরঙ্গীতে অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আরও তিন চারটি মেয়ে রয়েছে তার দলে। সকলেরই খুব হাই স্পিরিট। নিজেদের মধ্যে কিছু একটা হাসির গল্প নিয়ে তারা পথ হাঁটছে। সাজপ্রসাধনে সকলেই সুসজ্জিত। অনেকদিন বাদে চোখের উপর অনুরাধাকে দেখে তাকে আহ্বান না করে পারলাম না।

: অনুরাধা—

অনুরাধা তো পেছু ফিরলই, সেই সঙ্গে অন্য মেয়েরাও।

: আ-হা-অশোকবাবু।—দল ছেড়ে ফুটপাথের কিনারায় এসে লোহার রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল অনুরাধা। অন্য মেয়েরা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শো উইণ্ডো দেখতে লাগল।

: কি খবর অশোকবাবু, আপনি কলকাতায় আছেন?

: হ্যাঁ, আছি বই কি। তোমরাই বরং ছিলে না।

: আমরা ফিরে এসেছি আজ চার পাঁচ দিন হল। রোজই ভাবি আপনি

আসবেন। আপনি আসেন না। বাসায় গিয়ে দেখলাম ঘরে তালা মারা। তাই ভেবেছিলাম, রাজধানী থেকে আপনি এখনও ফেরেন নি।

: না, আমি অনেকদিন আগেই ফিরে এসেছি। পুরীতে তোমার স্বাস্থ্যটা ইমপ্রুভ করেছে দেখছি, তবে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে গেছে।

অনুরাধা সলজ্জভাবে নিজের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল: অর্থাৎ কালো আর মোটা হয়েছি—এইতো ?

: কি হয়েছ তা বললে বন্ধুদের কাছে লজ্জায় পড়বে। তোমার মায়ের শরীর কেমন ?

: খুব ভাল। সমুদ্রে স্নান আর বালিতে ছুটোছুটি করে তাঁর সমস্ত আধি-ব্যাধির গ্লানি কেটে গেছে। আপনি দেখলে বুঝতেই পারবেন না যে কয়েকমাস আগে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না।

: দ্যাট্‌স্ ভেরি নাইস। তোমরা এখন কোথায় গিয়েছিলে ?

: ছবি দেখতে। পরীক্ষার পর বেকার হয়ে গেছি কি-না। তাই এই ভাবে সময় কাটাচ্ছি। আপনি আজকাল আসেন না কেন অশোকবাবু ?

আমি বললাম: তোমার মত আমিও শিগ্‌গির বেকার হচ্ছি।

: কি রকম ?

: বোধ হয় এই সপ্তাহে ছাঁটাই নোটিশ পাব।

: সে বেশ ভালই হবে। দুজনে একসঙ্গে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানো যাবে।—আমি হাসলাম। পরক্ষণেই সে জিজ্ঞাসা করল: সত্যিই ছাঁটাই হবেন নাকি ?

: হ্যাঁ, সত্যি। কারখানায় গোলমাল চলছে বলে তোমাদের বাড়ি যেতে পারিনি। আট-দশ দিনের মধ্যে যা হয় কিছু একটা হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার বন্ধুরা অধৈর্য হয়ে উঠছে।

অনুরাধা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলল: ওদের চলে যেতে বলব ?

: কেন ?

: আপনার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।

: ওরে বাবা, তাহলে ওরা তোমার উপর চটে গিয়ে যাতা রটাতে শুরু করবে।

: তা বটে।—অনুরাধা হেসে ফেলল।

: তুমি বরং যাও। ওরা সকলেই আড় চোখে কটমট করে তাকাচ্ছে। আমি সময় পেলেই তোমাদের বাসায় যাব। মাকে বলে দিও।

: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। মা আপনার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর…আর…আর…মানে আমার স্বাস্থ্য ইমপ্রুভ করেছে ঠিকই কিন্তু আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন অশোকবাবু। শরীরের দিকে একটু নজর দেবেন। আসি। কেমন?

শেষ কথাগুলো এত নীচু গলায় উচ্চারণ করল যে, আমি তার স্বরে কেমন একটা নেশায় আবিষ্ট হয়ে গেলাম। চৌরঙ্গীতে বহুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাফেরা করে শেষে বাসায় ফিরে এলাম অনেক রাতে।

অনুরাধাকে দেখলে একটা পলায়নের মোহ আমাকে হাতছানি দেয়। মন এমন একটা নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির পরিবেশ খোঁজে যার সঙ্গে কারখানার নিত্য কলহ যেন কিছুতেই খাপ খায় না। তখন আমি হঠাৎ ভীষণ সংশয়বাদী হয়ে উঠি। চাকরি, কারখানা, ইউনিয়ন, লেখা কিছুই আর ভাল লাগে না। মনে হয় পৃথিবীতে আমি আর অনুরাধা ছাড়া আর সবই অবান্তর এবং অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে তো পাগলের চিন্তা।

জালান এবং কৃপাল সিংয়ের ক্রোধ কিন্তু রূঢ় বাস্তব। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা তিনজন যথারীতি ছাঁটাই নোটিশ পেয়ে গেলাম। জালান সাহেব চার্জশীটের জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে পয়লা জুন আমাদের কারখানা থেকে বিদায় নিতে বলেছেন। নোটিশ পিরিয়ডের মাইনে, গ্রাচুইটি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং অন্য সমস্ত পাওনার হিসাব ঐ তারিখে চুকিয়ে দেওয়া হবে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত নয়। তবু ছাঁটাই নোটিশ সই করবার সময় বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। সাত বছর ধরে যে কারখানায় কাজ করছি তার সঙ্গে রাতারাতি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ভাবতে একটু কষ্ট হয় বই কি। অবশ্য ছাঁটাই নোটিশ পেয়েছি বলেই যে ছাঁটাই হবে তার কোন মানে নেই। ইউনিয়ন লড়াই করে এই নোটিশ প্রত্যাহার করাতে পারে। কিন্তু নাও তো পারে। মোটামুটিভাবে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের পেছনে রয়েছে সত্যি তবে ঢনঢনিয়ার দলেও তো কিছু লোক আছে। আমরা নোটিশ পাবার পর অন্য সকলের মনে যথেষ্ট ভয় ঢুকবে। তখন তারা ইউনিয়নকে এড়িয়ে চলতে

পারে। কে জানে, হয়তো আমাদের এতদিনের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবে। মালিক চরম আঘাত হেনেছে। সে আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া যাবে কি-না, তা আগে থেকে কিছু বলা যায় না। মালিক-শ্রমিক বিরোধে হার জিত দুপক্ষেরই হয়। এবার কারা জিতবে কে বলতে পারে?

ইউনিয়নের সেক্রেটারী সিরাজুদ্দীন সাহেব সেইদিনই চনচনিয়ার সঙ্গে দেখা করে ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানালেন। চনচনিয়া বললেন, নোটিশ এসেছে উপরওলার কাছ থেকে। কাজেই তাঁর কিছু করবার নেই। জালান সেদিন কারখানায় আসেন নি। সিরাজুদ্দীন তাঁকে গিয়ে ধরলেন হেড অফিসে। কিন্তু কোন লাভ হল না। জালান সাহেব রাগে টং হয়ে আছেন। আমরা নাকি গভর্নমেণ্টের কাছে তাঁর ইজ্জত ঢিলে করে দিয়েছি। সুতরাং তিনি আমাদের তিনজনকে কিছুতেই ফিরিয়ে নেবেন না এবং ইউনিয়নের আরও কিছু "পাণ্ডা"কে আমাদের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করবেন। সিরাজুদ্দীন ঠাণ্ডা মানুষ। ভাল মুখে অনুনয়ের স্বরে কথা বলেছিলেন। জালানের কথাবার্তার ধরন দেখে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, আলাপ-আলোচনায় কোন ফল হবে না।

সন্ধ্যায় ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় স্থির হল যে, ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী কাল সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত টুল ডাউন স্ট্রাইক চলবে। তাতেও দাবি আদায় না হলে শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক।

পরদিন টুল ডাউন স্ট্রাইক পুরোপুরি সফল হল কিন্তু দাবি আদায় হল না। জালান নামবার বদলে আরও চড়লেন। একদিন বাদে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের বাছাবাছা কয়েকজন ইউনিয়ন কর্মীর উপর কাজে অবহেলার অভিযোগে চার্জশীট পড়ল।

বেশ বোঝা গেল, জালান এবার আটঘাট বেঁধে নেমেছেন। শেষ না দেখে ছাড়বেন না। তাতে আমরা একটা উভয়-সঙ্কটের মধ্যে পড়লাম। শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র হচ্ছে স্ট্রাইক। ঘনশ্যাম জালান আমাদের ঠেলতে ঠেলতে সেখানেই নিয়ে এসেছেন। আমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি আছি কিন্তু শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি আমাদের আছে কি-না সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত নই। অথচ পেছু হটবার উপায়ও নেই। লড়াইয়ের পথে অতদূর এগোবার পর হঠাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে ইউনিয়নের মান-সম্মান একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে যাবে এবং সেই অধঃপতন থেকে উপরে উঠতে পাঁচ বছরের কম লাগবে না।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে আমরা চরম সিদ্ধান্ত নিতেই বাধ্য হলাম। আলাপ-আলোচনার পথ যখন জালান বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন এ ছাড়া আর গত্যন্তর কি? এতদিনের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং ছাঁটাই নোটিশ আর চার্জশীট প্রত্যাহারের দাবি করে কোম্পানীর কাছে চরমপত্র দেওয়া হল। সাত দিনের মধ্যে কোন সদুত্তর না পাওয়া গেলে জুনের সাত তারিখ থেকে ধর্মঘট।

সময় বেশি নেই। এরই মধ্যে কারখানার প্রতিটি লোককে সংগ্রামমুখী করে তুলতে হবে। ইউনিয়নের তরফ থেকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোক নিয়ে একটা সংগ্রাম কমিটি তৈরি করা হল। তাঁরা ধর্মঘটের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। আমরা সারাদিন কারখানায় এবং সন্ধ্যায় শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়ে ধর্মঘটের প্রচার চালাতে লাগলাম।

একটা একটা করে যতই দিন কাটতে লাগল ততই কারখানায় উত্তেজনা বাড়তে লাগল। কখনও ভয়, কখনও সাহস, কখনও গুজব। ঢনঢনিয়ার দলের লোকেরা নানা রকম দুঃসংবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে আসর ঢিলে করবার চেষ্টা করতে চাইল, ইউনিয়নের লোকেরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তাদের স্তব্ধ করে দিল। এরই মধ্যে হঠাৎ রটল, ধর্মঘট হলে জালান লক আউট ঘোষণা করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা বন্ধ রাখবেন। তারপর কয়েকমাস বাদে সম্পূর্ণ নতুন লোক সংগ্রহ করে তাদের দিয়ে কারখানা চালু করা হবে। অর্থাৎ এখন যারা কারখানায় চাকরি করছেন, তাঁরা কেউ আর কারখানায় থাকতে পারবেন না। গুজবে সবাই বেশ মুশড়ে পড়েছিল কিন্তু আমরা তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে, এই ধরনের উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা একেবারে আনকোরা নতুন লোক দিয়ে চালানো যায় না। তাহলে কারখানা চালু হতেই দুবছর লেগে যাবে। কারখানায় এখন যে সব অর্ডার আছে, সেগুলো দুবছর বাদে সরবরাহ করা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে জালান দেউলে হয়ে যাবেন। কাজেই অত ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া লক আউট হলে আমরা তো চুপচাপ বসে থাকব না। তার বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম চলবে।

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অনেকে আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত জালান সাহেব একটু নেমে ইউনিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন, কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না। শুধু দেখা গেল, যতই দিন এগুচ্ছে, ততই কারখানায় দারওয়ানের সংখ্যা বাড়ছে। জালান তাঁর সম্পত্তি পাহারা

দেবার ব্যবস্থা জোরদার করছেন। ক্রমে কারখানার গেটে গেটে সশস্ত্র পুলিস পাহারা বসল। একদিকে জালানের নীরবতা, অপর দিকে কঠোর নিরাপত্তার আয়োজন দেখে বেশ বোঝা গেল, ধর্মঘট কিছুতেই এড়ানো যাবে না। সেটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মনও ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সমস্ত ব্যাপারটা এখন চলে গেল তাদের দায়িত্বের মধ্যে।

অবশ্য টনটনিয়ার দলেও কিছু লোক আছে এবং নিরপেক্ষ নৈরাশ্যবাদীর সংখ্যাও কিছু কম নয়, কিন্তু ধর্মঘটের অনুকূলে এমন বিরাট সংখ্যাধিক্য যে তারা আমাদের পেছু টানতে পারবে না।

জুন মসের দুতারিখে ইউনিয়নের এক সাধারণ সভায় সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে ধর্মঘট সফল হবে।

সেদিন রাত প্রায় দশটার সময় বাসায় ফিরে দেখলাম, লেটার বক্সে একটা লম্বা খাম পড়ে আছে। হাঁ, এতদিনে এসেছে বিলেতের চিঠি! উত্তেজনায় আমি লাফিয়ে উঠলাম। শশী ইজ গুড, শশী ইজ গ্রেট, শশী ইজ গ্রেসাস। পাওয়ার প্ল্যান্ট আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে কণ্ট্রাক্ট ফর্ম পাঠিয়েছে। শশী যে সব শর্ত পেয়েছিল, সেই সব শর্তেই তারা আমায় চাকরি দিতে প্রস্তুত। কণ্ট্রাক্ট ফর্ম সই করে ফেরত পাঠালে তারা আমাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। চিঠিটা আমি বারবার করে পড়তে লাগলাম আর আমার মনের মধ্যে একটা গুণগত রূপান্তর ঘটতে লাগল। পয়লা জুন থেকে আমি আর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিংএর চাকরিতে নেই। কারণ আমার ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহৃত হয়নি। লড়াইয়ের উত্তেজনায় সেই সত্য ভুলে আছি। কিন্তু লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষ জয়ী হবে, তা আগে থেকে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। আমাদের পরাজয় ঘটলে ভবিষ্যৎ বেশ একটু অন্ধকারময় কিন্তু বিলেতের এই চিঠি সেই অন্ধকার ভেদ করে আমার চোখের নতুন সূর্যের আলো ফেলেছে। আমি আর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরির প্রত্যাশী নই। ছাঁটাই না হলে শশীর মত পদত্যাগ করে আমাকে কোম্পানী ছাড়তে হত। বিলেতের চিঠি বেকার দশার আশঙ্কা থেকে তো আমাকে মুক্তি দিয়েছেই, সেই সঙ্গে আমার যৌবনের একান্ত কামনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথটাও প্রশস্ত করেছে। এতদিনে অনুরাধা সত্যি করে আমার হল। আমাদের আমরণ বন্ধনের ছাড়পত্র পাওয়ার

প্ল্যাণ্ট কোম্পানীর এই নিয়োগপত্রখানা। এখন আমি সাহস এবং আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিতে পারি, ঠোঁটে চুমু দিয়ে আদর করতে পারি, তার কবোষ্ণ দেহের আলিঙ্গনে চিদানন্দের আবেশ অনুভব করতে পারি। কারণ সে হল একান্ত করে আমার। তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেহের যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য এবং মধু আছে সব আমার। আমি রক্ত মাংসের মানুষ। আমার প্রেম যে চণ্ডীদাসের মত শুধু প্রণয়ীর আত্মিক সঙ্গ কামনা নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। অনুরাধার চুলের অরণ্য, আঁখির বিচিত্র উজ্জ্বলতা, অধরের রক্তিম পুষ্টতা, গ্রীবার মসৃণ সঞ্চালন, বাহুর সুডৌল সুষমা, আঙুলের প্রশান্ত কোমলতা, ছন্দিত বুকের নীচে কটিদেশের সূক্ষ্ম নমনীয়তা, পায়ের পাতার লীলায়িত শ্যামশ্রী, পদক্ষেপের সুঠাম ভঙ্গি সবই আমার—আমার—আমার। প্রকৃতি তার সমস্ত রূপরসগন্ধ উজাড় করে অনুরাধাকে সৃষ্টি করেছে শুধু আমার জন্য।

অনুরাধাকে আমি দীর্ঘকাল ধরে কামনা করে আসছি। কিন্তু তার দেহকে কেন্দ্র করে মনের বাসনাগুলো এর আগে কখনও এমন উদগ্র হয়ে ওঠে নি। তারা মনের মধ্যে আধা-সুপ্তির জড়তায় নীরব হয়ে ছিল। আজ বিলেতের চিঠি যেন দুরন্ত নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। তার ভালবাসা, তার হৃদয়ের মাধুর্য, তার আত্মার সৌন্দর্য সবই যেন অর্থহীন, অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক। একমাত্র সত্য এবং সুন্দর হচ্ছে অনুরাধার ছফুট দীর্ঘ কোমল সুষম তনুলতা। আর সব মিথ্যা ভ্রান্তি প্রবঞ্চনা।

জানি না কতক্ষণ আমি তার দেহের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম।

দেওয়ালে ঘড়ির ঘণ্টা শুনে চেতনা ফিরে পেলাম।

এখন আমার কর্তব্য কি ? যে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি, সে চাকরিতে আর আমার প্রয়োজন নেই। তাহলে কি আমি আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে কারখানার সমস্ত ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াব ? মন্দ কি ? ধর্মঘটের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় মন বড় পরিশ্রান্ত। তা থেকে মুক্তি লাভ করলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব। ধর্মঘটের সঙ্গে আমার নিজের স্বার্থ যখন আর জড়িয়ে নেই, তখন আমি কেন দুনিয়ার মানুষের ঝামেলা মাথায় নিয়ে স্বেচ্ছায় বিপর্যস্ত হই ?

কিন্তু যতই ভাবতে লাগলাম, ততই নিজের এই স্বার্থপর এবং সুবিধাবাদী চিন্তার জন্য নিজেরই লজ্জা হতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে আমার ছাঁটাইকে কেন্দ্র

করেই আজ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে ধর্মঘট আসন্ন হয়ে উঠেছে। কারখানার অন্য শ্রমিকরা যদি আমার মত স্বার্থ চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বলত, "অশোকবাবু ছাঁটাই হয়েছেন, সেটা তার নিজের ব্যাপার। কোম্পানীর সঙ্গে একা লড়াই করে তিনি ছাঁটাই রদ করুন" ? তাহলে ? সমস্ত শ্রমিক পেছনে আছে না জানলে কৃপাল সিংয়ের অপমানের কি প্রত্যুত্তর দিতাম আমি ? না, না না, এভাবে ট্রেড ইউনিয়ন চলে না। আমাকে বাঁচাবার জন্য অনেক ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সকলে এগিয়ে এসেছে। নিজের সুবিধা বুঝে আমি এখন তাদের ত্যাগ করব ? এ তো মানুষের কাজ নয়। আমি তা করতে পারি না। ধর্মঘট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিলেতে চাকরি পাওয়ার কথা গোপন রাখতে হবে। নইলে শ্রমিকদের মনে নানা রকম বিরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। তাদের স্থৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। চাকরির প্রতি আমার মোহ না থাকলেও চাকরি ফিরে পাবার লড়াইয়ে আমি সব রকমে জড়িয়ে থাকব। কোথাও এতটুকু ঢিলে দিলে চলবে না। এ লড়াই আমার নয়। এ লড়াই মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের। জয়ই হোক আর পরাজয়ই হোক, আমি আমার ভূমিকা ত্যাগ করে নিজেদের শক্তিহানি ঘটাতে পারি না। হ্যাঁ, গোপনই থাকবে এই চাকরি পাবার কথা।

কিন্তু সকলের কাছে গোপন রাখা চলবে না। অনুরাধাকে বিয়ে করে বিলেতে নিয়ে যেতে হলে সব কথা অবিলম্বেই তার কাছে খুলে বলা দরকার। বিলেত পুরী অথবা দিল্লী নয় যে যখন খুশি গেলেই হল। বিলেত যাবার প্রস্তুতি মস্ত প্রশ্ন। তাতে সময় লাগে। অনুরাধা মন স্থির করবে, মায়ের অনুমতি নেবে, পোশাকপরিচ্ছদ বানাবে, পাসপোর্ট ভিসা যোগাড় করবে— আরও অনেক কিছু করবার আছে। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সুতরাং আর দেরি নয়।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্থির করে ফেললাম, কালই অনুরাধার সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট করে বিয়ের প্রস্তাব করব। দেরি হলে ধর্মঘট শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ ধর্মঘট শুরু হলে অন্য কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর ধর্মঘট একবার শুরু হলে কবে গিয়ে যে শেষ হবে তাও কেউ বলতে পারে না। আমার এখন কারখানায় চাকরি নেই। তবু সকলের মনোবল ঠিক রাখবার জন্য যথাসময়ে কারখানায় যেতে হচ্ছে। ইচ্ছে করলে তুই একদিন সকালের দিকে না গেলে তেমন ক্ষতি হবে না।

সকালে সিরাজুদ্দীনের বাসায় গিয়ে কালকের দিনের জন্য পুরো ছুটি চেয়ে নেব। ফেরার পথে অনুরাধার সঙ্গে একটা এপয়েণ্টমেণ্ট করে আসব। বেলুড়, বোটানিক্স্, ডায়মণ্ডহারবার কোথাও একটা গেলেই হবে। সেখানে আমি তাকে আমার মনের কথা খুলে বলব। ব্যাস, এই ঠিক রইল।

ভোরবেলায় উঠে পয়লা বাসে সিরাজুদ্দীনের বাসায় চলে গেলাম। তিনি আমায় একদিনের ছুটি দিতে রাজী হলেন।

সেখান থেকে সকাল সওয়া সাতটায় আমি এলাম অনুরাধাদের বাসায়। মিসেস সরকার কোমরে আঁচল বেঁধে ঝুল-ঝাড়া দিয়ে বাইরের ঘরের দেওয়াল সাফ করছিলেন। আমায় দেখে সেটা বন্ধ রেখে বললেন: এস অশোক, অনেকদিন তোমায় দেখিনি। ভাল আছ তো?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।—সত্যিই ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য একেবারে ফিরে গেছে। তাঁকে তরুণী মহিলার মত কর্মক্ষম দেখাচ্ছে। মেয়ে যে মায়ের রক্তমাংস নিয়ে সৃষ্টি তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অনুরাধা রান্নাঘরে চা তৈরি করছিল। আমাদের কথা শুনে বেরিয়ে এসে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে প্রশ্ন করল: কি ব্যাপার অশোকবাবু, সকালে এলেন কি করে? কারখানা নেই?

: না।

: সত্যিই ছাঁটাই হয়েছেন নাকি?—চোখ বড় বড় করে কৌতুকের স্বরে জানতে চাইল সে। সদ্য-যৌবনা এবং বিলীয়মান-যৌবনা দুই নারীর চেহারার সামঞ্জস্যে একটা অদ্ভুত রহস্যানুভূতি আমায় আবিষ্ট করে রইল।

: ছাঁটাই?—অনুরাধা আবার প্রশ্ন করল।

বললাম: না ছাঁটাই নয়। এমনই ছুটি নিয়েছি।

: চমৎকার। তাহলে চলুন আজ একটা লম্বা ট্রিপ মারি। দুপুরে শুয়ে শুয়ে মুটিয়ে যেতে বসেছি।

কথাটা সত্যি নয়। মোটা সে মোটেই হয়নি। বরং পুরী থেকে ফেরার পর তার শরীরের গড়নে আরও লাবণ্য ধরা দিয়েছে। লম্বা ট্রিপ? হ্যাঁ, আমিও তাই চাই। কোথাও একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে মনের দুয়ার খুলে দেওয়া।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম: হ্যাঁ, সেই জন্যই তো সকালে এলাম। সেদিন আপনি বললেন, আমি বেকার হলে আমার সঙ্গে টো-টো করে ঘুরবেন। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আজ ছুটি নিয়েছি।

মিসেস সরকার হেসে উঠলেন: টো-টো করে ঘোরার সময়টা ঠিক করেছ ভাল অশোক। আর একটুবাদে রোদ্দুরের তেজে তো ঘরের মধ্যে টেঁকাই মুস্কিল হবে।

: যেখানে ছায়া আছে তেমন কোন জায়গায় গেলেই চলবে।—বলল অনুরাধা: বোটানিকসে চলুন অশোকবাবু। যতক্ষণ সূর্য মাথার উপর থাকবে ততক্ষণ সেই বুড়ো বটগাছের তলায় বসে চীনাবাদাম খাব, তারপর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াব। আজ কোথাও যেতেই হবে। পুরী থেকে ফিরে অবধি বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। দাঁড়ান, আপনাদের চা নিয়ে আসি।—বলেই সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মিসেস সরকার জানালার কাঁচগুলো নেকড়া দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন: তোমরা যেখানে খুশি যেতে পার। এই রোদ্দুরে আমি বাপু বেরুচ্ছি না।

চমৎকার। আমিও চাই না যে উনি আমাদের সঙ্গী হন। জুন মাসের রোদ্দুর আমাদের পরস্পরকে একলা পাওয়ার সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে।

হাসতে হাসতে বললাম: রোদ্দুরকে আপনি ভীষণ ভয় পান?

মিসেস সরকার মুচকি হেসে বললেন: তোমাদের বয়সে বোধ হয় ভয় পেতাম না। রোদ্দুর বৃষ্টিকে ছেলেবেলায় মোটেই গ্রাহ্য করিনি। নইলে অনু অমন হল কোত্থেকে? ছেলেমেয়েরা যে মা-বাবার অনেক ভালমন্দ গুণের অধিকারী হয়। অবশ্য শুধু রোদ্দুরের ভয় নয়, আজ আমার বাড়িতে কাচাকুচির কাজও আছে। বেরুনো মুস্কিল। বেশ তো, আর একদিন না হয় তোমাদের সঙ্গে জুনের রোদ্দুরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো যাবে। ওতে আমার উৎসাহের কোন অভাব নেই।

অনুরাধা চায়ের ট্রে নিয়ে এল এবং চা খেতে খেতে আমরা পুরী এবং দিল্লীর গল্প শেষ করলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, আমি আজ খুব কম কথা বলছি এবং অন্য কোন কথাতেই আমার মন বসছে না।

মিসেস সরকার বললেন: তোমরা বসে গল্প কর। আমি বালিসের ওয়াড়-টোয়াড়গুলো খুলে ফেলি। হ্যাঁ অশোক, তোমার তো আজ ছুটি। তাহলে দুপুরে এখানে খেয়ে তারপর টো-টো করতে বেরুলে হত না?

: হ্যাঁ তাইতো, আজ এখানে খাবেন।—যোগ করল অনুরাধা।

প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করলাম না। কারণ আমাকে এক্ষুণি বাসায় গিয়ে

পাওয়ার প্ল্যান্টের কণ্ট্রাক্ট ফর্ম সই করে এয়ার মেলে বিলেতে পাঠাতে হবে। কাজেই আমি একেবারে খেয়েদেয়ে সেজেগুজে সোজা এখানে আসব।

: কখন আসবেন ?—জিজ্ঞাসা করল অনুরাধা।

: ঠিক একটার সময়।

: থ্যাঙ্কস্।

বাসায় ফিরে চাকরির কাগজপত্র টাইপ এবং সই করে পোস্টঅফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রী করে এলাম। বেলা সাড়ে বারোটায় খাওয়াদাওয়া সেরে আমি বাক্স থেকে ছাই রঙের পানামা ট্রপিকাল স্যুট আর গাঢ় চকোলেট রঙের টাইটা বার করে সযত্নে পরে ফেললাম। বছর চারেক আগে কারখানায় দুমাসের বোনাস পেয়ে 'সৌখীন' সাহেব হবার আগ্রহে নাম-করা দর্জির কাছ থেকে মোটা টাকা খরচ করে এই স্যুটটা বানিয়েছিলাম। পরবার সুযোগ বড় একটা পাইনি। এ স্যুট পরে কারখানায় যাওয়া যায় না আর সামাজিক উৎসবে সাহেব সেজে যেতে আমি লজ্জা পাই। স্বভাবতই স্যুটটা এই কবছর বাক্সেই পড়ে আছে। বন্ধুরা বলে, এই স্যুট পরলে নাকি আমাকে খুব স্মার্ট দেখায়। আমার নিজেরও সেই রকম ধারণা। কাজেই জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিনে সেটা পরবার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না।

বেলা দেড়টার সময় অনুরাধাদের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই অনুরাধার বিস্ময়-দৃষ্টির সামনে আমাকে অপ্রতিভ হতে হল। বিস্ফারিত চোখে সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: কি করেছেন অশোকবাবু! আজ যে একেবারে পুরো সাহেব। কোথাও ইণ্টারভিউ দিয়ে এলেন নাকি ?

লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও কথাটায় আমি কৌতুক বোধ করলাম। এও একরকম ইণ্টারভিউ বই কি। তোমার হৃদয়দুয়ারে ভালবাসার আবেদন নিয়ে দাঁড়াতে এসেছি। আমাকে গ্রহণ করবে কিনা সে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রার্থী তার সাধ্য অনুযায়ী দাতার মনে দাগ কাটবার চেষ্টা করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

অনুরাধা বেরুবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তার সাজ-পোশাক একেবারে চাকচিক্যহীন। চওড়া লালপেড়ে তাঁতের সাড়ি, পাতলা অর্গাণ্ডির ব্লাউস আর স্যাণ্ডেল পরে আছে। স্যাম্পু-করা চুলের রাশি দুভাগে ভাগ করে ডগায় দুটো গিট পাকানো। বাঁ হাতে ঘড়ি আর বাবার দেওয়া সেই আঙটি ছাড়া দেহের কোথাও কোন অলঙ্কার নেই।

কিন্তু শুকনো ফাঁপানো চুল আর ধবধবে পোশাকে তাকে যথেষ্ট স্মার্ট এবং রহস্যময় দেখাচ্ছে।

মিসেস সরকার আমাদের এক গ্লাস করে সরবৎ খাইয়ে বিদায় দিলেন। অনুরাধাকে নিয়ে বাসে করে প্রায় তিনটের সময় গিয়ে পৌঁছলাম বোটানিক্সে। বাসে সে বসেছিল মেয়েদের আসনে। আমি পেছনের আসনে বসে ভাবছিলাম, কিভাবে অনুরাধার কাছে কথাটা প্রকাশ করব। ঠিক কখন বলব এবং কি বলব তার কিছুই আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। আনমনে ভাবতে ভাবতে ক্রমেই আমি নার্ভাস হয়ে উঠছিলাম। বেশ টের পাচ্ছিলাম, আমার হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত অতি দ্রুতগতিতে চলাচল করছে। বাস থেকে নামার পর অনুরাধা আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি যেন আরও নার্ভাস হয়ে গেলাম।

: আপনি বড্ড ঘামছেন অশোকবাবু। শার্টটা ভিজে চুপসে গেছে। টাইটা বরং খুলে ফেলুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি টাইয়ের ফাঁস খুলে ফেললাম।

: ওটা দিন, আমি ভাজ করে ব্যাগে রেখে দিই। পকেটে রাখলে ক্রিজ নষ্ট হয়ে যাবে।

হাত বাড়িয়ে টাইটা দেবার সময় লক্ষ্য করলাম আমার হাতটা কাঁপছে। অনুরাধা টাইটা ভাজ করে সযত্নে তার হাতব্যাগে তুলে রাখল। আমি সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বাললাম। তারপর দুজনে বাগানের ভিতরে ঢুকে ছায়াঘেরা পথ ধরে পাশাপাশি এগোতে লাগলাম।

বন-বীথির সবুজ বিস্তৃতি তাকে বেশ খুশি এবং উচ্ছল করে তুলেছে। যা দেখে তাতেই তার সানন্দ বিস্ময়। কত যে প্রশ্ন তার ইয়ত্তা নেই। বাইরের প্রকৃতির দিকে আমার বিশেষ নজর ছিল না। আমি নিজের মনের ওঠানামা নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়েছিলাম। তাই কথাবার্তায় কোন মতেই সহজ হতে পারছিলাম না। তার বহু প্রশ্নই অনুত্তর থাকছিল অথবা প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল।

: রোদে আপনার শরীর খারাপ হল নাকি ?—ঠাট্টার সুরে বলল অনুরাধা।

: না। সে কথা মনে হচ্ছে কেন ?

: কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছেন দেখছি।

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম : ও তোমার চোখের ভুল।

অনুরাধা কোন মন্তব্য করল না। হাতের রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা আলগোছে মুছে নিতে লাগল। আমি আবার নিজের মনের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হলাম। কোথায় বলি? কখন বলি? কিভাবে বলি? বলার পর যদি অনুরাধা নেতিবাচক উত্তর দেয়, তাহলে আমরা একসঙ্গে বাসায় ফিরব কি করে?

: মাছি—মা—মাছি—মা—মা—ছি—

অনুরাধা একটা বড় পাম গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পেছন থেকে বাচ্চা একটি মেয়ে এসে তার কাপড়ে টান দিয়ে ডাকল : মা-ছি-মা।

অনুরাধা পেছনে ফিরে তাকে দুই হাতে কোলে তুলে নিল।

: মাসীমা! বারে লক্ষী মেয়ে।

ততক্ষণে খুকুর মা-বাবাও ঘটনাস্থলে এসে হাজির।

: কার কোলে উঠেছে বুলু?—খুকুর অতি সুসজ্জিতা মা এগিয়ে গেলেন অনুরাধার সামনে। তাঁর স্বামী তাঁকে অনুসরণ করলেন।

বুলু কার কোলে উঠেছে দেখবার জন্য ছোট্ট দুই হাতে অনুরাধার গলা জড়িয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

: কিছু মনে করবেন না ভাই। পেছন থেকে আপনাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট বোনের মত। শুধু বুলু নয়, তার মা-বাবাও বেশ একটু কনফিউসনে পড়েছিলেন।—বললেন বুলুর মা।

: তাই নাকি?—অনুরাধা হাসতে হাসতে বাচ্চার গালে দুটি চুমু দিল : চমৎকার মেয়ে। আমি ওর মাসী হয়ে গর্ব বোধ করছি।

: সে তো আমাদেরও সৌভাগ্যের কথা—আপনার মত একটি বোন পাওয়া।—মুহূর্তের মধ্যেই ওদের সঙ্গে অনুরাধার একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠল এবং আমরা একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। ভদ্রলোকরা আমাদের সঙ্গে যেভাবে গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করলেন তাতে কিছুটা অবাক হলাম। সাজ-পোশাক এবং চেহারা দেখলে বোঝা যায়, ওঁরা বেশ অবস্থাপন্ন। এই ধরনের লোকেরা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।

একটু বাদে আসল কারণটা পরিষ্কার হল। ভদ্রলোকের নাম অক্ষয় ঘোষ, স্ত্রীর নাম সীমা। যোধপুরে বাস করছেন চার পুরুষ ধরে। সীমার ছোট বোন অসীমাই নাকি পেছন থেকে অনুরাধার মত দেখতে। অসীমা পদার্থ-বিদ্যায় এম-এসসি পাশ করে কলম্বো প্ল্যানের একটা স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায়

গেল আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করতে। অক্ষয়বাবুরা তাকে জাহাজে তুলে দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। মিসেস ঘোষের এই প্রথম কলকাতায় পদার্পণ। তাই অক্ষয়বাবু তাঁকে কলকাতাটা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে ওঁদের কোন আত্মীয়স্বজন নেই। এসে উঠেছেন হোটেলে। স্থানীয় কোন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি বলে মিসেস ঘোষের নাকি মন খুঁতখুঁত করছিল। অনুরাধাকে এমন আকস্মিকভাবে পেয়ে তাই তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

দেখলাম অনুরাধা খুব জমে গেছে ওদের সঙ্গে। আমি কিছুটা অস্বস্তি-বোধ না করে পারলাম না। ওঁরা যদি সারাক্ষণ অনুরাধার সঙ্গে অমনভাবে লেগে থাকেন, তাহলে তাকে নিজের কথা বলার সময় পাব কি করে?

আমার আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হল। অক্ষয়বাবুরা অনুরাধার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাগানটা ঘুরে গঙ্গার ধারে এসে বললেন, এখানে একটু বসা যাক। আমি বরাবরই ওঁদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছিলাম, কারণ আমি জানতাম, মনের যা অবস্থা তাতে গালগল্পে জমা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি না ওঁদের কাছে অনুরাধা আমার কি পরিচয় দিয়েছে। লক্ষ্য করলাম, আমার এই ব্যবধানটা ওঁরা সহজভাবেই মেনে নিয়েছেন। গঙ্গার ধারে ওঁরা গিয়ে বসলেন একটা গাছের তলায়। অনুরাধা বাচ্চার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। আমি ওঁদের থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে একেবারে গঙ্গার কিনারায় গিয়ে বসলাম। অযাচিত অতিথিরা অনুরাধাকে এমন বে-হাত করে নেবেন জানলে ওকে আমি এখানে না এনে অন্য কোথাও নিয়ে যেতাম। মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বেশি নার্ভাস হয়ে গেলে আমার হাত নিশপিশ করে। পকেট থেকে নোট বই আর ফাউন্টেন পেন বার করে একটা স্কেচ আঁকতে শুরু করলাম। এটা আমার বহুকালের অভ্যাস। আঁকাজোকার কাজ করতে হয় বলে হাতে কাগজ কলম পেলেই আমি কিছু একটা এঁকে ফেলি। অন্যমনস্কভাবে কখন যে একটা মেয়ের মুখ এঁকে ফেলেছি তা টের পাইনি। হঠাৎ অনুরাধা এসে ধপ করে বসে পড়ল আমার পাশে। আমি কাগজখানা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলাম।

: দেখি দেখি, কি আঁকছিলেন?—অনুরাধা উচ্ছলভাবে কাগজের উপর থেকে আমার হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি সেটা আরও জোরে চেপে ধরলাম।

অনুরাধা আমার মুখের দিকে সকৌতুকে দৃষ্টিপাত করে বলল: প্লীজ অশোকবাবু।—অগত্যা হাতটা তুলে ধরতে হল।

: কার ছবি আঁকলেন—এযে দেখছি মেয়ের মুখ।

: তোমার।—ঠাট্টার স্বরে বললাম আমি।

অনুরাধা অনেকক্ষণ স্কেচটার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে ঠোঁট উল্টে বলল: আমি এত বিশ্রী দেখতে—

সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানা হাতের মুঠোয় পাকিয়ে ফেললাম।

: ও কি, ও কি, নষ্ট করছেন কেন? আমি দেখতে খারাপ তা আপনি কি করবেন?

কাগজখানা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে দিয়ে নীচু গলায় বললাম: তুমি দেখতে খারাপ? তুমি এত সুন্দর—তোমার মুখের উপর পৃথিবীর সমস্ত আলোর আভা—তুমি অপরূপ।—অনুরাধার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখে মাঝপথেই থেমে যেতে হল। ঠিক সেই সময় বুলু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলের উপর। অনুরাধা তাকে বুকে জড়িয়ে ছুট্টে পালিয়ে গেল গাছের নীচে।

যাবার সময় তার চোখে সরস কটাক্ষ এবং ঠোঁটে হাসির আভা দেখে আমি কিছুটা নির্ভয় হলেও মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। এমন আকস্মিকভাবে কথাটা না বললেই হত। এতক্ষণ অনুরাধা জানত না, তাকে আজ কেন এখানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার বোধ হয় সে আমার উদ্দেশ্যের একটা আঁচ করতে পারবে। ফলে আমাকে একটা সতর্ক মনের সম্মুখীন হতে হবে। প্রণয় নিবেদনের ব্যাপারটাকে সহজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা যেন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। আমি বিমর্ষ বোধ করতে লাগলাম।

: অশোকবাবু।—অনুরাধার আহ্বান। পেছনে তাকিয়ে দেখি, মিসেস ঘোষ তাঁর রেশমী ঝোলা থেকে স্যাণ্ডউইচ আর চকোলেট বার করেছেন। আমাকে তাকাতে দেখে হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ করলেন।

: আসুন, আপনি অমন দূরে দূরে সরে রয়েছেন?

আমি উঠে তাঁদের কাছে গিয়ে বসলাম।

: আজ আমাদের কপালটা খুব ভাল। একজন সাহিত্যিকের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।—বললেন অক্ষয়বাবু। বুঝলাম অনুরাধা এই অপকর্মটি করেছে।

: শুধু দেখাই হল, ভাল করে আলাপ করা হল না।—মিসেস ঘোষ অনুযোগ করলেন।

ঃ সে কি কথা, এই তো হাজির আছি। যত খুশি আলাপ করুন।—আমি স্মার্ট হবার চেষ্টা করলাম ঃ কিন্তু গোড়াতেই ভুল করছেন। আসলে আমি সাহিত্যিক নই। বড় জোর শখের লেখক বলতে পারেন। আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করলে শেষে আপনারাই বিরক্ত হয়ে উঠবেন।

ঃ নিন খুব হয়েছে, অত আর বিনয় প্রকাশ করতে হবে না।—মিসেস ঘোষ নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত কথাটা বলে একটা চকোলেট স্ল্যাব আর একখানা স্যাণ্ডউইচ এগিয়ে দিলেন। অনুরাধা তখন একটু দূরে বাচ্চার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে আমার দিকে সলজ্জ এবং সকৌতুক দৃষ্টিপাত করছে। ঘোষদম্পতি সাহিত্যিক বলে আমায় একটু বিশেষ খাতির করলেও বেশ বুঝতে পারলাম, সাহিত্যে ওঁরা মোটেই আগ্রহশীল নন। সেটা আমার খুব ভাল লাগল। সাহিত্যে আসক্ত লোকের চেয়ে সাহিত্যে নিরাসক্ত লোকদের আমি বেশি পছন্দ করি। কারণ সেখানে আমি অনেকটা অসঙ্কোচ। কলকাতার সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল এবং নাচগানের কথা নিয়ে অনেক্ষণ হাল্কা আলোচনা হল। ওদিকে সূর্যের তেজ যতই কমে আসছিল, আমি ততই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিলাম। তারই মধ্যে হঠাৎ অক্ষয়বাবু স্ত্রীকে কলকাতায় ফেরার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার ট্রিপে সিনেমার টিকিট কাটা আছে।

ঃ হ্যাঁ তাইতো, এবার উঠতে হবে। আপনারাও তো কলকাতায় ফিরবেন অশোকবাবু। চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক

এ প্রস্তাবে আমি যৎপরোনাস্তি বিব্রত বোধ করলাম। অনুরাধা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তাবটা সে গ্রহণ করার আগেই আমাকে ওটা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কাজেই আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবিনয়ে জবাব দিলাম ঃ একসঙ্গে গেলে খুব ভাল হত। কিন্তু আমাদের একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে যে—

অনুরাধা জিজ্ঞাসুভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। বাধ সাধল ছোট্ট মেয়েটা। মাসীকে ছেড়ে সে কিছুতেই মা-বাবার সঙ্গে যাবে না। এমন চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল যে অনুরাধার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে ওঁদের সঙ্গী হবার অনুরোধ জানাতে লাগল। অগত্যা আমরা তাঁদের সঙ্গী হলাম।

মোটরে ফেরবার পথে মনে মনে বদলে নিলাম প্রোগ্রামটা। ঘোষেদের

আত্মীয়তার ফলে আজকের প্ল্যানটা একেবারে মাটি হয়ে গেছে। সেজন্য কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া অনুরাধার শিশু-প্রীতির সংবেদনা প্রত্যেক পর্বেই আমি উপভোগ করছি। শেষ পর্যন্ত যখন বাচ্চাটা মায়ের কোল থেকে তার কোলে এসে কাঁধে মাথা রেখে কান্না থামাল তখন অনুরাধার চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। সে অশ্রু মুক্তার মতই উজ্জ্বল। কি কোমল স্নেহে কি অপূর্ব মমতায় বাচ্চাটাকে সে বুকে চেপে রেখেছে। শিশু পরিচর্যার মধ্যে নারীর রূপ এমন অসাধারণ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে—এ আমি আগে লক্ষ্য করিনি। কিন্তু একথাও সত্যি যে, আজকের দিনটা আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। আজ ফাঁক গেলে কবে যে আবাব আমি সুযোগ পাব তা বলা শক্ত। তাই ঠিক করলাম, অনুরাধাকে আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে যে ভাবেই হোক কথাটা বলে ফেলতে হবে।

আসবার পথে অনুরাধার কোলে বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ায় আমাদের পক্ষে বিদায় নেওয়া সহজ হয়ে গেল। চৌরঙ্গীতে পৌছে মেয়েকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে অনুরাধা আমার সঙ্গে নেমে পড়ল। পরস্পরের ঠিকানা আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। চিঠি লেখার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তির পর অনুরাধা মোটরের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে আর একবার ঘুমন্ত বাচ্চার মুখে একটা চুমু দিল। তাকে ছেড়ে আসতে অনুরাধার খুব দুঃখ হচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মোটর বেরিয়ে যেতে আমি বললাম: মন কেমন করছে?

অনুরাধা আমার মুখে দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল: হ্যাঁ।

: তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে।—আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল: তোমাকে যে পায় সে আর ছাড়তে চায় না।

: ইস্—

: হ্যাঁ, সত্যি। ছোট মেয়ে মাত্র দু ঘণ্টার চেনাশোনায় তোমাকে যে ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল, তাতে তো আমি ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তোমায় যোধপুরে না টেনে নিয়ে যায়। ঘুমিয়ে না পড়লে কি কাণ্ড হত কে জানে।

: হ্যাঁ, আমার মনেও সে ভয় ছিল। ভারী চমৎকার বাচ্চা কিন্তু। মনে মনে আমিও ওকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ভাববেন না, ব্যাপারটা একতরফা।

: তাহলে চেয়ে নিলে না কেন?—আমি একটু ঠাট্টা করলাম।

অনুরাধা গম্ভীর মুখে বলল : বাবার কাছে চাইলে তিনি হয়তো দিয়ে দিতেন কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হতেন না।

: বাবাও দিতেন না।

: আমারও সেই রকম ধারণা ছিল। তবে আপনি যে রকম হাল্কা ভাবে বললেন, 'চেয়ে নিলে না কেন' তাতে আমার সন্দেহ হল, বাপেরা বোধ হয় সন্তানকে হাত ছাড়া করতে পারলেই বেঁচে যায়।

তার রাগ দেখে মনে মনে আমি হাসলাম কিন্তু মুখে কোন মন্তব্য করলাম না।

: কোথায় যাবেন বলছিলেন ?—হঠাৎ প্রশ্ন করল অনুরাধা।

: হ্যাঁ, আমার বাসায় যাব এখন। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে।

অনুরাধা মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে বলল : আমার সঙ্গে দরকারী কথা ? কি কথা অশোকবাবু ?

: গিয়েই শুনো।

: অমলবাবু এসেছেন নাকি ?

: না, অমলবাবু আসেন নি। তাঁর কোন কথা নয়।

: তবে ?

: আমার নিজের কথা।

: আপনার কথা ?—অনুরাধার মুখখানা মুহূর্তেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি তার মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্য বললাম : তেমন কিছু নয়। তোমাকে একটা মজার খবর শোনাব।

: মজার খবর ? কার সম্বন্ধে ?

: আমার সম্বন্ধে।

অনুরাধার মুখে আবার হাসি ফুটল। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

: চাবি নিয়ে দরজাটা খুলে বস। আমি চা দিতে বলি।

অনুরাধা চাবি নিয়ে উপরে উঠে গেল। কয়েক মিনিট বাদে ঘরে ঢুকে দেখি, সে আলো জেলে টেবলে পা ঝুলিয়ে বসে একখানা ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল দেখছে। আমার সাড়া পেয়ে কাগজটা নামিয়ে রাখল। আমি ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

কি বলব ? কি ভাবে বলব ? কিছু কি আন্দাজ করতে পারেনি অনুরাধা ? গঙ্গার ধারে বসে আমি যে অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলাম, সেটা কি ও ভুলে গেছে ? এই সমস্ত চিন্তায় আবার আমি আনমনা এবং বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

একটু বাদে হোটেল থেকে চা এল। সেটা অনুরাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম : খাও।

তারপর চা খাওয়াও শেষ হয়ে গেল। আমি কিছু বলতে না পেরে সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম।

: জানেন অশোকবাবু, বোটানিক্সে আজ ভারী মজা হয়েছিল।

: সবটাই তো মজা হল আজ। ঘোষ পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারটাই তো মজার।—কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

: তা তো বটেই। আরও একটা ঘটনা—

হঠাৎ থেমে গেল অনুরাধা।

: কি বল তো ?

: মানে ইয়ে আর কি।—হোঁচট খেল অনুরাধা : মিসেস ঘোষ বড্ডো ইনকুইজিটিভ।

: কেন, কি বলছিলেন ?

অনুরাধা এক মিনিট চুপ করে থেকে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল : খালি জানতে চাইছিলেন, আপনি আমার কে হন।

আমার সারা শরীরের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া যায় না।

: তুমি কি বললে ?

অনুরাধা হঠাৎ পেছনের জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করে ছেলেমানুষের মত বলল : আমি বললাম ইয়ে হন। মানে কিছু একটা না বললে আবার কি ভাববে যে—

আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে লজ্জা গোপন করছে। আমি দাঁড়িয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল।

: অনুরাধা, আমি বিলেতে চাকরি পেয়েছি। আসছে মাসে ইংল্যাণ্ডে রওনা হব। যাবার আগে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পাকা করে ফেলতে চাই। আমি তোমাকে ভালবাসি অনুরাধা।

আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল অনুরাধা। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ নিজের উপর আয়ত্ত হারিয়ে তাকে দুই হাতে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিলাম। আমার বুকের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত অসাড় এবং নিস্পন্দ হয়ে রইল অনুরাধা। তার হৃদ্স্পন্দনের প্রতিটি তপ্ত তরঙ্গ আমার বুকের মধ্যে এক বিচিত্র আলোড়নের স্বাদ বয়ে আনতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝটকায় নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে হাঁপাতে হাঁপাতে দেওয়ালের দিকে সরে গেল সে। তখনও আমার বুকের মধ্যে বৈশাখের দুরন্ত ঝড়। এগিয়ে গিয়ে আবার তার হাত চেপে ধরলাম। সে ছাড়াবার চেষ্টা করল না। মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের দিকে। তার চোখ দুটো জলে টলটল করে উঠল। আমি রুমাল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতেই সে কান্নার স্বরে বলে উঠল: কি করলে—তুমি—কেন—

: আমি তোমাকে ভালবাসি অনুরাধা। বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থ-সামর্থ্য কোথাও আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার করুণাই আমার একমাত্র যোগ্যতা। তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ বলেই আজ আমি এত সাহস পেয়েছি। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না—বিশ্বাস কর—

অনুরাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমার হাত থেকে রুমালটা টেনে নিয়ে দুই হাতে চেপে ধরল নিজের চোখের উপর। কান্নায় তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ততক্ষণে আমার মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাকে অমন আকুল নয়নে কাঁদতে দেখে সন্ত্রস্ত এবং বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

: প্লীজ, প্লীজ অনুরাধা—

অনুরাধা কি একটা বলতে গেল। কথা ফুটল না। শুধু একটা গোঙানীর আওয়াজ উঠল তার গলায়।

: যদি কোন অপরাধ করে থাকি—ক্ষমা কর। কেঁদো না লক্ষ্মীটি—প্লীজ, প্লীজ—perhaps my approach has been clumsy—but its my heart—মাসের পর মাস দিবারাত্রি আমি শুধু তোমাকে ধ্যান করেছি অনুরাধা—আমাকে তুমি করুণা কর—করুণা কর—কান্না থামিয়ে।

কেন জানি না, আমার চোখ দুটোও হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল। অনুরাধা চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়। তারপর

হঠাৎ কান্না থামিয়ে টেবিল থেকে হাতব্যাগ তুলে 'আমি যাই' বলে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল। আমি তার হাত চেপে ধরলাম। আমার বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পিঠছে। এইমাত্র যা করেছি, তারপর যদি অনুরাধা কোন সুস্পষ্ট জবাব না দিয়ে বিদায় নেয়, তাহলে আমি কোথায় গিয়ে আত্মরক্ষা করব ?

: কোথায় যাচ্ছ অনুরাধা ?

: বাড়ি যাই।—অস্ফুটে বলল সে।

: আমার উপর রাগ করে ?

: না।—অনুরাধা মাথা হেঁট করল।

: সত্যিই রাগ করনি তো ?

অনুরাধা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : না।

: তাহলে আর একটু বসে যাও লক্ষ্মীটি।

অনুরাধা এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমার হাত ছাড়িয়ে দরজার কাছ থেকে আবার ঘর ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনের ভাব কি তা আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। আমার আবেদনে সে সাড়া দিল কি-না, তাও আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেল। কিন্তু সেই প্রশ্ন তুলতে গেলে পাছে সে আবার কান্নাকাটি করে, সেই ভয়ে আমি নীরব হয়ে রইলাম। আমার আচরণে যদি ও রাগই না করে থাকে, তাহলে এমন ফুঁপিয়ে কাঁদল কেন ? মাথার মধ্যে কত রকম উল্টোপাল্টা চিন্তা এসে যে ভীড় করতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। আমি পায়ে পায়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনুরাধা ফিরে তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

: অনুরাধা—

: বল।

: হয়তো তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ—

: না।—স্পষ্ট ভাষায় বলল সে।

সাহস পেয়ে আমি বললাম : আরও অনেক কিছু বলবার আছে—

: আজ থাক—প্লীজ।

: তাহলে কবে শুনবে বল ?

অনুরাধা অনেকক্ষণ নীরব থেকে শেষে বলল : আর একদিন।

: বেশ তাই ভাল। শুধু আজ একটা কথা বলে যাও—আমাকে বিমুখ করবে না তো?

অনুরাধা মৌন হয়ে রইল। আমি তার জবাবের প্রত্যাশায় ক্রমে ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠলাম।

: বল অনুরাধা—

: আর একদিন।—নীরস কণ্ঠে আগের কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল সে।

: তুমি কি আমাকে কোনদিন ভালবাসনি অনুরাধা?

: প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আজ আর কোন কথা নয় লক্ষ্মীটি।

তার গলার স্বর এত স্বাভাবিক যে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। বোঝা গেল, এতক্ষণে সে নিজেকে স্ববশে এনেছে। আমি আজই একটা সুস্পষ্ট উত্তরের প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু ও যখন ভেবে দেখার কথা তুলেছে, তখন আপাতত সে প্রশ্ন বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়। ভেবে দেখতে হবে বই কি। জীবনের এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেক কিছু ভাববার আছে।

অনেক দিন ধরে ক্রমাগত ভেবে ভেবে আমি নিজের দিকটা মীমাংসা করে ফেলেছি। অনুরাধা বয়সে অনেক ছোট। আমার মত গভীরভাবে বিষয়টা যে ও আগে চিন্তা করেনি তাতে আর সন্দেহ কি! এবার একটু চিন্তা করুক। পরে ও যেন না ভাবতে পারে যে, হঠকারিতা করে ফেলেছে। তাহলে আমরা কেউ সুখী হতে পারব না।

: আমি যাই।—অনুরাধা আবার অনুনয় করল।

: বাথরুম থেকে চোখ মুখ ধুয়ে যাও। তোমার গালে এখনও কান্নার দাগ রয়েছে।

অনুরাধা লজ্জিতভাবে ডান হাতখানা একবার গালে ঘসে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে আমার আয়নায় চুলটা আঁচড়ে ব্যাগ তুলে নিয়ে বলল: চললাম।

: আমি সঙ্গে যাই—বাসায় পৌঁছে দিই।

: না, থাক। আজ থাক।

: কবে পর্যন্ত তোমার জবাব—

প্রশ্নটা পুরো উচ্চারিত হবার আগেই অনুরাধা দ্রুতপায়ে নীচে নেমে গেল।

আমি সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত ঘটনাটা যে কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল, সেটা অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল। আমার প্রস্তাবে অনুরাধা এমন পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে যে, সেটাকে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমি যে অত্যন্ত অনিপুণভাবে তার দিকে এগিয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন রকম আভাস না দিয়ে হঠাৎ তাকে ওভাবে স্পর্শ করা আমার উচিত হয়নি। তাতে অনুরাধার কাছে আমার মর্যাদাহানি হয়েছে। ও আমাকে নিশ্চয়ই স্থূলরুচি এবং অসংযমী মানুষ বলে মনে করেছে। কাজটা সত্যিই বড় গর্হিত হয়ে গেল। একটি মেয়েকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃকপাত না করে ওভাবে নিজের লোভ প্রকাশ করা শালীনতার পরিপন্থী। সত্যিই আমি বড় clumsy, এতদিন ধরে ভেবে ভেবেও প্রণয় নিবেদনের কোন সহজ এবং শালীনতাসম্মত পদ্ধতি স্থির করতে পারিনি। নিতান্ত অসংস্কৃত লোকেরা এ ব্যাপারে যা করতে পারত আমিও তাই করেছি।

লজ্জা, আত্মগ্লানি এবং অনুশোচনায় আমার চিত্ত দগ্ধ হতে লাগল। মানুষের সংযম যে তার অনুপ্রাণিত বাসনার কাছে কত অসহায়, আমি আজ তার পরিচয় পেয়েছি। নিজের উপর রাগে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। অনুরাধার কাছে আমি আর মুখ দেখাব কি করে? যদি সে আমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাহলে জীবনে আমার ছায়া মাড়াবে না। আমি লোভী, আমি অসংযমী, আমি সুযোগ-সন্ধানী দুর্বলচিত্ত পুরুষ—এই ধারণাই তার মনে চিরকালের জন্য একটা কালো দাগ রেখে যাবে। আর সেই দাগটা হবে অশোক মিত্রের নোংরা স্মৃতি।

কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু সবটাই বা এমন খারাপভাবে দেখছি কেন? অনেক দিন আগেই তো অনুরাধা আমাকে স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে, সে উহ্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ। আমিই যখন সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, তখন তার উপর আমার এই ধরনের একটা অধিকার কি স্বীকৃত হয়নি? আমার আচরণের মধ্যে আকস্মিকতা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা একেবারে অপ্রত্যাশিত বোধ হয় নয়। যে মেয়ে মনে মনে আমাকে স্বামী বলে বরণ করে নিয়েছে, দুর্বল মুহূর্তে আমি যদি তাকে কামনা-তপ্ত হাতে স্পর্শ করি, তাহলে নীতিশাস্ত্রের অবমাননা করা হয় কি? বোধ হয় তা নয়। সেই জন্য অনুরাধা প্রথমে ক্ষুব্ধ

হলেও পরে নিজেকে সামলে নিল। সে নিশ্চয়ই অনুভব করেছিল, ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়েই আমি তাকে স্পর্শ করেছি। আমি যে তার ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে চাইনি, সেটা সে বুঝতে পেরেছে বলেই আমার মনে হয়। তাই তো স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে গেল যে আমার আচরণে সে রাগও করেনি, অসন্তুষ্টও হয়নি। তাহলে অমন কান্নাকাটিই বা করল কেন আর অমন মনমরা হয়ে হঠাৎ পালিয়েই বা গেল কেন? আমার শেষ কথাটার জবাবটা যে সে দেয়নি, সেটা আমার মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধতে লাগল। যে মেয়ে মনে মনে বিয়ের পাত্র স্থির করে ফেলেছে, সেই পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব শুনে সে মেয়ে আবেগের তাড়নায় এমন বিধ্বস্ত হল কেন?

সমস্ত ঘটনাটা আমাকে আশা-নিরাশায় অবিরাম দোলাতে লাগল। মনে হল, আমার কথা আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি এবং সম্ভবত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনদিনই তা বোঝাতে পারব না। নিজের উপর আমি আস্থা হারিয়েছি। অনুরাধাকে কাছে পেলে আবার যে আমি কি হঠকারিতা করে ফেলব তা বলতে পারি না। আজ যা করেছি, তা শালীনতা-সম্মত হোক বা না হোক সেটা অত্যন্ত মর্মগ্রাহী। এখনও আমার সমস্ত দেহে তার দেহের কোমল উষ্ণতা নিবিড় পুলকে সঞ্চরণশীল, এখনও তার দেহের সৌরভ আমাকে তীব্র মাদকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই প্রথম একটি পূর্ণযৌবনা নারীকে আমি আমার সমস্ত কামনা দিয়ে আলিঙ্গন করেছি এবং তার স্বাদ অবিস্মরণীয়, অবর্ণনীয়। সেই আনন্দের অনুভূতি আমার সমস্ত উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তাকে অনেকখানি লঘু করে দিয়েছে। নিজেকে যতই ধিক্কার দিই, আজকের এই অভিজ্ঞতা আমার পরম সম্পদ—প্রথম প্রেম—প্রথম আলিঙ্গন। মানুষের দেহ যে কি অসাধারণ আনন্দের আধার তা আমি এই প্রথম উপলব্ধি করেছি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজল। আশ্চর্য সময়ের অপেক্ষিকতা। দুঘণ্টা আমি ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। স্টুপিড! কিছু একটা করতেই হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো কথা আর বাসি ঘটনার ভালোমন্দ নিয়ে জাবর কাটলে চলবে না। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা করেছি তা করেছি। তার আর ময়নাতদন্তে কাজ নেই। অনুরাধা ভেবে দেখতে চেয়েছে। বেশ তাই দেখুক। কিন্তু সে তো আমার চেয়ে আগেই সব কিছু

ভেবে রেখেছে। নইলে উহ্য প্রতিশ্রুতির কথা উঠল কিসে? হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন আজগুবি হয়ে উঠল। অনুরাধা ভেবে দেখার প্রশ্ন তুলল কেন? তাহলে কি অসুখের পর আগের সিদ্ধান্ত সংশোধনের কথা চিন্তা করেছে? সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। হয়তো সেখানে আর কেউ দেখা দিয়েছে ওর জীবনে। এবার আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন হলাম। কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অনুরাধাকে যে আমি পেতে পারি না, সেটা আমার ভালই জানা আছে। আমার একমাত্র জোর, আমার সম্বন্ধে তার দুর্বলতা। সেই জায়গাটা যদি চিড় খায় তাহলে আমি আর নেই।

এই নতুন আশঙ্কা মুহূর্তেই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। অনুরাধার জবাবটা আমাকে অবিলম্বেই জানতে হবে। হাতে আর মাত্র এক মাস সময় আছে। বিলেত যাবার আগে যদি বিয়ে না হয়ে যায়, তাহলে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা নেই, কারণ তার আগে আমি এদেশে ফিরতে পারব না। আর বিয়ে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বিলেতে যেতে হলে একদিনও সময় নষ্ট করা চলে না।

ভাবলাম, সব কথা গুছিয়ে অনুরাধাকে একটা চিঠি লিখে দিই। মুখে বললে এর গুরুত্ব ঠিকমত বোঝানো যাবে না।

রাত্রে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম:—

অনুরাধা—

কোন রকম ভূমিকা না করেই কথাটা প্রকাশ করছি কারণ কাল যা ঘটেছে তারপর আর ভূমিকা নিষ্প্রোয়জন।

নিজের দিক থেকে গুণাগুণ বর্ণনা করার কিছু নেই। তুমি আমাকে যা দেখেছ আমি ঠিক তাই। আমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাটা সরকার অনুমোদন করেন না। সুতরাং আসলে আমি ম্যাট্রিকুলেট। কারখানায় কত মাইনে পাই তাও তুমি জান। ওসব দিক দিয়ে উৎসাহ বোধ করার কিছু নেই। তোমাকে চাওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহস। তোমার প্রশ্রয় না পেলে হয়তো কোনদিনই এই দুঃসাহস প্রকাশ করতে পারতাম না। পরীক্ষার আগে অসুখের সময় তুমি বলেছিলে, বিয়ের ব্যাপারে তুমি "উহ্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ"। অনেক ভেবে দেখলাম, তুমি আমারই বাগদত্তা। সেদিন থেকে

তোমাকে পাবার বাসনা আমার মধ্যে ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য আমি বিলেতে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। সম্প্রতি সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। সেখানে যে অর্থ আমি উপার্জন করব তাতে আমাদের দুজনের বিলেতে থাকার খরচ উঠে আসতে পারে।

অনুরাধা, আমি আমার অস্তিত্বের প্রতিটি পরমাণু দিয়ে তোমায় ভালবাসি। তোমাকে সুখী করতে পারব কিনা জানি না, তবে সুখী করার চেষ্টায় জীবনপাত করতে কোন দিন দ্বিধা করব না। তোমাকে না পেলে সারা জীবন আমার যে কেমন করে কাটবে, তা ভেবে আমি কোন দিশা পাই না। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন তোমার উপর নির্ভরশীল।

কাল ভেবে দেখতে চেয়েছিলে। রাত্রে নিশ্চয়ই কিছু ভেবে ঠিক করেছ। আমি আজ সেটা জানতে চাই। বেলা চারটে পর্যন্ত বাসায় থাকব। তার মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই আসবে। যদি না আস, তাহলে ধরে নেব, আমার প্রস্তাব তোমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

—অশোক

বোধ হয় চিঠিটাও ক্লামজি হয়ে গেল। এর আগে কোন মেয়ের কাছে আমি চিঠি লিখিনি। প্রণয়ীর কাছে তো নয়ই। মনের মধ্যে যে আবেগ, চিঠিতে তার গভীরতা ফোটেনি। কথাগুলো বলবার মধ্যেও যেন মাধুর্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু থাক, এই থাক। মন অবসন্ন। নতুন করে আর একটা চিঠি লেখার ক্ষমতা নেই।

পরদিন ভোরে উঠে সকলের অলক্ষ্যে চিঠিটা আমি অনুরাধাদের লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

আজ আমাকে কারখানায় যেতে হবে। সকালেই যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। অনুরাধার জবাবটা আজই আমার চাই। চারটের মধ্যে যদি সে আসে তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, সে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। না এলে বুঝতে হবে যে, আমার কাছে আসার পথ সে চিরকালের মত রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সারাদিন আমি বাড়িতে কি রকম ছটফট করে কাটালাম তা আমিই জানি। কান ছুটো দরজার দিকে সজাগ হয়ে রইল। সেখানকার সামান্যতম আওয়াজও আমার কান ফস্কাল না। সিঁড়ির উপর লোকজনের যাতয়াতের শব্দে মাঝে মাঝে আমি অকারণেই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলাম। সে কি আসবে? সে কি আসবে না? তার আসা না-আসার আশা-নিরাশায় আমার মনটা ছুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। সময় এগোচ্ছে অতি ধীর গতিতে এবং যতই এগোচ্ছে ততই আমি শঙ্কিত এবং সচকিত হয়ে উঠছি। যদি সে লেটার বক্সটা অনুরাধা না খুলে থাকে? যদি সে কালকের কথা স্মরণ করে চিঠিটা না পড়েই ঘৃণায় কুটিকুটি করে ফেলে? যদি সে রূঢ় ভাষায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করে একটা চিঠি লিখে পাঠায়?

ঢং ঢং ঢং।

তিনটে বাজল ঘড়িতে।

টক টক টক।

দরজায় টোকা পড়ল। আমি অধীর হৃদয়ে ছুটে গেলাম দরজার কাছে। হ্যাঁ, অনুরাধাই। আনন্দের আতিশয্যে আবার আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল।

: এস। তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবে।

অনুরাধা শান্ত চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের ভিতরে চলে এল। আমি দরজাটা বন্ধ করে তার পিছু পিছু ঘরের মাঝখানে এসে পিছন থেকে তাকে ছুই হাতে জড়িয়ে তার সুগন্ধ চুলের মধ্যে ঠোঁট ছুটো চেপে ধরলাম। সে বাধা দিল না, অসন্তোষও প্রকাশ করল না। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি তাকে আরও কাছে টানলাম—

টক টক টক।

দরজায় টোকা পড়ল। আমার বাহু বন্ধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনুরাধা। আমিও দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজায় টোকা দেয় কে? সিরাজুদ্দীন সাহেব আমাকে ডাকবার জন্য লোক পাঠালেন নাকি?

টক টক টক।

দরজাটা যদিও খোলা (ভেজানো) আছে, তবু অনুরাধাকে এখানে দেখলে বাইরের লোকের মনে অশোভন সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমে

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। শেষে মনে হল, অনুরাধা তো দুদিন বাদে আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে। সুতরাং সন্দেহ করলেই বা কি এমন আসে যায়।

: দরজা খোলা আছে।

কবাট খুলতেই আমি চমকে উঠলাম। বণ্টু মজুমদার। সাহেবী পোশাক, হাতে সুটকেশ। আমাকে দেখে একগাল হেসে ফেলল।

: আসুন, আসুন অমলবাবু।—সাদর সম্ভাষণ করলেও মনে মনে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। বাইরের লোকের সন্দেহকে অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু বণ্টু যে একেবারে ভিতরের লোক।

: অনুরাধা কোথায় গেল অশোকবাবু?—ঘরের ভিতরে পা দিয়েই প্রশ্ন করল বণ্টু।

অনুরাধা কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে আছে। মুখে এক লেশ রক্ত নেই। তার এমন grim চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি।

: ওই তো বসে আছে।—আমি মুখে হাসি টেনে সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

: হ্যাঁ, তাইতো। বাস থেকে নেমেই দেখলাম, এ-বাড়িতে ঢুকছে ও। রাস্তা থেকে জোর পায়ে এসে ওকে ধরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তার আগেই ও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শুনে খুশি হলাম। অনুরাধা যে এইমাত্র আমার ঘরে ঢুকেছে সেটা বণ্টু স্বচক্ষে দেখেছে। কাজেই ওর মনে কোন সন্দেহ না ওঠাই স্বাভাবিক।

: তারপর কি খবর অমলবাবু? হঠাৎ কোথা থেকে এলেন?

বণ্টু সুটকেশটা মেঝেয় রেখে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল।

: ডিহরি থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি। আপনাকে বাসায় পাব না জেনেও আপনার এখানে চলে এলাম। আমার কপাল ভাল। আপনাদের দুজনকেই পেয়ে গেলাম।

: ডিহরি থেকে সোজা এখানে আসছেন?

বণ্টু হাসিমুখে বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম, কোথায় যাই? হঠাৎ খেয়াল হল, আপনি একটা ভালো বাসায় একলা থাকেন। সুতরাং কটা দিন আপনার ওখানে গিয়েও তো থাকতে পারি।

: ভালোই করেছেন। তাহলে স্নান করে পোশাক বদলে ফেলুন। সকালে নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি।

: পাগল হয়েছেন? আমার পেট কখনও খালি থাকে না। কিন্তু অনুরাধা অমন মুখগোমড়া করে বসে আছে কেন অশোকবাবু? আমাকে দেখে বিরক্ত হল বোধ হয়?—শেষের কথাটা বিদ্রূপের সুরে বলল বল্টু।

আমি রসিকতা উপভোগের ভঙ্গিতে একটু জোরে হেসে উঠলাম। অনুরাধা হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু হাসতে পারল না। তার চোখেমুখে কয়েকটা বিচিত্র রেখা ফুটে উঠল। বল্টু উঠে গিয়ে অনুরাধার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল: তোমরা ভালো আছ তো অনুরাধা?

অনুরাধা ঘাড় কাত করে জানাল, ভালো আছে।

: পরীক্ষা কেমন হল?

: মন্দ নয়।

আমি বললাম: অমলবাবু, আপনার সঙ্গে অনুরাধার একটা তুমুল ঝগড়া আছে।

: কেন কেন?

: আগেরবার কলকাতায় এসে আপনি ওঁদের সঙ্গে দেখা করেন নি।

: বুঝেছি বুঝেছি। সেজন্য পরে সত্যিই আমি অনুতপ্ত হয়েছি অশোক-বাবু। জানেন তো, আমি অশিক্ষিত মুখ্যু মানুষ। অনেক সময় অনেক জিনিসের মাত্রা রাখতে পারি না। সেজন্য অনুরাধার কাছে ক্ষমা চাইছি, মায়ের কাছেও ক্ষমা চাইব। এতে আর ঝগড়ার কি আছে? অনুরাধা গাল দেবে আমি শুনব। চিরকাল তাই করে আসছি। সেটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, আজকাল অনুরাধার গাল খেতে পাই না বলে মাঝে মাঝে আমার ভারী মন কেমন করে। ঘৃণা এবং ভালবাসার টান বোধ হয় সমান। লোকে ভালবাসার কাঙাল হয়, আমি ঘৃণার কাঙাল হয়ে উঠেছি।—বলেই বল্টু হো হো করে এমন জোরে হেসে উঠল যে তাকে অট্টহাস্য বলা চলে।

আমি তার বক্তব্য এবং কথা বলার অপূর্ব নৈপুণ্য দেখে প্রায় চমকে উঠলাম। এক বছরে বল্টু যে মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই অভাবনীয়।

স্যুট পরলে তাকে বরাবরই ভাল দেখায়। আজ তাকে আরও তাজা, আরও প্রাণবন্ত এবং সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মত দেখাচ্ছে। ব্রেল

ভ্রমণের ক্লান্তি কোথাও তাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। ভালবাসা আর ঘৃণা—দুইয়েরই শক্তি সমান। কথাটা ও কতটুকু বুঝে বলেছে জানি না, কিন্তু সুন্দরভাবে অনুরাধার সামনে তুলে ধরেছে। ওর রসবোধ এবং কৌতুকপ্রিয়তাও যথেষ্ট উঁচু মানে উঠে গেছে। অনুরাধার তিরস্কার ওর কাছে আর আত্মগ্লানি নয়। সে হল ভালবাসারই ভিন্ন রূপ। আমি জানতাম, ওর জীবনে এ উপলব্ধি একদিন আসবেই। এত তাড়াতাড়ি এল দেখে সত্যিই বড় আনন্দ হচ্ছে। আজ অনুরাধা নিরুদ্বেগ হবে। বল্টুর সম্বন্ধে নিজের সদিচ্ছার পরিপূর্ণতা আজ তার চিত্তকে সাফল্যের আনন্দে ভরে দেবে।

: আমি যাই।—হঠাৎ উঠে দাঁড়াল অনুরাধা।

: সে কি?—বল্টু লাফিয়ে উঠল: এইতো এলে। অশোকবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা না বলেই কোথায় যাবে? আমি—মানে—কিছুক্ষণ না হয় বাইরে থেকেই ঘুরে আসছি।

: কথা যা ছিল হয়ে গেছে।—গম্ভীরভাবে বলল অনুরাধা।

বল্টুও গম্ভীর হয়ে উঠল: অশোকবাবু, আমি সত্যিই বিব্রত বোধ করছি। এ রকম হবে জানলে একটু দেরি করেই বাসায় ঢুকতাম। আপনারা কথা বলুন, আমি যাই।

: নিজের সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা রাখা ঠিক নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই লেখাপড়া চাকরি-বাকরি করে জীবন কাটায়। তাতে বিশেষ কোন বাহাদুরী নেই। তোমাকে দেখে আমি অসন্তুষ্ট হতে যাব কোন দুঃখে? রাস্তায় বেরুলে প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার লোক দেখা যায়। তারা যেমন আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি—যাকগে, আমি এসেছিলাম, আমার কাজ হয়ে গেছে, এবার চলে যাচ্ছি।—অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বলল অনুরাধা।

: তুমি ঠিকই বলেছ।—গম্ভীর গলায় জবাব দিল বল্টু: সত্যিই তো, আমাকে দেখে তোমার সন্তোষ-অসন্তোষের কি আছে। রাস্তাঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যেমন তোমার কাছে নিছক রাস্তার লোক, আমিও তাই। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যেতে চাইছ দেখে ভেবেছিলাম দুই ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকতেও পারে। যখন বলছ নেই, তখন খুব ভালো কথা।—বল্টু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল, কিন্তু তার কথার প্যাঁচে জড়িয়ে অনুরাধাকে আরও দুমিনিট সেখানে অপ্রস্তুতভাবে

দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর মুখ নীচু করে নীরবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনুরাধাকে আমি লিখেছিলাম, "...আজ তুমি নিশ্চয়ই আসবে। যদি না আস তাহলে ধরে নেব যে আমার প্রস্তাব তোমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়নি।" অনুরাধা এসেছিল। কিন্তু কোন কথা বলার অবকাশ পায়নি। তবে তার আচরণে আত্মসমর্পণের আবেশ ছিল।

অনুরাধার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না বলে বল্টুর উপর আমার রাগ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি রাগতে পারলাম না। অনুরাধার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি এবং মান-অভিমানের পালাটা আমি সত্যিই উপভোগ করেছি। অনুরাধা বলে বল্টুর উন্নতির মূলে আছি আমি। সম্ভবত নিজের অগোচরে আমি সেই কমপ্লিমেন্টটা হজম করে নিজেও তাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। নতুন বল্টু যেন আমারই হাতে তৈরি। তাই অনুরাধার মত গর্বিত এবং চতুর মেয়ের সঙ্গে প্রায় সমান চাতুর্যের সঙ্গে বল্টুকে কথা বলতে দেখে আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।

: দেখলেন অশোকবাবু, how she treats me।—কাঁদোকাঁদো ভাবে বলল বল্টু।

: দেখলাম।—হাসতে হাসতে বললাম আমি : You have also served her well।

: সত্যিই আমি ইনট্রুড করিনি তো?

: না।

: আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হননি?

: আমি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হব কেন? যতক্ষণ বাসায় থাকি, আমার দুয়ার সকলের জন্যই খোলা! কারও সঙ্গেই কোন গোপন কথা নেই। কাজেই কেউ এখানে ইনট্রুডার নয়।

ডাহা মিথ্যা কথা। না বলেই বা উপায় কি? অনুরাধাকে ওর সন্দেহের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তো।

: না, তা নয়, হয়তো কোন কাজের কথা ছিল—

: হ্যাঁ, কাজের কথাই ছিল। ওর অনার্সের ফলটা কোন সূত্রে আগে ভাগেই জানা যায় কিনা তাই জানতে এসেছিল। বললাম, চেষ্টা করব। আর কি। হ্যাঁ, এবার আপনার খবর বলুন।

বল্টু উৎসাহের সঙ্গে বলল : পরীক্ষা দিয়েছি, পাশ করে যাব। চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। ইউনিয়নের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী হয়েছি। আর কি শুনতে চান বলুন ?

: সবই সুসংবাদ। হঠাৎ কলকাতায় এলেন যে ?

: স্রেফ বেড়াতে। অনেক ছুটি পাওনা ছিল, নিয়ে নিলাম। এবার কলকাতাটা সত্যিই ভাল লাগছে। হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না অশোক বাবু, সবই যেন আমি নতুন চোখে দেখছি। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে অনুরাধার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে আমি ভীষণ চটে উঠতাম। Now I feel amused।

বল্টু যে কি রকম আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠেছে, সেটা ওর শেষের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এতদিন অনুরাধার কাছে ওর হীনমন্যতা ছিল বলে তার সব কিছুই ও বাঁকা চোখে দেখত। আজ আর সে হীনমন্যতা নেই। তাই অনুরাধার শাসনে ক্রুদ্ধ না হয়ে কৌতুক অনুভব করে। বল্টুর পরিবর্তন শুধু বল্টুই উপলব্ধি করেনি, সেটা আমিও উপলব্ধি করছি।

: কদিন এখানেই থাকব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো ?

: মোটেই না। জায়গার তো অভাব নেই।

: ধন্যবাদ। তারপর আপনার খবর কি ? নতুন বই টই বেরুল ?

: আর নতুন বই। কারখানা থেকে আমি ছাঁটাই হয়ে গেছি। সাত তারিখ থেকে স্ট্রাইক।

: কি রকম ? কি রকম ?—দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠল বল্টু। আমি সমস্ত ঘটনা তার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। শুনে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

: আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, ঘনশ্যাম ভয়ানক পাজি লোক। করালী বাঁড়ুজ্জ্যেকে টাকা দিয়ে পুষে রেখেছে। ও শালা অনেক গোলমাল পাকিয়ে তুলবে।

: আমরা যে কোন অবস্থার জন্য তৈরি আছি।

: তাতো বটেই। তৈরি না হয়ে কি আর আপনারা স্ট্রাইকে নামছেন। তবু খুব সতর্ক থাকতে হবে। এর মধ্যে অনেক নোংরামি দেখা দিতে পারে।

: দেখা যাক কি হয়। আমি এখন বেরুব অমলবাবু। আপনি স্নান

খাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন। বাইরে বেরোবার সময় চাবিটা দারওয়ানের কাছে রেখে যাবেন।

: ঠিক আছে।

কারখানায় গিয়ে শুনলাম পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। সন্ধ্যায় পাশের ময়দানে একটা সাধারণ সভা ছিল। সেটা সেরে আমরা একশন কমিটির মিটিংয়ে বসলাম। পরিস্থিতি মোটামুটি ভালোই। কারখানার শতকরা পঁচাশি জন শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষে। তারা যদি কারখানায় না ঢোকে তাহলে বাকী পনেরো জন ঢুকতে সাহস পাবে না। তাছাড়া ফাণ্ডে টাকা পয়সাও মন্দ ওঠেনি। কিন্তু শুধু স্ট্রাইকের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না। স্ট্রাইকের সঙ্গে অন্যান্য বাইরের চাপ দেওয়া দরকার। গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই ঘনশ্যামকে সাহায্য করতে শুরু করেছেন। চারিদিকে পুলিশের ছড়াছড়ি দেখে সে বিষয়ে যেন সন্দেহ থাকে না। মালিক-শ্রমিক বিরোধে গভর্নমেণ্ট মালিকের গদা কাঁধে নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন কেন, সে প্রশ্ন তুললে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী চোখ রাঙিয়ে বলবেন, "আপনারা ট্রেড ইউনিয়নে রাজনীতি ঢোকাচ্ছেন।" গভর্নমেণ্ট মালিকের সেনাপতি হয়ে শ্রমিকের ঘাড় মটকাতে আসছেন, সেটা নাকি রাজনীতি নয়। যদি কেউ তাকে বাধা দিতে এগিয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে রাজনীতি। এ এক অদ্ভুত গণতান্ত্রিক যুক্তি। এ যুক্তি মানলে পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর থাকে না। তাই আমরা একটা ডেপুটেশন করে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লাম। দেশে এখন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছে। এ অবস্থায় মালিকের একগুঁয়েমিতে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে কাজ বন্ধ হলে দেশেরই ক্ষতি। গভর্নমেণ্ট এই শ্রমবিরোধ মিটমাট করার বদলে মালিকের পক্ষ নিয়ে তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছেন। বিরোধী দলগুলো আইনসভা এবং পার্লামেণ্টে এসব প্রশ্ন তুলে গভর্নমেণ্টের মুখোস না খুলে ধরলে সে দায়িত্ব পালন করবে কে?

ইউনিয়ন অফিস থেকে বেশ কিছু দূর চলে আসবার পর একটা গলির মোড় থেকে হঠাৎ একদল লোক এসে ঘিরে ধরল আমাদের। তাদের হাবভাব মারমুখী।

: এই যে, এই শালারা ইউনিয়নের পাণ্ডা।—একটা ষণ্ডাগুণ্ডা লোক চেঁচিয়ে উঠল পাশ থেকে।

আমরা এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সামনে পড়ে একেবারেই ঘাবড়ে গেলাম। মারধোর করবে নাকি?

: কোন্ শালা রে? কোন্ শালা?—একজন আমার শার্ট চেপে ধরল।

: আপনারা কি চান?—সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

: চাই তোমার কাঁচা মুণ্ডুটা।—লোকটা আমার পেটে একটা গোত্তা মারল। দেখলাম, আমার সঙ্গীদেরও এই একই দুর্দশা। জায়গাটা একটু নির্জন আর অন্ধকার। রাস্তায় লোক চলাচল অত্যন্ত কম। কাজেই ভয়ে আমার বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল।

: স্ট্রাইক-ফ্রাইক ওসব চলবে না। এটা কি রুশিয়া পেয়েছ শুয়োরের বাচ্চারা। মেরে একেবারে সাফ করে দেব পৃথিবী থেকে।

মারামারি শুরু হবার আগেই আমাদের কারখানার একদল মজুর সেখানে এসে হাজির। তাদের দেখে আততায়ীরা আমাদের ছেড়ে দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমরা তাদের দুজনকে পাকড়াও করলাম।

: তোমরা আমাদের উপর এভাবে হামলা করলে কেন? টাকা খেয়েছ বোধ হয়? কিন্তু এখানে সুবিধে হবে না। আমাদের সাফ করতে এলে তোমরাই সাফ হয়ে যাবে সেটুকু যেন মনে থাকে।

তারা আর উচ্চবাচ্য না করে গা ঢাকা দিল। কিন্তু আর এক বিপদের আভাস পাওয়া গেল এবার। শুধু পুলিস নয়, গুণ্ডাও লাগানো হয়েছে আমাদের পিছনে। আশপাশের বস্তিতে আরও ভালোভাবে প্রচার চালানো দরকার। ঘনশ্যাম যাতে ব্ল্যাক লেগ যোগাড় করতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। নইলে ব্ল্যাক লেগ আর গুণ্ডায় মিলে পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে।

রাত্রে আমরা বিরোধী দলের দুই নেতার বাড়িতে গিয়ে তাদের কাছে খুলে বললাম সমস্ত ঘটনা। তাঁরা এ ব্যাপারে সরকারকে নাড়া দিতে রাজি হলেন। বললেন, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধর্মঘট আলোচনার জন্য আগামী কালই আইনসভায় মুলতুবী প্রস্তাব তুলবেন।

রাত প্রায় এগারোটার সময় বাসায় ফিরে দেখি বল্টু পাশের ঘরে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমিও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে বল্টু গুণ্ডার হামলার কথা শুনে বলল: আপনারা বড় রকমের হামলার জন্য তৈরি থাকুন অশোকবাবু। এর মধ্যে যে করালী বাঁড়ুজ্যে রয়েছেন।

: কি করা যায় বলুন তো?

: সেটা তো বলা শক্ত। ওরা কি ভাবে অপারেট করবে তা তো জানি না। অবশ্য যদি বলেন, তাহলে আমি খবর নিতে পারি।

: আপনি খবর নেবেন?

: হ্যাঁ, চেষ্টা করলেই পারি। চেনাপরিচয় তো নষ্ট হয়নি।

: না, না অমলবাবু, আমি চাই না যে, আপনি আবার ওদের মধ্যে যান। যা করতে হয় আমরাই করব।

বল্টু হাসল। বেশ বুঝতে পারলাম, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তার বিশেষ ইচ্ছে নেই।

সেদিন আইনসভায় আমাদের কারখানার আসন্ন ধর্মঘটের বিষয় আলোচনার জন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দুটো মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। স্পীকার সেগুলো তোলবার অনুমতি দেন নি। তবে বিষয়টা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলের নেতাদের নাকি তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। বিরোধী দল অভিযোগ করেন যে, সরকারের শ্রম-বিভাগ যে এতবড় একটা ধর্মঘট সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হয়ে আছেন, তার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। ঘনশ্যাম জালানের সঙ্গে মন্ত্রী করালী বাঁড়ুজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং লেন-দেনের কথাও গোপন থাকেনি। সব নিয়ে আইনসভায় তুমুল হট্টগোল হয়। ব্যাপারটা আরও অনেক দূর গড়াতে পারে আশঙ্কা করে শেষ পর্যন্ত শ্রমমন্ত্রী জানান যে সোমবার এ সম্পর্কে তিনি আইনসভায় একটি বিবৃতি দেবেন।

পরদিন সংবাদপত্রে আইনসভার রিপোর্ট পড়ে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল আমাদের লোকেরা। গত কয়েকদিন আমরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, লড়াইটা যেন নিতান্তই আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এর কোন জাতীয় আবেদন নেই। বিষয়টা নিয়ে আইনসভায় বিতর্ক হওয়ার ফলে এটা একটা জাতীয় চরিত্র লাভ করেছে।

বিকেলে কারখানার পাশের ময়দানে বিরাট জনসভায় বিরোধী দলের নেতারা এসে আমাদের সংগ্রামে সহানুভূতি জানালেন।

রবিবার রাত্রে বণ্টু আমায় বলল : কাল কারখানায় বেরুবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন অশোকবাবু।

: কেন ?

: দেখি কি রকম স্ট্রাইক হয়। দুদিন বাদে আমাদেরও ওই পথ ধরতে হবে তো।

: বেশ যাবেন। এই কদিন কলকাতায় কি করলেন ?

: আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কিছু করিনি। আজ অনুরাধাদের বাসায় গিয়েছিলাম।

: কি বললেন তাঁরা ?

: মায়ের সঙ্গে বসে ঘণ্টা তিনেক গল্প করলাম। অনুরাধা তখন বাসায় ছিল না। ফেরার পথে সিঁড়িতে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, কদিন কলকাতায় আছি এবং আপনার এখানেই আছি কি-না।

: শুধু এই একটি প্রশ্ন ?—আমি হাল্কা স্বরে জানতে চাইলাম।

: হ্যাঁ, দুই একটা কথার বেশি হয়নি। ভয়ানক গম্ভীর। পরীক্ষা কেমন হয়েছে তাও জানতে চেয়েছিল। শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শেষে বুঝলাম, কথাটা আপনার কাছ থেকে শুনেছে।

: আমি খুবই দুঃখিত অমলবাবু। অনুরাধা আমাকে এমনভাবে ধরে পড়েছিল যে কথাটা প্রকাশ না করে পারিনি।

বণ্টু হাসিমুখে বলল : যা হবার হয়ে গেছে। জানলেই বা ক্ষতি কি ?

: আপনাকে আবার ওদের বাসায় যেতে বলেনি ?

: হাঁ, তাও বলেছে। আজ আরও একটু বসে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিল। 'কাজ আছে' বলে চলে এলাম। ওকে আমি বেশ ভয় খাই অশোকবাবু। তবে হ্যাঁ, পরিবর্তন দেখলাম অনুরাধার মায়ের। গোড়ায় তো চিনতেই পারিনি। এই প্রথম ওঁকে আমি সুস্থ অবস্থায় দেখছি। ওঁর ওখানে উঠিনি বলে খুব দুঃখ করতে লাগলেন। আমায় সত্যি সত্যি ভালবাসেন কিনা।

: কিন্তু বণ্টুবাবু, আপনি এবার নিজের বাসায় উঠলেন না কেন ? যতদূর জানি, পৈত্রিক বাড়ির একটা অংশের দখল নেবার জন্য আপনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছিলাম। আমার অংশ আমারই আছে। জিনিসপত্র

ভরে তালা মেরে রেখে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সেখানেও উঠতে পারতাম। কিন্তু একবার পাড়ার ভিতরে ঢুকলে পুরানো বন্ধুদের এড়ানো কষ্টকর হত। তাই একটু বাইরে বাইরে রইলাম।

: এখানে হোটলে খেতে আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই ?

: আজ্ঞে না। আমি বেশ আছি। ডিহরীতে আমরা মেসে থাকি কি-না। সব রকমই অভ্যাস আছে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, অনুরাধার সঙ্গে অবিলম্বেই একটা পাকা কথা হওয়া দরকার। বিলেত যেতে হলে এখনই পাসপোর্টের দরখাস্ত করতে হবে। কিন্তু পাকা কথাটা হবে কোথায় এবং কখন ? বণ্টু যতদিন আমার বাসায় আছে, ততদিন অনুরাধাকে এখানে আহ্বান করা সমীচীন নয়। আর ধর্মঘটের প্রথম দুচার দিন এদিকে মন দেওয়াও মুস্কিল। মনে মনে স্থির করলাম, বণ্টু চলে গেলেই একদিন অনুরাধাকে ডেকে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলব।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অবধি নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। ধর্মঘটের কি যে হবে কে জানে ? সূর্য উঠতে না উঠতেই চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বণ্টুকে নিয়ে। কারখানা খোলার অন্তত দু ঘণ্টা আগে গিয়ে সেখানে পৌছতে হবে।

মনটা এত উদ্বিগ্ন ছিল যে সারাপথ বণ্টুর সঙ্গে কোন কথা বলতে পারি নি। রাস্তা থেকে কারখানার দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। এই পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বাস থেকে বড় রাস্তায় নেমে আমরা দুজন যখন পাশাপাশি কারখানার দিকে এগোচ্ছি, সেই সময় মোড়ের রেস্তোরাঁ থেকে একদল যুবক বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকল বণ্টুকে।

: আরে বণ্টুদা যে। এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে ?

লোকগুলোর পোশাকপরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত এবং তারা কেউ আমাদের কারখানার লোক নয়। তবে দুই একটা মুখ চেনাচেনা লাগল। কোথাও না কোথাও আমি তাদের নিয়মিত দেখেছি। বণ্টু আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল।

: আমরা মাইরি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই বলে, বণ্টুদা কোথায় গেল ? তোমার বড়দাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি চটে উঠলেন। মেজদার

কাছে শুনলুম, তুমি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করছ। আমাদের কি এমন করে ভুলে যেতে হয় দাদা? তারপর কবে ফিরলে?

: এই দিন কয়েক হল।

: করালীদা খবর পাঠিয়ে আনিয়েছে বোধ হয়?—জিজ্ঞাসা করল রোগা ফরসা ছেলেটা।

: না, আমি নিজেই এসেছি।—আড় চোখে আর একবার আমার উপর দৃষ্টিপাত করল বল্টু।

: হেঁ হেঁ দাদা, এ কি আর আমরা বুঝি না। করালীদার সঙ্গে যতই তোমার মন কষাকষি হোক, বড় কাজে না ডেকে পারে কখনও? নইলে কোথাও কিছু নেই, ঠিক আজকের দিনে তুমি হঠাৎ এখানে আসবে কেন? ভালোই হয়েছে। তুমি থাকলে আমাদের আর ভাবনার কিছু থাকে না।

: তোরা কি বলছিস ঠিক বুঝতে পারছি না।

রোগা ফরসা ছেলেটা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল: সবই জান দাদা। আমাদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছ।

: সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। করালীদার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। এই ভোর বেলায় মির্জাপুর থেকে তোরা এখানে এসেছিস কেন বলতে পারিস?

: আমরা তো কাল রাত্তির থেকে আছি ভুবন বক্সীর বাড়ি। তুমি কিছু জান না?

: নাঃ।

: আজ থেকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্ট্রাইক হচ্ছে। পরশুদিন করালীদা আমাদের ডেকে ঘনশ্যাম জালানের কাছে পাঠিয়েছিল। কথা হয়েছে, আমরা কারখানায় কিছু লোক ঢুকিয়ে দেব। তার জন্য যদি মারপিট হয়, সেও ভি আচ্ছা।

: লোক কোথায় পাবি?

: হ্যাঁ, লোকের আজকাল অভাব আছে নাকি? টালিগঞ্জের রেফুজি কলোনি থেকে কাল তিন গাড়ি লোক এনে ভুবন বক্সীর বাড়িতে মজুত করে রাখা হয়েছে। তাদের নিয়ে এইবার আমরা বেরুব। যদি কোন শালা বাধা দিতে আসে, মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। মাল-ঝাল কিছু সঙ্গে আছে।

শুনে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। লোকগুলো আমাকে চেনে না। বল্টুর সঙ্গে আছি বলে ওরা আমাকে তার সঙ্গী মনে করেছে।

: কতজন আছিস তোরা ?

: মির্জাপুরের পাঁচজন আর ঠনঠনের তিনজন। তুমি যখন এসে পড়েছ যা হয় কর। আমাদের আর কোন দায়িত্ব রইল না।

বল্টু কয়েক মিনিট গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল: আমার কথা তোরা শুনবি ?

: এ সব কি বলছ বল্টুদা ? তুমি থাকতে তোমার কথার উপর কথা বলবে এত হিম্মত কার আছে ?—রোগা ছেলেটার কথায় বাকী সকলে সায় দিয়ে দিল।

বল্টু আরও কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থাকার পর বলল: তাহলে আমি বলি, তোরা এখান থেকে এখনই পাড়ায় ফিরে যা।

কথাটা যে ঠাট্টা নয় সেটা প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যেই। পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল তারা।

: কেলো, আমি কি বললাম বুঝতে পারছিস ?

রোগা ছেলেটা আমতা আমতা করে বলল: হ্যাঁ, মানে, তাহলে—করালীদা তাই বলে পাঠিয়েছে বোধ হয় ?

: না, করালীদা কিছু বলে পাঠায়নি। এ হল আমার অনুরোধ।

: তোমার অনুরোধ !—বিস্ময় প্রকাশ করল কেলো।

: হ্যাঁ ভাই। তোরা আমার ভাইয়ের মত। আমার কথায় তোরা অনেক ভালমন্দ কাজ করেছিস। আজ এই অনুরোধটা রাখ।

: কেন, ব্যাপার কি বলত ?

: ব্যাপার বুঝতে পারছিস না ? কারখানায় যারা কাজ করে তারা তোদের মতই গরীব লোক। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দুটো ভাতের যোগাড় করছে। তাদের পেছনে লেগে কোন বাহাদুরি আছে ? হিম্মত থাকে তো ঘনশ্যাম জালানের বিরুদ্ধে লড়ে যাও। তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষে সে ধান-চাল ব্ল্যাক মার্কেটে পাঠিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করেছে, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় জলের দরে লুটের সোনাদানা কিনে নিয়েছে আর এখনও প্রতিদিন এই কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকের রক্ত চুষে নিজের ভুঁড়ি বাড়াচ্ছে। এসব কথা কি তোদের অজানা আছে ?

ইতিমধ্যে কারখানার যাত্রী বহু লোক সেখানে এসে জমায়েত হয়েছে। রাস্তায় ভীড় বেড়ে যায় দেখে বন্টু তাদের পাশের মাঠে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর এক নাগাড়ে বক্তৃতা দিয়ে তাদের বোঝাতে লাগল যে, ঘনশ্যামের পক্ষ না নিয়ে আসলে তাদের উচিত শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা।

: দেশে দুরকম মানুষ আছে। গরীবলোক আর বড়লোক। তুই আমি গরীবের দলে। কারখানার শ্রমিক আমাদের পর নয়। তাদের মধ্যে আছে আমাদের ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন। এই তো আমার বন্ধু অশোক মিত্তির (বন্টু আমার কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টানল)। ইনি একজন লেখক— বই লেখেন আর এই কারখানায় কাজ করেন। তোরা কি বলতে চাস ঘনশ্যামের কথায় আমি ওঁর বুকে ছুরি বসাব? কখ্‌খনো নয় বরং ওঁকে বাঁচাবার জন্য আমি আমার জান দিতে প্রস্তুত আছি। কারণ উনি আমার ভাই, উনি আমার বন্ধু, উনি গরীব। গরীবকে গরীব না দেখলে কে দেখবে? তোরাও কেউ বড়লোক নোস। দুদিন বাদে তোদেরও তো কাজকর্ম করে খেতে হবে। তখন তোরাও এই শ্রমিকের কাজ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাবি না। আমিও আজকাল তাই করছি। সিমেণ্টের কারখানায় ক্রেন চালাচ্ছি। সেখানেও মালিকের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে। করালীদা বললে সেখানে গিয়ে তোরা কি আমার গলায় ছুরি দিতে পারবি? আর করালীদা লোকটাই বা কে? বড়লোকের দালালী করাই তার পেশা। আমাদের মাথায় পা দিয়ে মন্ত্রী হয়ে রাতারাতি বরাত ফিরিয়ে ফেললে। তুই আমি গুণ্ডা ছিলাম, গুণ্ডাই রয়ে গেলাম। এত দেখেও কি তোদের শিক্ষা হবে না রে?

উত্তেজিত বন্টু কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তার বক্তৃতা শুনে মাঠে প্রায় হাজার খানেক লোক জুটে গেছে। বন্টুর নাম সকলেই জানে। তাকে চোখে দেখে এবং তার বক্তৃতা শুনে সকলেই অবাক। ইতিমধ্যে কখন যে সিরাজুদ্দীন সাহেবও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি টের পাইনি। বন্টুর পুরানো সহচররা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বন্টুর যুক্তি তাদের মনে লেগেছে কিন্তু সে এরকম কথা বলছে কেন, তা তারা ভেবে উঠতে পারছে না।

দম নিয়ে আর একবার তাদের বোঝাতে আরম্ভ করল বন্টু। শেষে বলল: যদি তোরা আমার অনুরোধ না রাখিস, তাহলে এও জেনে রাখ, আমার বুকের উপর দিয়েই তোদের লোক নিয়ে কারখানায় ঢুকতে হবে। বোমা রিভলবার ছুরি ছোরা এনে থাকলে, সব চেয়ে আগে আমার উপর

তার মহড়া নাও। তারপর আমি মরে গেলে সেই লাশ মাড়িয়ে কারখানায় ঢুকো। তার আগে কিছুতে নয়।

বল্টু এমন অনুপ্রাণিত এবং দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করল যে অভিভূত হয়ে গেল শ্রোতারা। পেছন থেকে একদল লোক হাততালি দিয়ে বলে উঠল : সাবাস বল্টুবাবু। থ্রি চিয়ার্স ফর বল্টুবাবু।

সমস্ত ঘটনাটাই আমার কাছে কেমন স্বপ্নের মত লাগছিল। বল্টু যে এ রকম যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেলোর দল তখন একেবারেই হতভম্ব। বল্টুকে আড়ালে ডেকে তারা বহুক্ষণ ধরে কি পরামর্শ করতে লাগল।

সিরাজুদ্দীন সাহেব চাপা গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন : একে কোত্থেকে যোগাড় করলেন মশাই ?

: ও যে আমার পুরানো বন্ধু।—বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম আমি। আজ সত্যিই বল্টুর বন্ধুত্ব আমার কাছে গর্বের জিনিস হয়ে উঠেছে।

: আগে তো কই, সেকথা বলেন নি।

: এ আর বলবার কি! হ্যাঁ সিরাজুদ্দীন সাহেব, কারখানার গেটের খবর কি ?

: খুব ভাল। পুলিস আর দারোয়ান ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই। আমরা খবর পেয়েছিলাম, বস্তীবাড়িতে কিছু রেফুজি মজুত করা হয়েছে। গুণ্ডা দিয়ে তাদের ভিতরে ঢোকানো হবে। সেটা কি করে বন্ধ করা যায় তাই দেখবার জন্য সেই দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখি আপনি কাজ গুছিয়ে ফেলেছেন।

: হ্যাঁ, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। বল্ট আমার সঙ্গে ধর্মঘট দেখতে আসছিল। রাস্তায় ওদের সঙ্গে দেখা।

কেলোর দলের সঙ্গে আলোচনা করে বল্টু ফিরে আসতে না আসতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু লোক তাদের পেছন পেছন চলেছিল। বল্টু ধমক দিয়ে ফিরিয়ে আনল তাদের।

: ওদের পেছনে লাগছেন কেন ? ওরা ফিরে যাচ্ছে। আপনারা বস্তী-বাড়ি গিয়ে রেফুজিদের সেখান থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করুন।

ইউনিয়নের দুজন প্রবীণ কর্মীর নেতৃত্বে একদল লোক বস্তীবাড়ির দিকে

রওনা হয়ে গেল। আমি বল্টুকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে সিরাজুদ্দীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। সেখান থেকে যখন আমরা ইউনিয়ন অফিসের দিকে রওনা হলাম, তখন আমাদের পেছনে কয়েক শো লোক। সকলেই বল্টুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকলেই তাকে দেখতে চায়, তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

ইউনিয়ন আপিসের নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই একদল লোক একটা ফুলের মালা এনে পরিয়ে দিল বল্টুর গলায়। লজ্জা এবং আনন্দে বল্টু কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। দু মিনিট দাঁড়াতে না দাঁড়াতে তার জন্য চা সিগারেট চলে এল। সে এক জমজমাট ব্যাপার। একটি ঘটনায় বল্টু সত্যিই হিরো হয়ে উঠেছে কারখানার শ্রমিকদের কাছে। আমার বন্ধু হিসাবে সে এখানে এসেছে বলে আমারও সম্মান যেন বেড়ে গেছে।

সিরাজুদ্দীন সাহেব বললেন: বল্টুবাবু, আজ আপনি আমাদের জন্য যা করলেন, সত্যিই তার তুলনা নেই। আপনি না থাকলে আজ একটা রক্তারক্তি হবার আশঙ্কা ছিল। যে-কদিন ধর্মঘট চলে দয়া করে এখানে একবার পদধূলি দেবেন।

বল্টু তখন উদ্দীপনার সপ্তম স্বর্গে। সে যে একটা মহৎ কাজ করে ফেলেছে, সে বিষয়ে সে পূর্ণ সচেতন। বিনয়ের সঙ্গে বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। অশোকবাবু এর মধ্যে রয়েছেন। আমি কি চুপচাপ থাকতে পারি?

সকালের ঘটনা বাতাসের বেগে এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে দলে দলে লোক আসতে লাগল বল্টুকে দেখতে। কলকাতার একজন অতি কুখ্যাত গুণ্ডা হঠাৎ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করতে এসেছে শুনে সমস্ত এলাকায় চাঞ্চল্য পড়ে গেছে।

আমি জানতাম, বল্টু অসৎ কাজ অনেক করেছে কিন্তু মহৎ কাজ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ সে আগেও দিয়েছে। নতুন করে আর একবার দিল। চুলচেরা বিচার করে দেখতে গেলে এ কাজে খুব একটা বাহাদুরী নেই। দুষ্কর্ম থেকে দুষ্কৃতিকারীদের বিরত করা যুগান্তকারী কাজ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু এও ঠিক যে, বল্টু আধঘণ্টার মধ্যে অতি সুশৃঙ্খলভাবে যে দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করেছে, অন্য কেউ তা পারত না।

জালান সাহেব প্রথম দিনের ধর্মঘট ভাঙার যে প্ল্যান করেছিলেন, সেটা কেলোর দলের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বানচাল হয়ে গেল। বস্তীবাড়ির

বাইরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ভিতরের লোকেরা আর বাইরে বেরুতে রাজি হল না। আমাদের প্রথম দিনের স্ট্রাইক যোল আনা সফল।

সারাদিন ইউনিয়ন অফিসে বসে চা আর পাঁউরুটি খেয়ে কাটালাম। সন্ধ্যায় কারখানার পাশের ময়দানে জনসভা। ধর্মঘটের সাফল্যে সকলেই উৎসাহিত। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এমন ধর্মঘট আগে কখনও হয়নি। প্রত্যেকের বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্য থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠতে লাগল। মঞ্চের উপর একটা টিনের চেয়ারে বসে ছিল বল্টু। শ্রোতাদের মধ্য থেকে দাবি উঠল, বল্টুবাবুর কথা শুনবে। তখন বাধ্য হয়ে বল্টুকে বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হল।

ঃ সে কি বিপুল হর্ষধ্বনি। বল্টু কেলোর দলকে যা বলেছিল, বক্তৃতায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বসে পড়ল।

সভার শেষে খবর পেলাম, আইনসভায় শ্রমমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে গুরুতর অপরাধে কারখানার তিনজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করার পর থেকে সেখানে শিল্পবিরোধের সূচনা হয়। যে অপরাধের জন্য তিনজন ছাঁটাই হয়েছে, সে অপরাধ সত্যই অত্যন্ত গুরুতর। কাগজপত্র দেখে গভর্নমেণ্ট সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। শ্রমিকদের অন্যান্য দাবি-দাওয়ার ভালোমন্দ এখনও বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি সালিশীর সুযোগ থাকে, তাহলে সে চেষ্টা করা হবে।

ঃ এতদিন শ্রমদপ্তর সালিশীর চেষ্টা করেন নি কেন?—জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিরোধী দলের একজন নেতা।

ঃ শ্রমদপ্তরে ভয়ানক কাজের চাপ পড়েছে।

ঃ সে কাজ কি মালিকের সঙ্গে শ্রমিক-নিধন সম্পর্কে শলা-পরামর্শ?

ঃ নোটিশ চাই।

ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করালী বাঁড়ুজ্যে কি এ ব্যাপার শ্রমমন্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?

ঃ না, শ্রমমন্ত্রী নিজের বিবেক বুদ্ধিমত কাজ করেন।

ঃ বিবেকটা মালিকদের ঘরে বাঁধা পড়ে নি তো? (ব্যঙ্গধ্বনি) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধর্মঘট মীমাংসা না হলে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হবে তাক শ্রমমন্ত্রী জানেন?

ঃ হ্যাঁ, জানি।

: তাহলে সেই ধর্মঘট অবিলম্বে মীমাংসা করা একটা জরুরী কাজ নয় কি ?
: আজ্ঞে হ্যাঁ।
: কবে পর্যন্ত মীমাংসার চেষ্টা শুরু হবে ?
: পরিস্থিতি দেখে যা হয় স্থির করা যাবে।

পরদিন আবার বল্টুকে নিয়ে কারখানায় গিয়ে দেখি অবস্থা অপরিবর্তিত। সকাল থেকে নানারকম গুজব রটছে। একবার রটল, আজ পুলিশের লরীতে করে কারখানায় লোক ঢোকানো হবে। আবার শোনা গেল, কাল রাত্রে শ্রমমন্ত্রী নাকি জালানের সঙ্গে দেখা করে দু-ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেছেন। করালী বাঁড়ুজ্যেও নাকি জালানের বাড়ি গিয়েছিলেন। কৃপাল সিং লালবাজারে ছুটোছুটি করেছেন। স্ট্রাইকের পূর্ণ সাফল্য দেখে কর্তৃপক্ষ নাকি বেশ একটু চিন্তিত। এ সব উড়ো খবর সকলের মনে একটা মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু এর কোনটা যে সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে তা বোঝা গেল না। শুধু দেখা গেল, পুলিস লরীতে কারখানায় লোক ঢোকানোর কথাটা গুজবই। আজ আর সেই ধরনের কোন চেষ্টা হয়নি। সম্ভবত ব্ল্যাক লেগ সংগ্রহ করা যায়নি। স্ট্রাইক নিয়ে আইনসভা এবং সংবাদপত্রে এত আলোচনা হয়েছে যে কেউই আর ব্ল্যাক লেগের কাজ করতে রাজি হচ্ছে না।

বিকেলে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে পিয়নের মারফত একটা খামে মোড়া চিঠি এল ইউনিয়নের নামে। আজ ছটার সময় লেবার কমিশনার ইউনিয়নের দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক।

ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তখনই ট্যাক্সি করে রাইটার্স বিল্ডিং রওনা হয়ে গেলেন। আমরা তাঁদের ফেরার অপেক্ষায় ইউনিয়ন অফিসে বসে রইলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাঁরা ফিরে এসে বললেন, জালান নাকি শ্রমমন্ত্রীকে বলেছেন যে, তিনি প্রথম যে তিনজনকে ছাঁটাই করেছিলেন, তাদের আর কিছুতেই কাজে নেবেন না। তবে অন্য সকলের চার্জশীট প্রত্যাহার করতে এবং অন্যান্য দাবিদাওয়া সালিশীতে দিতে রাজি আছেন। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হলে ধর্মঘটের জন্য কাউকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না।

একশন কমিটির মিটিং-এ বহুক্ষণ বিতর্কের পর স্থির হল যে, এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিরোধের সমস্ত বিষয়গুলো যদি সালিশীতে দেওয়া হয় তবেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

রাত প্রায় দশটার সময় বাসায় ফেরবার জন্য আমরা যখন দল বেঁধে বাসের রাস্তার দিকে এগোচ্ছি, সেই সময় মোড়ের একটু আগে হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ করে আমাদের সামনে রাস্তার উপর একটা বোমা ফাটল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রাণের ভয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি শুরু করে দিলাম। তারই মধ্যে আরও দুটো বোমা ফাটার আওয়াজ এবং একটা ভয়ানক আর্তনাদ শোনা গেল। বল্টু সারাক্ষণ আমার পাশে পাশে আসছিল। আমি যখন ছুট লাগাই তখন সে যে কোন্ দিকে ছিটকে গেল তা লক্ষ্য করিনি। ষাট-সত্তর গজ দূরে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ঘটনাস্থল একেবারে ফাঁকা। শুধু রাস্তার মাঝখানে একটি লোক পড়ে আছে মড়ার মত। কেন যেন আমার মনে হল, সে বল্টু। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে এমন আগুন জ্বলে উঠল যে আমি প্রাণের ভয় ত্যাগ করে তখনই ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে।

যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বল্টু আর রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে। আতঙ্কে 'খুন খুন' বলে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠলাম। আওয়াজ পেয়ে এদিকে-ওদিকে ছিটকে-পড়া লোকেরাও এসে আবার জড়ো হতে লাগল। বোমার শব্দে কৌতূহলী হয়েও আশেপাশের বহু লোক এসে হাজির।

সবাই মিলে ধরাধরি করে তোলা হল বল্টুকে। প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পেটের কাছে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। সেখানে থেকে ঝলকে ঝলকে রক্তপাত হচ্ছে। আর কোথাও কোন আঘাত নেই। কেউ বললে আততায়ীরা ছোরা মেরেছে, কেউ বলল রিভলভার। আশেপাশের ডাক্তারখানাগুলো বন্ধ। প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা গেল না। পুলিসের একটা অয়ারলেস ভ্যানে করে আমরা তাকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

এমার্জেন্সীর টেবলে যখন তাকে শোয়ানো হল, তখন রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কিন্তু নাড়ী আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, বুলেটের আঘাত এবং সম্ভবত একটা বুলেট এখনও ভিতরে আছে। অপারেশন করে বার করতে হবে।

তত্ক্ষণে কারখানার প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক হাসপাতালে এসে হাজির হয়েছে। সকলেই বেশ বিভ্রান্ত। সারাদিন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার পর হঠাৎ রাত্রে এমন অতর্কিত আক্রমণ হল কেন? আর অন্য সকলকে বাদ দিয়ে গুণ্ডারা বল্টুকেই বা জখম করল কেন? সে তো আমাদের ইউনিয়নের কেউ নয়। ইউনিয়নের উপর আক্রোশ থাকলে তাদের উচিত ছিল সিরাজুদ্দীন অথবা তার মত গুরুত্বপূর্ণ অপর কারও উপর হামলা করা। তাঁরা সকলেই দলের মধ্যে ছিলেন। অথচ গুণ্ডারা সমস্ত আক্রমণটা চালাল যেন বল্টুকে লক্ষ্য করেই।

ব্যাপারটা আমার কাছে যতখানি রহস্যজনক, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মবিদারক। বল্টুকে আমিই কারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। আজকের এই দুর্ঘটনায় তার কোন ক্ষতি হলে পরোক্ষভাবে আমিই কিছুটা দায়ী হব। যদি বেঁচে যায়, তাহলে বাঁচলুম আর যদি মারা যায়, তাহলে বল্টুর আত্মীয়স্বজন এবং অনুরাধাদের কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু ঘটেছে সবই আমার একে একে মনে পড়তে লাগল। প্রথমদিন তাকে আমি নিছক সমাজবিরোধী মানুষ হিসাবেই দেখেছিলাম। ক্রমে ক্রমে তার চরিত্রের অন্য দিকগুলোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন সে নতুন জীবনের জন্য নিজের সঙ্গে নিজে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত। তারপর একদিন তার শুভবুদ্ধিই জয়ী হল। এখন সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। বল্টু আমার জীবনের স্মরণীয় ব্যক্তি। যে অনুরাধার ভালবাসা নিয়ে আমি আজ সুখকল্পনায় বিভোর হয়ে আছি, সে তো প্রকৃতপক্ষে বল্টুরই দান। সে আমায় সরকারদের সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিলে অনুরাধা চিরকাল আমার কাছে অজ্ঞাত থাকত। সরকার পরিবারে সে এসেছিল দেবতার আশীর্বাদের মত। আমার কাছে এসেছে পরম হিতৈষীরূপে। সে আমার জীবনে নারীর ভালবাসার দুয়ার খুলে দিয়েছে, আমাদের স্ট্রাইকের চরম বিপর্যয় ঠেকিয়ে দিয়েছে এবং এখন সে কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রাণ দিতে বসেছে। জানি না তার অতীত ইতিহাস কতখানি কালো তবে এখন সে যে ইতিহাস সৃষ্টি করছে তার উজ্জ্বলতায় অতীতের সমস্ত কালিমা ম্লান হয়ে যাবে না কি?

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে। অপারেশন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সকালে আবার ধর্মঘট। সিরাজুদ্দীন আমার হাতে একগোটা টাকা দিয়ে

বললেন : অশোকবাবু, দুজন লোক নিয়ে এখানে থাকুন, আমরা চলি। বণ্টুবাবুর চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ওঁকে কেবিনে রাখবার ব্যবস্থা করবেন আর দরকার হলে একজন নার্স দিয়ে দেবেন। এখানেই আপনার ডিউটি রইল। আজ আর ওদিকে যাবেন না। দুপুরে লেবার কমিশনারের সঙ্গে কথা আছে। যা হয় আপনাকে বিকেলে জানিয়ে যাব।

বেলা এগারোটার সময় ইন্‌ডোরের কেবিনে পাঠান হল বণ্টুকে। তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার বললেন, অবস্থা ভালর দিকে গেছে। বড় বেশি রক্তপাত হয়েছে বলেই ভয় ছিল।

বেলা সাড়ে বারোটার সময় বণ্টু হঠাৎ চোখ মেলে চাইল এবং মনে হল যেন আমায় দেখে একটু হাসবারই চেষ্টা করছে। আমার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

: করালীর কীর্তি অশোকবাবু।—অস্ফুটে বলল সে : এণ্টালীর নেড়াকে দিয়ে আমাকে মার্ডার করতে চেয়েছিল।

: আপনি কথা বলবেন না অমলবাবু। ওসব পরে শোনা যাবে।

: করালী বুঝেছে আমাকে দলে পাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। আমি তার বিরুদ্ধে কাজ করে ফেলেছি কি-না। তাই আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করেছিল।

বণ্টুর কথাগুলো ক্ষীণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেল। আবার সে জ্ঞান হারিয়েছে।

যে রহস্য এতক্ষণ আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য লাগছিল, এতক্ষণে সেই রহস্যের সমাধান হয়েছে। কালকের হামলায় বণ্টুই ছিল টার্গেট। করালীবাবু কেলোর কাছে বণ্টুর গতিবিধি জানতে পেরে খুব বে-সামাল হয়ে গেছেন। ঘনশ্যামের সঙ্গে তাঁর গোপন লেনদেনের কথাটা আইনসভায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেটা বণ্টুর কাজ বলে তিনি মনে করে থাকবেন। তাই বণ্টুকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান হয়েছিল।

আমাদের রিলিভ করবার জন্য সিরাজুদ্দীন সাহেব আরও দুজন লোক পাঠিয়েছেন কারখানা থেকে। তাদের বণ্টুর কাছে বসিয়ে রেখে আমরা স্নানাহার করতে বেরিয়ে পড়লাম।

বাসায় ফেরার পথে মনে হল, বণ্টুর দাদাদের খবর দেওয়া দরকার। অনুরাধাকেও। নইলে নিজের উপর বড় বেশি দায়িত্ব নেওয়া হবে। এমন

তেমন কিছু একটা হয়ে গেলে আফশোসের অন্ত থাকবে না। সবাই তখন সব কিছুর জন্য আমাকেই দায়ী করবে।

খেয়েদেয়ে সবে কাপড়জামা পরছি, এমন সময় সিরাজুদ্দীন এসে হাজির। রাইটার্স বিল্ডিং-এর আলোচনায় জালান নাকি শেষ প্রস্তাব দিয়েছেন যে, আমার প্রশ্ন ছাড়া আর সব প্রশ্ন তিনি সালিশীতে দিতে রাজি আছেন। আমাকে তিনি কিছুতেই চাকরিতে নেবেন না কারণ আমি 'মানীর মান' রাখতে জানি না। অর্থাৎ কারখানার ধর্মঘটটা এখন আমার ছাঁটাইয়ের প্রশ্নে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

: আমাকে বাদ দিয়েই আপনারা মীমাংসা করে ফেলুন।—বললাম আমি। বিরোধটা মীমাংসার পথে এতদূর এগিয়েছে দেখে মনে মনে হাল্কা বোধ করতে লাগলাম।

: ঠাট্টা করছেন ?

: আজ্ঞে না। শশী মোহান্তির মত আমিও বিলেতে চাকরি পেয়েছি। প্রকাশ করলে পাছে ধর্মঘটের মোরেল নষ্ট হয়, সেই ভয়ে এতকাল চুপ করে ছিলাম। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমি আর চাকরি করব না। ধর্মঘট মিটে গেলেই ছেড়ে দিতাম।

: তাই নাকি ?

: হ্যাঁ, তাই। এই দেখুন আমার নিয়োগপত্র।—স্যুটকেশ খুলে তাকে দেখিয়ে দিলাম কাগজপত্রগুলো।

সিরাজুদ্দীন একটু ভেবে বললেন : আপনি যদি সত্যিই চাকরি ছাড়তে চান, তাহলে আপনাকে বাদ না দিয়েও একটা মীমাংসা হতে পারে।

: কি রকম ?

: আমি গিয়ে প্রস্তাব করি, আপনার ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহার করে আপনাকে পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হোক। তাহলে দুপক্ষের পাল্লাই সমান থাকবে। এটা যখন নিছক সম্মানের প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এইভাবে মীমাংসা হওয়াই ভালো। চলুন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ঘুরে আসি। আশা করা যায় আজই ধর্মঘট মিটবে।

অনুরাধাদের বাসায় যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ির দারওয়ানকে আট আনা বকশিস দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম :

অনুরাধা,

গতকাল রাত্রে এক গুরুতর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অমলবাবু ক্যাম্পবেলের সার্জিকাল ওয়ার্ডের তিন নম্বর কেবিনে আছেন। এখনও ভাল করে জ্ঞান ফেরেনি। একবার গিয়ে দেখে এলে ভাল হয়। পাঁচটার সময় সেখানে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

—অশোক

বেলা চারটের সময় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে হাসপাতালে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার। বল্টু অবসন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তার নাকে অক্সিজেনের সিলেণ্ডার। মাথার কাছে মিসেস সরকার কাঁদোকাঁদো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর অনুরাধা তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ঘরের ছবি দেখে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

শুনলাম, আমি চলে যাবার কয়েক মিনিট বাদে বল্টু হঠাৎ ঘুমের ঘোরে দারুণ চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে নার্সকে ডেকে আনা হয়। নার্স নিয়ে আসেন হাউস সার্জনকে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে বল্টুর ক্ষত থেকে নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছে। তখনই ব্যাণ্ডেজটা বদলে দেওয়া হয় এবং সেই থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তার কিছুক্ষণ বাদে একটা ট্যাক্সিতে করে আসেন মহিলারা। গাড়ির মধ্যেই কাঁদোকাঁদো অবস্থায় ছিলেন। ভিতরে ঢুকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

হাউস সার্জনের কাছে গিয়ে শুনলাম, অবস্থাটা নাকি সত্যিই একটু খারাপ হয়ে পড়েছিল। সামলে নিয়েছে। রাত্তিরটা ভালোয় ভালোয় কাটলে সকালে আর বিশেষ ভয় থাকবে না।

কেবিনে ফিরে আসতেই মিসেস সরকার চাপা গলায় উদ্বিগ্নভাবে বললেন : কি হবে অশোক? আমার বড় ভয় লাগছে।

: ভয়ের কি আছে? ডাক্তার তো বললেন, উনি অনেক ইমপ্রুভ করেছেন।

: তাহলে ওটা কেন?—অনুরাধা আমার দিকে তাকিয়ে অক্সিজেন সিলেণ্ডারে আঙুল দেখাল। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। আর সারা মুখময় অশ্রুর দাগ।

: ওটা ওঁর আরামের জন্য। রোগীর ঘরে এ রকম কান্নাকাটি করা ঠিক নয়। আপনারা বরং কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে একটু সুস্থ হোন।

মিসেস সরকার অনুরাধার হাত ধরে বাইরে সরিয়ে নিয়ে এলেন। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, সেটা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম তাঁদের কাছে। অনুরাধার কান্না যেন কিছুতেই থামতে চায় না। মিসেস সরকার কাঁদছেন না বটে তবে তাঁরও মুহ্যমান অবস্থা।

: চিকিৎসায় যেন কোন ত্রুটি না হয় অশোক। টাকাকড়ি যা লাগে আমার কাছ থেকে নিয়ো। যেভাবে হোক ওকে সুস্থ করে তুলতেই হবে।

: কোন ত্রুটি হবে না। সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয়ে গেছে। কারখানা থেকে দলে দলে লোক আসছে বল্টুকে দেখতে। ধর্মঘট মেটার সম্ভাবনায় সকলের মনই অনেকটা ভারমুক্ত। বল্টুর জন্য কেউ ফুলের তোড়া এনেছে, কেউ বা ফলের টুকরি। সকলেই তাকে ভালবাসা জানাতে চায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। অনুরাধা আর মিসেস সরকারকে কারখানার লোকেরা ধরে নিয়েছে বল্টুর মা আর বোন বলে। তাই প্রত্যেকেই তাঁদের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাদের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে প্রায় দেবতার পর্যায়ে উঠে গেছে বল্টু। এতগুলো মানুষের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে যে প্রাণ দিতে বসেছে, সে যে সকলের কাছে অতি-মানুষ হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

ব্যাপার দেখে অনুরাধা এবং তার মা দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। সম্ভবত গোড়ায় তাঁরা ভেবেছিলেন, বল্টু কোথাও গুণ্ডামি করতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে। আমার কাছে অন্য কাহিনী শুনে কতটুকু বিশ্বাস করেছিলেন জানি না। এখন আর অবিশ্বাসের কোন অবকাশ রইল না। এত লোকের সমবেদনা এবং সহানুভূতিতে তাঁদের ভীতি-বিহ্বলতা অনেক কেটে গেছে। আজ বল্টুর মা-বোন হয়ে তাঁরা মনে মনে আমার মতই গর্ববোধ করছেন বলে মনে হল।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাবার পরও অনুরাধা বাসায় ফিরতে রাজি হল না। বল্টুর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সে কিছুতেই হাসপাতাল থেকে নড়বে না। মিসেস সরকারও দেখলাম মেয়ের পক্ষে। তাঁর নিজেরই এখানে থাকবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাড়িতে মেয়েকে একলা রেখে এখানে থাকতে অসুবিধা আছে ভেবে মেয়েকেই তিনি এখানে রাখতে চান। অগত্যা তাঁদের সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হল।

বল্টুকে নার্স আর অনুরাধার জিম্মায় রেখে আমি কারখানায় চলে

গেলাম। সেখানে আজ মস্ত মিটিং। মীমাংসার শর্তগুলো সকলকে জানিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কাল থেকে আবার কারখানায় মেসিন চলবে। বিরোধের বিষয়গুলো সব সালিশে দেওয়া হয়েছে। তার রায় না বেরুনো পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। ধর্মঘটের তিনদিন কাটা যাবে প্রিভিলেজ লিভ থেকে। শ্রমিকদের কোন আর্থিক ক্ষতি সইতে হবে না। বল্টুর চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের সমস্ত খরচ দেবে ইউনিয়ন। হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে একদিন শ্রমিকদের সভায় তাকে সম্বর্ধনাও দেওয়া হবে।

রাত প্রায় দশটায় কারখানা থেকে ফেরবার সময় মনটা কেমন উদাস এবং অতীতমুখী হয়ে উঠল। এতদিনে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে সত্যিই আমার সম্পর্ক চুকে গেল। আর কোনদিন সেখানকার যন্ত্রপাতিতে আমি হাত দেব না। আমার প্রথম যৌবনের অনেক সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই কারখানার সঙ্গে। শেষ কয়েকদিনের ঘটনা তো অবিস্মরণীয়।

হাসপাতালের গেটে গিয়ে পৌছলাম রাত সাড়ে দশটায়। কে জানে বল্টু কেমন আছে। অনুরাধা সত্যিই ভেঙে পড়েছে। তার মনটা বড় কোমল এবং স্নেহপ্রবণ কিনা।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কেবিনে ঢোকবার আগে কাঁচের জানলা দিয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ঘরে নার্স নেই। অনুরাধা বল্টুর মাথার কাছে বসে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বাঁ হাত বল্টুর মাথার চুলের মধ্যে আর ডান হাত বল্টুর গলার উপর তার হাতের তলায় চাপা। অনুরাধার চোখেমুখে স্বস্তির স্নিগ্ধতা। সেবার মধ্যেই মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য স্বর্গীয় সুষমায় আত্মপ্রকাশ করে। অনুরাধার এই সেবাপরায়ণা ধ্যানমগ্ন শ্রী আমাকে বেশ কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল। কিন্তু আমি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠে যেভাবে হাত দুটো টেনে নিয়ে সসঙ্কোচে মুখ নীচু করল তাতে আমি কেমন হতভম্ব হয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তে আমরা দুজনই নির্বাক। শুধু লক্ষ্য করলাম, অক্সিজেনের সিলেণ্ডারটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বল্টু বেশ স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রামগ্ন।

: অমলবাবুকে একটু ভালো দেখাচ্ছে। তাই না?

অনুরাধা ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল : হ্যাঁ, একটু ভালো। আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরেছিল। ডাক্তার দেখে বললেন, ভালোই। একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

: অথচ তুমি তো কেঁদেকেটে একসা করছিলে।—হাল্কা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলাম আমি : নার্স কোথায় ?

: খেতে গেছেন। এক্ষুণি আসবেন।

: সে এলে তুমি বাসায় ফিরে চল। এখন তো ভয়ের কিছু নেই। সকালে না হয় আবার এসো। তোমারও তো খাওয়া হয়নি ?

: আমার ক্ষিধে নেই। মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন, খেতে পারলাম না। আমি আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকব।

: তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

অনুরাধা মুখ নীচু করে রইল। তার অনিচ্ছা দেখে আমি আর পীড়াপীড়ি করতে চাইলাম না।

অনুরাধা বলল : বরং আপনি আজ বাসায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন। শুনলাম আজ দুদিন খুব খাটুনি গেছে।

: ঠিক আছে। তুমি থাক, আমি যাই। কাল সকালে এসে তোমায় নিয়ে যাব।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে মনের একটা তার কোথায় যেন আলগা বোধ করতে লাগলাম। বহুদিন ধরে বহু আশা করে মনের মধ্যে কি যেন একটা গড়ে তুলেছিলাম। হঠাৎ তার ভিতটা দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু সে যে কি, তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। মনটাই শুধু অস্থির হয়ে রইল।

কারখানার ধর্মঘট মিটে গেল। বল্টুও ভালোর দিকে। এবার আমার নতুন জীবনের পথে পদক্ষেপ। তবু কেন এই হতাশাবোধ ?

অনুরাধা আমাকে দেখে ওভাবে চমকে উঠল কেন ? এ প্রশ্নে নিজেই নিজের কাছে বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

আমি কিছু হারিয়েছি কি ? কই তেমন তো কিছু খুঁজে পাই না। একি আমার জীবনের গতি পরিবর্তনের প্রারম্ভিক নার্ভাসনেস।

ঘুম এল ভোর রাতে। দরজার কড়ানাড়া শুনে যখন জেগে উঠলাম, তখন বেলা নটা বাজে। হোটেল থেকে বয় এসেছে আমি খাব কিনা জানতে।

সকালে হাসপাতালে যাবার কথা ছিল। অনুরাধা নিশ্চয়ই আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। মুখ হাত ধুয়ে সোজা সেখানে চলে গেলাম।

অনুরাধা ফিরে গেছে। বল্টু বেশ সুস্থ। নার্স তার সামনে চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। এগারোটার সময় নতুন নার্সের হাতে তিনি বল্টুর ভার দিয়ে বিদায় নেবেন। আমাকে দেখে বল্টু ভারী খুশি। একটু বাদেই ভিজিটিং সার্জন তাকে পরীক্ষা করতে এলেন। নাঃ, আর কোন ভয় নেই। বল্টুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার দাদাদের খবর দিতে হবে কি-না। সে রাজি হল না। মিছিমিছি লোকগুলোকে উদ্বিগ্ন করে লাভ কি?

যথাসময়ে দ্বিতীয় নার্সও এসে পড়ল। বল্টু আমায় বলল: অশোকবাবু আপনিও এবার বাসায় ফিরে যান। কদিন আপনার বড্ড খাটুনি গেছে।

: বাসায় যাব?

: হ্যাঁ, যান। অনুরাধা খেয়েদেয়ে এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া নার্স তো রইলই।

আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত। তাই তার কথা মেনে নিলাম। দুপুরে কারখানা নেই। কষে ঘুম লাগাতে হবে।

ফেরার পথে হাসপাতালের গেটের কাছে রাত্রের নার্সের সঙ্গে আবার দেখা হল আমার। তিনি বাসায় ফিরছেন।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম: কাল রাত্রে আপনার খুব কষ্ট গেছে বোধ হয়?

ভদ্রমহিলা একটু সময় নিয়ে মুচকি হেসে বললেন: নাঃ রোগীর জন্য বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। মরফিন দেওয়া ছিল। সারারাতই তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। তবে রোগীর ইয়েকে সামলাতে—মানে বুঝতেই তো পারছেন—এ সব এমোশ্যানাল অ্যাফেয়ারস্—

ভদ্রমহিলা যা বলতে চাইলেন তাতে তাঁকে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করতে আমার সাহস হল না।

অবশ্য পরে ভেবে দেখলাম, আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি আমার সামনেও কিছু কম প্রকাশ করেনি অনুরাধা। সেটা অপরিচিত লোকের চোখে যেমনই লাগুক আমার কাছে তো অস্বাভাবিক লাগেনি। শুধু একটি জিনিসে আমার মনটা খচখচ করেছিল। অনুরাধা আমাকে দেখে চমকে উঠে বল্টুর গা থেকে হাত সরিয়ে নিল কেন? কিন্তু তারও একটা ব্যাখ্যা আছে। হয়তো সে

ভেবেছিল অপরিচিত কেউ ঘরে ঢুকছে। তার কাছে অমন অন্তরঙ্গ ভাবটা দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। তাই সে অমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। যাক, এ নিয়ে আবোলতাবোল ভেবে ঘুম নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে দেখি আজও কারখানা থেকে বহু লোক বল্টুকে দেখতে এসেছে। করিডরে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে হাসিখুশি হয়ে গল্প করছে অনুরাধা। বল্টুর মাথার কাছে বসে রয়েছেন মিসেস সরকার। উন্নতি দেখে সকলের মনেই একটা খুশির ভাব।

অনুরাধার সঙ্গে আজ একটু নিজের কথা আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কোথায় যেন আটকাল। কেন জানি না, অনুরাধার দিকে তাকাতেই আমার কেমন সঙ্কোচ লাগছিল। দেখলাম সে-ও আমার দিকে ঘেঁষছে না। দুই একবার চোখাচোখি হয়েছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে চোখ নামিয়ে নিল। সম্ভবত বল্টুর এতবড় দুর্ঘটনার পটভূমিকায় আমাদের নিছক ব্যক্তিগত কথাগুলো একটু বে-মানান।

এরপর দুটো দিন হাসপাতালে অনুরাধার সঙ্গে আমি যেন লুকোচুরি খেললাম। যতবার দেখা হয় ততবার পরস্পরকে পাস কাটিয়ে যেতে চাই। অন্যদের সঙ্গে সে বেশ হাসিখুশি হয়ে কথা বলে। আমার সামনে পড়লেই গম্ভীর হয়ে যায়। এই পারস্পরিক সঙ্কোচের কারণটা আমি নিজেও খুঁজে পেলাম না।

কারখানার দেনাপাওনা মিটে গেছে। পাসপোর্টের ফর্ম এনেছি। কলকাতায় আমার আর বিশেষ কোন কাজ নেই। বল্টুকে আগামী কাল মিসেস সরকারের বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে। তার ক্ষত শুকিয়ে যাচ্ছে। একবার বেনারস থেকে ঘুরে আসা দরকার।

তার আগেই অনুরাধার সঙ্গে শেষ কথাটা সেরে নিতে হবে। তাই সেদিন আমি মরীয়া হয়ে তাকে বললাম: অনুরাধা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। পরশু সকালে একবার আমার বাসায় এসো।

মুখ নীচু করে এমনভাবে সে মাথা নাড়ল, যাতে আমার মনে হল, পরশু সকালে সে আসবে।

পরদিন সারা সকাল আমি পাসপোর্টের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। বিকেলে বল্টু হাসপাতাল ছাড়বে। কারখানা থেকে বহু লোক আসবে তাঁকে সাহায্য করতে। আমিও থাকব। তখন অনুরাধাকে আর একবার স্মরণ

করিয়ে দেব কালকের এপয়েন্টমেন্টটা। পাকা কথা হয়ে গেলে কালই বেনারসে রওনা হয়ে যাব। সপ্তাহখানেক সেখানে থেকে ফিরে এসে বিয়ের প্রস্তাব তুলব মিসেস সরকারের কাছে। ততদিনে বন্টুও সুস্থ হয়ে উঠবে এবং এসব কথা বলায় আর কোন সঙ্কোচ থাকবে না। অনুরাধা, ইংল্যাণ্ড, বেনারস সব মিলিয়ে মনটা আমার সারাদিন চঞ্চল হয়ে রইল।

বিকেলে হাসপাতালে বেরুবার জন্য নীচে নেমে দেখি চিঠির বাক্সে একটা এনভেলপ পড়ে আছে। মেয়েলী হাতে লেখা তিন পৃষ্ঠার একটা চিঠি। তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষে অনুরাধার স্বাক্ষর। মুহূর্তেই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে ছুটতে লাগল। চিঠিটা নিয়ে আবার উপরে উঠে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম অনুরাধার বক্তব্য :

> একদিন অনেক চেষ্টা করেও মনে মনে তোমায় আয়ত্ত করতে পারিনি। তাই রাগ করে অহঙ্কারী বলেছিলাম। আসলে সে আমারই অহঙ্কার। নিজের কাছে কোথাও যদি তোমাকে একটু ছোট করে দেখতে পারতাম, তাহলে অনেকদিন আগেই এই খেলার শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা পারলাম না। খেলার নেশায় মত্ত হয়ে খেলা ভাঙার সময় উত্তীর্ণ করে দিলাম।
>
> অসুখের সময় মন অতীতমুখী হয়েছিল। বিবেক উল্টো গেয়েছিল। পিছু হটব বলে তোমায় সতর্ক করেছিলাম। তুমি ভুল বুঝে দ্বিগুণ উৎসাহে আমায় আঁকড়ে ধরলে। পালাবার পথ পেলাম না। হয়তো পালাবার ইচ্ছাও ছিল না। অবশেষে সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে চিরকালের মত তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাধা পড়ল। অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন অতীত এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝখানে। বিবেক আবার উল্টো গাইল।
>
> প্রকৃতপক্ষে আমি কারও বাগদত্তা নই। কিন্তু ছেলেবেলায় একজনকে আমি মনে মনে বিয়ে করেছিলাম। অমলের কাছে সেই আমার অনুচ্চারিত বাগদান। মা তাকে দেখেছিলেন দেবতার আশীর্বাদের মত। আর আমি পরিবারের সেই পরম হিতৈষী মানুষটাকে বয়ঃসন্ধির চোখে দেখেছিলাম সাত সমুদ্র তের নদী পেরুনো বীর রাজপুত্রের রূপে।
>
> ছেলেবেলায় পুতুলের বিয়ে দিয়ে শাশুড়ী সেজেছি। বয়ঃসন্ধিতে

জীবন্ত মানুষের বউ সেজে মনে মনে নতুন করে পুতুল খেলেছি। অমলকে স্বামী কল্পনা করে তার স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। স্বয়ং 'স্বামীও' অবশ্য জানতে পারেনি যে তার একটি "সাধ্বী স্ত্রী" আছে এবং সে তার ভালোমন্দে আগ্রহশীল। ক্রমে বয়স এবং বুদ্ধি বাড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে অমলের চরিত্রের নোংরা কালো দিকগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। স্বামী বয়ে গেলে সাধ্বী স্ত্রীর বুকে কতখানি বাজে তাও আমি সমস্ত বেদনা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়। তাই মরীয়া হয়ে লেগে গেলাম তাকে শাসন এবং শোধন করতে। তাতে পারস্পরিক বিরূপতাই বাড়ল। লাভ কিছু হল না। মন ভেঙে যেতে বসেছিল। এমন সময় তুমি এসে নতুন আশার আলো দেখালে। ভাবলাম তোমার সংস্পর্শে ও শুধু ভদ্র হোক, সভ্য হোক, সমাজে সম্মানীয় নাগরিক হোক। তাহলে আমার আর কিছু চাইবার থাকবে না। দাম্পত্য-জীবনের বাকীটুকু আমি নিজেই পূরণ করে নেব নিজের কেরিয়ার দিয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে কখন যে তোমার সঙ্গে নতুন খেলায় মেতে উঠেছি তা আমি নিজেও টের পাইনি।

সেদিন জানতে চেয়েছিলে, তোমায় কোনদিন ভালবেসেছি কিনা। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজ একটু কঠিন। ভালোই যদি না বাসব তাহলে সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলতে গিয়েছিলাম কিসের জোরে? যেদিন তোমায় সঙ্গে বোটানিক্সে যাই, সেদিন কে যেন অবিরত আমার কানে কানে বলেছিল, আজ আমার জীবনে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি আমি নার্ভাস হয়ে ছিলাম। তোমার কাছাকাছি যেতে ভয় ভয় লাগছিল বলে সারাক্ষণ মিসেস ঘোষের বাচ্চাটাকে নিয়ে দূরে দূরে থাকছিলাম। শেষে কিছুই হল না বলে ফেরার পথে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। তুমি যখন আমাকে তোমার বাসায় আমন্ত্রণ করলে তখন আবার আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম।

সেদিন যা ঘটেছে তার দায়িত্ব তোমার চেয়ে আমার কিছু কম নয়। সেজন্য তোমার কাছে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাইছি।

গত কয়েকদিন দিবারাত্রি ভেবে ভেবেও আমি কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। একদিন নিজেকে নিজেই যার হাতে সম্প্রদান করেছিলাম, আজ নিজেকে আবার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে নিজের কাছে, নিজে যে কত ছোট হয়ে যাব তা ভেবে আত্মগ্লানিতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। সেই অপরাধী মন নিয়ে কোন দিন আমি তোমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও?

—অনুরাধা

চিঠিটা কতক্ষণ ধরে পড়েছিলাম জানি না। যখন সম্বিত ফিরে পেলাম তখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চিঠির ভালো-মন্দ সঙ্গতি-অসঙ্গতি সবই আমি বিশ্লেষণ করেছি কিন্তু তা আর এখানে প্রকাশ করতে প্রস্তুত নই। আশাভঙ্গে মানুষ সাময়িকভাবে অতি নীচ হয়ে যায়। আমি অতি-মানুষ নই। কাজেই আমার মনটাও অতি নীচু সুরে বাঁধা পড়েছিল।

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ বন্টুকে হাসপাতাল থেকে মিসেস সরকারের বাসায় নিয়ে যাবার কথা। সে কাজটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সুসম্পন্ন হয়েছে। সেখানে আমার অনুপস্থিতি কারও দৃষ্টি এড়ায় নি এবং তাতে একজন নিশ্চয়ই ভাবছে এটা তার চিঠির প্রতিক্রিয়া। নিশ্চয়ই তাই ভাবছে। সে তার ভ্রান্ত ধারণা। সেখানে সে নিজেরই মনের ছায়া দেখবে। সহস্র আশাভঙ্গেও আমি অত নীচে নামতে পারব না। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য যে সে কথা আজ কেউ বিশ্বাস করবে না। না করুক। কলকাতার সঙ্গে আজই আমার সম্পর্কের ইতি।

ঘড়ি দেখলাম। দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়তে এখনও চারঘণ্টা বাকী। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে ট্যাক্সি ধরে চলে গেলাম নিরঞ্জন সেনের বাসায়। তিনি আমার এই আকস্মিক আবির্ভাবে একটু বিস্মিত হলেন।

ঃ আমি বিলেতে চাকরি পেয়েছি নিরঞ্জনবাবু। আজ বাবার কাছে বেনারস যাচ্ছি। বাসাটা ছেড়ে দিলাম। ডুপ্লিকেট চাবিটা আপনাকে দিতে এসেছি। আমার বইগুলো আপনি নিয়ে নেবেন আর ফাড়কের কাছে চিঠি লিখে বাসার একটা বিলিব্যবস্থা করবেন। একমাসের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া আছে।

ভালো লাগল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে পারলাম না। তবে ভয়ও আছে। কলকাতায় গিয়ে আমার সম্বন্ধে ওঁরা কি শুনেছেন কে জানে। সে সব কথা উঠলে বিব্রত বোধ করতে হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জলী বললেন: মনে মনে আপনাকে কত খুঁজছি। এমনভাবে এখানে পেয়ে যাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

: হঠাৎ আমায় এত খোঁজাখুঁজি কেন? —ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

: বা রে, লোকে আত্মীয়-বন্ধুর খবরাখবর নেবে না? আপনি যে একেবারে বোকা-হাবা হয়ে গেছেন দেখছি।

যাক বাঁচা গেল। কৌতূহলটা তাহলে নিতান্তই সাধারণ।

রাস্তায় একবারও অনুরাধার কথা ওঠেনি। কিন্তু পাছে তার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ওঠে সেই আশঙ্কায় ভুগতে ভুগতে আমি নিজেই অতিমাত্রায় অনুরাধা-সচেতন হয়ে উঠলাম। ফাড়কেদের সঙ্গে অনুরাধার স্মৃতি এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যে একটার পেছনে আর একটা আসতে বাধ্য। গত দেড়মাস ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে করে অনুরাধাকে একেবারে মনের নীচের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ফাড়কেরা আবার তাকে মনের উপর তলায় তুলে আনলেন। তাঁদের বিয়ের দিনের সমস্ত চিত্রটা চোখের উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাকে এমন অন্যমনস্ক এবং ধ্যানপরায়ণ করে তুলল যে আমি তাদের কথার জবাব ঠিকমত দিতে পারছিলাম কিনা সন্দেহ।

ফাড়কের দাদার বাসা সহরতলীতে। সেখানেই কাটল সন্ধ্যাটা। দেখলাম, অঞ্জলী বারবার অনুরাধার প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে মাঝপথে পিছু হঠছেন। তাঁকে এত বুদ্ধিমতী, চটপটে, সুখী এবং সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে যে বিয়ের রাতের অঞ্জলী বলে মনেই হয় না। নিজের কৌতূহল সম্বন্ধে তাঁর সংযম দেখে মনে মনে তাঁকে প্রশংসা করলাম।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে বসে যখন সিগারেট টানছি, তখন মিসেস ফাড়কে জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি বিলেতে যাচ্ছেন কেন?

: ভালো মাইনের লোভে।

: টাকাই কি সব?

: সব নয়, অনেক।

: সেখানে গেলে বই লেখা—

: বই লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

: কেন ?

: কারণ সময় নষ্ট করে লাভ কি ? সমাজে লেখকের কোন সম্মান নেই, সম্মান আছে টাকার। সম্মানীয় নাগরিক হতে গেলে আগে টাকার যোগাড় রাখা দরকার। লিখে অর্থ উপার্জনের সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই।

: টাকা টাকা টাকা। বাব্বা, টাকার ধান্ধায় আপনার মাথাটাই না খারাপ হয়ে যায়। দেশের জন্য এতটুকু দরদ নেই ? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না, আর আপনি এখন বিদেশের সেবা করতে চললেন ?

: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোথায় ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না তা আমার জানা নেই। কলকাতায় বহু ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান বেকার বসে আছে। তারা দেশ গড়ার কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চায় কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। যাকে দরদ দেখাবে, সে যদি বে-দরদ হয়, তাহলে কি করা যায় বলুন।

: কতদিন থাকবেন সেখানে ?

: আপাতত তিন বছরের কনট্রাক্ট। ওটা আরও বাড়ানো যাবে।

: তাহলে কি করে কি হবে ?

: কিসের কি হবে ?

ফাড়কেরা পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল।

: আপনি কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছাড়লেন কেন অশোকবাবু ? —মিসেস ফাড়কে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন : আপনি আর আগের মত নেই। আপনার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হয়েছে।

কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। আমি জবাব দিলাম না।

: মিসেস সরকার আপনার কথা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। অনুরাধা আমাদের সামনে মাথা হেঁট করে মুক হয়ে বসেছিল। তার মুখে আগের সেই সারাক্ষণের হাসি নেই। সে যেন বিষাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ভেবেছিল, আমাদের কাছে আপনার ঠিকানা আছে। নেই জেনে তার মুখখানা আরও কালো হয়ে গেল। কি এবং কেন জিজ্ঞাসা করে আর আপনাকে বিব্রত করতে চাইনা। ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। তবু বলব ঘটনাটা অন্যরকম ঘটলেই আমরা সুখী হতাম।

আমি নীরব হয়ে রইলাম। কথা বললেই কথা বাড়বে। কৈফিয়ত না দিলেও যখন কিছু আসে যায় না, তখন না দেওয়াই ভালো।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দশটা বাজে। এবার হোটেলে ফেরা দরকার।

: গিয়েই চিঠি লিখবেন কিন্তু।

: লিখব।

: আমাদের কথা মনে থাকবে তো ?

: থাকবে।

রাস্তায় বেরিয়ে তাঁরা আমায় ট্যাক্সি ধরিয়ে দিলো।

রাত্রে হোটেলের বিছানায় শুয়ে একটা নিদারুণ শোক এবং ক্ষোভানুভূতিতে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল। সত্যিই তো, আত্মীয়-স্বজন ভাইবন্ধু দেশ-গ্রাম ছেড়ে আমি ইংল্যাণ্ডের সেবা করতে চলেছি কেন ? অঞ্জলী বলেছে, আমার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হয়েছে। কথাটা মিথ্যা নয়। আসলে আমি আমার এতকালের চরিত্রটা হারিয়ে বসে আছি। পোশাক-পরিচ্ছদ আরাম আয়েসের দিকে খুব একটা লোভ কোনকালেই ছিল না। ভেবেছিলাম আর্থিক দুঃখ দৈন্য যা আছে থাক। লেখক হিসাবে গণ মানুষের একটু ভালবাসার আসন পেলে, সেই হবে আমার পরম সার্থকতা। কিন্তু একটা দমকা হাওয়ায় জীবনের সমস্ত ধ্যানধারণা কত অনায়াসে ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরানো বাঁধন ছিঁড়ল, নতুন অবলম্বন শূন্যতায় নিষ্ফল হয়ে উঠল। ভালো চাকরি, ভালো মাইনে, ভাল থাকা, ভালো পরার সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার চিরাচরিত চক্রেই আমাকে ঘুরপাক খেতে হবে। এতকালের লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মিক প্রশান্তি সবটুকুই আমি খুইয়ে বসেছি। এখন আর আমার কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রইল না। এর জন্য আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। মন কোন অদৃশ্য এবং আমোঘ শক্তির উপর সেই দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। ভূত ভগবান হাঁচি টিকটিকি বিশ্বাসের কুসংস্কার আমার নেই। আমি পৃথিবীর অনেক সত্যের স্বরূপ জানি। না-জানার ভান করে নিজের বোঝা অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে আত্মসন্তুষ্ট হব কোন লজ্জায় ?

অনুরাধাকে লাভ করবার আশায় সমস্ত অতীতকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে বিলেতে চাকরি নিয়েছিলাম। অতীতের বাঁধন-ছেঁড়া আমি এখন সম্পূর্ণ

উদ্দেশ্যহীন পথের নিরুদ্দেশ পথিক। অনুরাধাকে না পাওয়ার হতাশাবোধ আমাকে যতখানি দমিয়ে দিয়েছিল, আজ নিজের চরিত্রহানির গ্লানি তার থেকে হাজার গুণ বেশি দমিয়ে দিল।

সারারাত আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পরদিন বিকেলে মালপত্র কাস্টম্‌স্‌-এ চেক করিয়ে যখন জাহাজে উঠব উঠব করছি, ঠিক সেই সময় পিঠে একটা চাপড় পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি ফাড়কে।

: এই যে মিত্তিরমশাই। তাহলে সত্যিই চললেন?

: হ্যাঁ। আপনি বিদায় দিতে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ।

: না এসে পারলাম না।—ফাড়কে মুখে হাসি টানল: কাল আপনাকে মোটেই সুস্থ দেখিনি। খুব ভেঙে পড়েছেন বলে মনে হল। ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হয়েছে কি-না জানি না তবে আপনার spirit নষ্ট হয়েছে। অনুমান করছি, মিস সরকারের সঙ্গে আপনার চিরকালের মত বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু সেটাকে এত বড় করে দেখবার কি আছে? আফটার হল, জীবনটা হারজিতের খেলা বই আর তো কিছুই না। Be a sportsman, তাহলে দেখবেন, আপনি এমন কিছু হারান নি যার জন্য একেবারে ভেঙে পড়তে হবে।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম: মিঃ ফাড়কে, সারাজীবনই আমি sportsman। আপনার সান্ত্বনা-বাক্যের জন্য ধন্যবাদ। তবে ওটা অপাত্রে নিবেদন করলেন। আমি ভেঙে পড়েছি—এ ধারণাটা আপনাদের ভুল। জীবনে এই প্রথম সমুদ্র পারে চলেছি, তাই কাল মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তার সঙ্গে অন্য কোন ঘটনার সম্পর্ক নেই।

: কোন ক্ষোভ রাখবেন না অশোকবাবু। জীবন তো রঙ্গশালা। আমরা সেখানে দিনের পর দিন নিত্য নতুন নাটক জমিয়ে তুলছি। নাটকের অভিশপ্ত নায়ক যদি যবনিকা পতনের পরও সেই অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়ায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। জীবনের খেলায় দক্ষ অভিনেতার কাজ হচ্ছে নিজের ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করে বেরিয়ে যাওয়া। মিলনান্ত বিয়োগান্ত কোথাও যেন সে অপটু না হয়। নইলে ভাঙাগড়ার খেলা জমবে কেন?

আমি এবার আরও জোরে হেসে উঠলাম। ফাড়কে আমাকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিতে চাইছে।

: সাবাস ফাড়কে সাহেব। আপনাদের মিলনান্ত খেলাটা বেশ জমে উঠেছে দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। অঞ্জলীকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

জাহাজের প্রথম বাঁশি বাজল। ফাড়কে হাতের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল : অঞ্জলী পাঠিয়েছে—আপনার রাত্রের খাবার। আর চিঠি লিখতে বলেছে।

প্যাকেটটা গ্রহণ করে বললাম : নিশ্চয়ই লিখব। এবার চলি মিঃ ফাড়কে। নমস্কার।

: চিয়ারিও। গুড লাক।

তারপর কখন যেন চোখের সামনে থেকে বন্দরের জনারণ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। পাইলটরা জাহাজ এনে ছেড়ে দিয়েছে মাঝ দরিয়ায়। বোম্বাই সহরটাকে দেখাচ্ছে একটা গৃহবহুল পাহাড়ী দ্বীপের মত। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। জাহাজের গতি ক্রমবর্ধমান। রেলিংয় ঠেস দিয়ে আমি একের পর এক সিগারেট টানতে লাগলাম।

ভারতের তীরভূমি ক্রমেই কালো রেখায় পরিণত হচ্ছে। আরব সমুদ্রের সীমারেখা সম্প্রসারণশীল। সূর্য সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জমান। তার বিদায়-রশ্মির লাল আলোয় জলোচ্ছ্বাসকে রাঙিয়ে তুলেছে। চলন্ত জাহাজ ঘিরে সহস্র মুক্তা-খচা তরঙ্গের ঝিলিমিলি বিচিত্র লীলায় ফেটে ফেটে পড়ছে। কালো কালো টুকরো মেঘের গায়ে সাদা সাদা পাখির দল ডানা মেলে আকাশে নিরুদ্দেশ। বিরাট পৃথিবী, বিশাল সমুদ্র, অসীম মহাকাশ। জাহাজের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে জীবনে এই প্রথম আমি বিশ্ব প্রকৃতির বিশালত্ব দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলাম। কোটি কোটি বছর আগে সূর্যের কক্ষচ্যুত এই পৃথিবী আপন কক্ষপথে এসে সূর্যকে ঘিরে আবর্তন শুরু করে। আজও সেই ঘোরার বিরাম হয়নি। তারই মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সে নিজের রূপান্তর ঘটিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার, জলমগ্ন, প্রাণীহীন পৃথিবীতে আজ কত আলো, কত প্রাণ, কত বৈচিত্রের সমারোহ। পৃথিবীর জীবন যেমন তার নিত্য আবর্তন, মানুষের জীবনও তেমনি নিত্য সচলতা। দাঁড়ালেই-মৃত্যু। শুধু এগিয়ে চলা, শুধু অচেনাকে এবং অজানাকে বরণ করে নেওয়া। পেছনে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পার কিন্তু দাঁড়িয়ে পোড়ো না। তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

কালো আকাশের গায়ে একটা একটা করে তারা জ্বলে উঠছে। আদিগন্ত সমুদ্রে অন্ধকার নেমে আসছে। জাহাজের ডেক কিন্তু আলোয় উদ্ভাসিত। নিজের চারিদিকে আলোর আভা ফেলতে ফেলতে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে সে। অন্ধকার, কুয়াশা, ঘুর্ণি ঝড়, ডুবো-পাহাড় আর ভাসা-বরফ তাকে দিগভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু তবু সে ক্ষান্ত হবে না।

সিগারেটের টুকরো সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিয়ে রেস্তোঁরায় গিয়ে ঢুকলাম। চায়ের তৃষ্ণা লেগেছে।

কাপে চুমুক দিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, সব কিছু খোয়া যাবার দুশ্চিন্তা আমি কাটিয়ে উঠেছি। মনের তারগুলো একটা নতুন সুরের মহড়া দিচ্ছে। নিজেকে অত্যন্ত খুশি এবং সন্তুষ্ট বলে বোধ হচ্ছে। আমি কিছুই হারাই নি। কারণ পৃথিবীতে জীবন ছাড়া মানুষের আর কিছুই বোধহয় হারাবার নেই। বন্টু, মিসেস সরকার, নিরঞ্জন সেন, হরিপদবাবু, ফাড়কে, ললিতা সেন, অঞ্জলী, সিরাজুদ্দীন—এরা নিশ্চয়ই আমার জীবনে নিষ্ফল. নন। অতীত খুইয়ে ফেলেছি—এই ধারনাটাও ভুল। আমার অতীত আমারই আছে। শুধু আমি অতীতের পথ ছেড়ে অন্য পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। পথটা আমার অচেনা এবং অজানা। তাই এত দ্বিধা। "অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।" ভাঙা-গড়া, হার-জিত জীবনের জমার হিসাব। খরচের নয়।